প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা

ডিপিএড

# পেশাগত শিক্ষা

## দ্বিতীয় খণ্ড

## তথ্যপুস্তক

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)

ময়মনসিংহ

ডিসেম্বর ২০১৯

প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা

ডিপিএড

# পেশাগত শিক্ষা

## দ্বিতীয় খণ্ড

## তথ্যপুস্তক

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)

ময়মনসিংহ

ডিসেম্বর ২০১৯

| লেখক | |
|---|---|
| পরিমার্জিত সংস্করণ (২০১৫) | পরিমার্জিত সংস্করণ (২০১৯) |
| ড. আবুল এহসান<br>সিরাজ উল্ল্যা<br>মিসেস হোসনে আরা বেগম<br>মোহাম্মদ আব্দুস সালাম<br>ড. হ্যাপি দাস<br>মো: সাইফুল ইসলাম<br>শাহরিয়ার শফিক | অধ্যাপক ড. শারমিন হক<br>অধ্যাপক ড. সেলিনা বানু<br>অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী<br>মো: আলমগীর হোসেন<br>শাহ্ শামীম আহমেদ<br>ড. মো: সাইফুল মালেক<br>অধ্যাপক ড. মনিরা জাহান<br>গৌতম রায়<br>শাহরিয়ার শফিক<br>মুহম্মদ সালাহউদ্দিন |
| **বিশেষজ্ঞ পাঠক** | **বিশেষজ্ঞ পাঠক** |
| ড. আবুল এহসান<br>আনিসা হক<br>ড. হ্যাপি দাস<br>প্রফেসর সালমা আখতার | অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম |
| **পরামর্শক** | **পরামর্শক** |
| আনিসা হক | |
| **কারিগরি পরামর্শ ও গ্রুপ লিডার** | **কারিগরি পরামর্শ ও গ্রুপ লিডার** |
| ড. হ্যাপি দাস<br>সিরাজ উল্ল্যা | |
| **কারিগরি পরামর্শ ও তত্ত্বাবধান** | **কারিগরি পরামর্শ ও তত্ত্বাবধান** |
| প্রফেসর শামিম আহমেদ | শাহ্ শামীম আহমেদ |
| **সম্পাদনা** | **সম্পাদনা** |
| প্রফেসর সালমা আখতার | শাহ্ শামীম আহমেদ<br>ড. মো: সাইফুল মালেক |

## পরিমার্জিত সংস্করণের ভূমিকা ২০১৯

ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ কার্যক্রম সম্পন্ন করার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জন করবেন বলে আশা করা যায়। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে আইইআর এ কার্যক্রমের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হয়। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী আইইআর ডিপিএড কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীবৃন্দের সনদ প্রদান করার পাশাপাশি এ কার্যক্রমের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করছে। সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে ডিপিএড শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পরিমার্জন অন্যতম।

শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পরিমার্জনের কাজ একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সম্পাদন করা হয়েছে। এ পরিমার্জনের একটি অন্যতম ভিত্তি ছিল ডিপিএড মানোন্নয়নের ক্ষেত্র শনাক্তকরণের লক্ষ্যে পরিচালিত চাহিদা নিরূপণ (Need assessment)। পরিমার্জনের প্রথম ধাপটি ছিল বর্তমানে প্রচলিত ডিপিএড শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পর্যালোচনা। চাহিদা নিরূপণ থেকে ডিপিএড কার্যক্রমের বিভিন্ন দিকের ওপর প্রাপ্ত ফলাফল এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষাক্রম ও পুস্তক মূল্যায়ন নীতিমালা অনুসরণ করে পর্যালোচনার বিষয়ভিত্তিক সূচক নির্ধারণ করা হয়। জাতীয় পর্যায়ের অভিজ্ঞ পর্যালোচকগণ নির্ধারিত সূচকসমূহের আলোকে শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন তৈরি করেন।

ডিপিএড-এর প্রতি বিষয়ের শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকা পরিমার্জনের জন্য বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা হয়। বিশেষজ্ঞ দলে আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর শিক্ষকবৃন্দের নেতৃত্বে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক, নেপ এর অনুষদ সদস্যবৃন্দ, পিটিআই এর সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট ও ইনস্ট্রাক্টর এবং ডিপিই এর কর্মকর্তাগণ কাজ করেছেন। স্ব স্ব বিষয়ের পর্যালোচনা প্রতিবেদন, চাহিদা নিরূপণ গবেষণার ফলাফল এবং পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী একটি নির্দেশনা প্রস্তুতপূর্বক বিশেষজ্ঞ দলের নিকট সরবরাহ করা হয়। প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের ওপর অর্পিত পরিমার্জনের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করেন যা পরবর্তি কালে বিভিন্ন স্তরে পরিমার্জন ও সম্পাদনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়।

এই পরিমার্জিত সংস্করণে (*পেশাগত শিক্ষা- দ্বিতীয় খণ্ড*) যে পরিবর্তনগুলো স্থান পেয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলো হলো শিখনের বিভিন্ন আধুনিক তত্ত্বকে বাস্তবসম্মত উদাহরণের মাধ্যমে নবীন শিক্ষকদের উপযোগী করে উপস্থাপন, শিক্ষার্থীদের ভিন্নতাকে গুরুত দিয়ে শিখন শেখানো কার্যক্রমকে ঢেলে সাজানো, শিক্ষকদের পেশাগত করার লক্ষ্যে তত্ত্বের চেয়ে প্রায়োগিক দিকগুলোর ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান এবং শ্রেণি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন প্রায়োগিক কৌশলের সময়পোযোগী অবতারণা।

'পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৯'-এ যে সকল সংযোজন-বিয়োজন সম্পাদিত হয়েছে তা ডিপিএড কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। পরিমার্জনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, লেখক, সম্পাদক ও সমন্বয়কবৃন্দকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। এই পরিমার্জন কাজে আইইআর ডিপিএড টিমের সম্মানিত সদস্যগণ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে তাঁদের ভূমিকা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

শিক্ষাক্রম, তথ্যপুস্তক ও ইনস্ট্রাক্টর নির্দেশিকাসহ ডিপিএড মানোন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আইইআর ডিপিএড টিমকে সর্বাত্মক সহায়তা ও সমর্থন প্রদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং আইইআর-এর প্রাক্তন

পরিচালকবৃন্দ অধ্যাপক মোঃ জালালউদ্দিন, অধ্যাপক ড. আবদুল আউয়াল খান ও অধ্যাপক হোসনে আরা বেগম এবং অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সচিব, অতিরিক্ত সচিববৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রতি যারা ডিপিএড কার্যক্রমের মানোন্নয়নে আইইআর এর গৃহীত কর্মকাণ্ডে সমর্থন দিয়ে আসছেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও পরিচালক (অর্থ ও সংগ্রহ) সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রতি জানাচ্ছি অশেষ কৃতজ্ঞতা যাঁরা বিভিন্ন সময়ে আইইআর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে দিক নির্দেশনা ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)-এরবর্তমান ও প্রাক্তন মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালক, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ যারা এ পরিমার্জন কাজে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছেন তাঁদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে,'পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৯' ডিপিএড কোর্সের মানোন্নয়ন তথা প্রাথমিক শিক্ষকগণের প্রত্যাশিত শিক্ষকমান অর্জনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করছি।

**অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা আখতার**
পরিচালক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

**অধ্যাপক ড. শারমিন হক**
কো-অর্ডিনেটর (জুন ২০১৮ পর্যন্ত)
ডিপিএড মান উন্নয়ন কর্মসূচি
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

**অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুল মালেক**
কো-অর্ডিনেটর
ডিপিএড মান উন্নয়ন কর্মসূচি
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

# সূচিপত্র

**অধ্যায় ১: শিক্ষার্থীর শিখন: শিখনের ক্ষেত্র ও শিখন তত্ত্ব**

শিখনের ক্ষেত্র

বুদ্ধিবৃত্তিক বা জ্ঞানীয় ক্ষেত্র

আবেগীয় ক্ষেত্র

মনোপেশীজ ক্ষেত্র

শিশুর শিখনে প্রেষণা

প্রেষণার ধারণা, প্রেষণা চক্র ও প্রেষণার শ্রেণিবিভাগ

মাশলোর চাহিদা তত্ত্ব

শিশুর শিখনে প্রেষণার প্রয়োজনীয়তা

শিখন তত্ত্ব

আচরণবাদ: সংযোগবাদ, চিরায়ত সাপেক্ষীকরণ ও করণ শিখন

জ্ঞানবাদ: সমগ্রতাবাদ ও গঠনবাদ

বুদ্ধিমত্তা

বুদ্ধি সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা

বহুমুখী বুদ্ধিমত্তা তত্ত্ব

**অধ্যায় ২: শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল**

শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আচরণ

অনুকূল শ্রেণি পরিবেশ প্রতিষ্ঠা

সম্পর্ক উন্নয়ন

আচরণবিধি প্রতিষ্ঠা

যোগাযোগ মাধ্যম প্রতিষ্ঠা

জেন্ডার ও জাতিগত বৈষম্য দূর করা

বিশেষ চাহিদার প্রতি সাড়া প্রদান

শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা

একটি ভারসাম্যপূর্ণ শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

শিশুর ভিন্নতা

শিশুদেরভিন্নতার ধরন

শিক্ষার্থীদের ভিন্নতা চিহ্নিতকরণ ও চাহিদা নিরূপণ

শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ

যোগাযোগ কী ও কীভাবে ঘটে

শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ কৌশল

প্রাথমিক শিক্ষায় শিখন- শেখানো পদ্ধতি

বক্তৃতা পদ্ধতি

প্রদর্শন পদ্ধতি

আলোচনা পদ্ধতি

সমস্যা সমাধান পদ্ধতি

প্রজেক্ট পদ্ধতি

ভূমিকাভিনয়

অন্যান্য পদ্ধতিসমূহ (প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ, অ্যাসাইনমেন্ট, বিতর্ক ইত্যাদি)

শিখন শেখানো পদ্ধতি নির্বাচন ও প্রয়োগে শিশুর ভিন্নতা

পদ্ধতি নির্বাচনে ভিন্নতা বিবেচনা

শিক্ষার্থীদের ভিন্নতা অনুসারে শিখন শেখানো পদ্ধতির প্রয়োগ

শিক্ষোপকরণ তৈরি ও ব্যবহার

শিক্ষা উপকরণ কী

বিভিন্ন ধরনের শিক্ষোপকরণ

শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন

শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ

শিক্ষা উপকরণ তৈরি

শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার

শিক্ষা সহায়ক উপকরণ সংরক্ষণ

পাঠ পরিকল্পনা

পাঠ পরিকল্পনার ধারণা

পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

পাঠ পরিকল্পনার ধরন

পাঠ পরিকল্পনার কাঠামো

**অধ্যায় ৩: শিখন মূল্যায়ন**

মূল্যায়নের ধারণা, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পরিমাপ, অভীক্ষা, মূল্যযাচাই ও মূল্যায়ন

শিখনফল, শিখন-শেখানো কার্যাবলি ও মূল্যায়নের পারস্পরিক সম্পর্ক

মূল্যায়নের ধরন

গাঠনিকমূল্যায়ন

সামষ্টিক মূল্যায়ন

Norm-referenced assessment

Criterion-referenced assessment

একীভূত শিক্ষার আলোকে মূল্যায়নে নমনীয়তা

মূল্যায়নের জন্য শিখন তথ্য সংগ্রহ

পরীক্ষা

ধারাবাহিক মূল্যায়ন

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী মূল্যায়ন
প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী মূল্যায়ন
অভীক্ষার ধরন ও বৈশিষ্ট্য
অভীক্ষা কী
অভীক্ষার ধরন
উত্তম অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য
অভীক্ষাপদ তৈরিতে শিখনের ক্ষেত্র বিবেচনা
বুদ্ধিবৃত্তিক বা জ্ঞানীয় ক্ষেত্রে শিখন মূল্যায়ন
আবেগীয় ক্ষেত্রে শিখন মূল্যায়ন
মনোপেশীজ ক্ষেত্রে শিখন মূল্যায়ন
যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন প্রণয়ন
অভীক্ষাপদ তৈরির কৌশল
রচনামূলক অভীক্ষাপদ তৈরির কৌশল
নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাপদ তৈরির কৌশল
উত্তরপত্র মূল্যায়ন
শিখনের মানসম্মত পরিমাপ
নম্বর বণ্টন ও প্রদান
রুব্রিক কী ও কেন?
রুব্রিক তৈরির কৌশল
কার্যকর মূল্যায়নের নীতিমালা
**অধ্যায় ৪: প্রাথমিক শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন ও প্রতিফলনমূলক অনুশীলন**
পেশাগত উন্নয়ন কী
প্রতিফলনমূলক অনুশীলন কী
প্রতিফলনমূলক অনুশীলনের উপায়
প্রতিফলন অনুশীলন চক্র
প্রতিফলন অনুশীলনে সহযোগিতা
পাঠ সমীক্ষা
পাঠ সমীক্ষার ধারণা
পাঠ সমীক্ষা কেন
পাঠ সমীক্ষা প্রক্রিয়া
কর্মসহায়ক গবেষণা
কর্মসহায়ক গবেষণার পটভূমি
কর্মসহায়ক গবেষণা কী
কর্মসহায়ক গবেষণা কে করবে এবং কার জন্য করবে
কর্মসহায়ক গবেষণার উদ্দেশ্য
কর্মসহায়ক গবেষণার বৈশিষ্ট্য

কর্মসহায়ক গবেষণার সাথে অন্যান্য গবেষণার পার্থক্য
কর্মসহায়ক গবেষণার গুরুত্ব
কর্মসহায়ক গবেষণার বিষয় ও ক্ষেত্র নির্বাচন
কর্মসহায়ক গবেষণা প্রক্রিয়া
কর্মসহায়ক গবেষণার প্রতিবেদন প্রণয়ন
কর্মসহায়ক গবেষণা প্রতিবেদন এর নমুনা
কেস স্টাডি
কেস স্টাডি কী
কেস স্টাডি প্রক্রিয়া
কেস স্টাডি রিপোর্ট
কর্মসহায়ক গবেষণা ও কেস স্টাডি পার্থক্য
মেন্টরিং
মেন্টরিং-এর ধারণা
মেন্টরিং এর উদ্দেশ্য
শিক্ষায় মেন্টরিং
শিক্ষায় মেন্টরিং এর কৌশল
প্রধান শিক্ষক যখন মেন্টর
সহায়ক পাঠ

# অধ্যায় ১

# শিক্ষার্থীর শিখন: শিখনের ক্ষেত্র ও শিখন তত্ত্ব

ব্যক্তি কীভাবে শেখে সে বিষয়ে ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ বেঞ্জামিন ব্লুম এবং তাঁর সহকর্মিরা দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তাঁদের মতে ব্যক্তি যেভাবে শেখে তা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তবে শিখনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যবস্তু (Goal) নির্ধারণ করা গেলে তার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির শিখনের অগ্রগতি (Performance) পরিমাপ করা সম্ভব। বিষয়টির ওপর বেঞ্জামিন স্যামুয়েল ব্লুম ১৯৫৬ সালে 'Taxonomy of Educational Objectives' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে একটি বিষয়বস্তু থেকে শিক্ষার্থী শুধু জ্ঞানই অর্জন করে না বরং ঐ জ্ঞান সংশ্লিষ্ট আরও অনেক দক্ষতা অর্জন করেথাকে। শিখন শেখনো প্রক্রিয়ায়(Teaching-learning process) শিখনের উদ্দেশ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদেরএই বহুমুখী দক্ষতাগুলো বিবেচনা অপরিহার্য। ব্লুম শিক্ষার্থীদের এই দক্ষতাগুলোকে শিখনের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করেন।

## শিখনের ক্ষেত্র

ব্লুম তাঁর গ্রন্থে শিখনের ক্ষেত্রগুলোকে তিনটি প্রধান ভাগ করেন যা নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **জ্ঞানীয় (Cognitive)ক্ষেত্র:**জ্ঞান এবং এর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাজ্ঞানীয়ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।
২. **আবেগীয়(Affective)ক্ষেত্র:** কোন বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তির অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গি বা আবেগ এক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।
৩. **মনোপেশীজ (Psychomotor)ক্ষেত্র:** শারীরিক দক্ষতা (Skills) সংক্রান্ত বিষয় মনোপেশীজ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।

ব্লুম-এর ট্যাক্সোনোমি অনুসারে শিক্ষার্থীর শিখন নিম্ন স্তরথেকে উচ্চ স্তরের দিকে অগ্রসর হয়। অর্থাৎ নিম্ন স্তরের জ্ঞান ও দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর উচ্চ স্তরের শিখন গড়ে ওঠে। এই স্তর নির্দেশ করার জন্য শিখন ক্ষেত্রগুলোকে আবার কতগুলো উপ-ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগগুলো শিক্ষার্থীরবিকাশ সহজ থেকে জটিল দিকে অগ্রসর হওয়াকে নির্দেশ করে। এসংক্রান্ত ধারণা সফলভাবে প্রয়োগ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরাশিখনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যগুলো কতটুকু অর্জন করতে পেরেছেশিক্ষকগণ তানিশ্চিত করতে পারেন। ব্লুম এবং তাঁর সহকর্মীরা শিখনে তিনটি ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত কতগুলো শিখন কার্যাবলি শনাক্ত করেছেন।

### বুদ্ধিবৃত্তিক বা জ্ঞানীয়ক্ষেত্র

জ্ঞানীয় বা বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রব্যক্তি বা শিক্ষার্থীর জ্ঞান এবং এর বিকাশের সাথে সম্পর্কিত। সাধারণত একজন শিক্ষক শ্রেণি শিখন শেখানো কাজে শিক্ষার্থীর যেসব শিখন উদ্দেশ্যের ওপরগুরুত্ব দিয়ে থাকেন তার বেশির ভাগই জ্ঞানীয় ক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত। তবে এই ধরনের শিখন শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক শিখনকে নিশ্চিত করে না। শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের জন্যপ্রয়োজন উচ্চতর চিন্তনমূলক শিখনের সুযোগ। উচ্চতর চিন্তন সংক্রান্তশিখনের সুযোগ শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা বা চিন্তারবিকাশএবং কোনও বিষয় সম্পর্কে বিস্তৃত ও সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেয়ার দক্ষতা বৃদ্ধি করে। ব্লুম-এর ট্যাক্সোনোমি অনুযায়ীব্যক্তির জ্ঞানীয় ক্ষেত্রের বিকাশ নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হয়। ব্লুম জ্ঞানীয় ক্ষেত্রের এই বিকাশকে ছয়টি উপ-ক্ষেত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

১. **জ্ঞান (Knowledge):** জ্ঞান হলো কোনো বিষয়ে তথ্য জেনে প্রয়োজনে স্মরণ করার সামর্থ্য। অর্থাৎ কোন বিষয়ের তথ্য, তত্ত্ব, সূত্র, সংজ্ঞা, নীতি ইত্যাদি মুখস্থ করে শিক্ষার্থী কতটুকু স্মরণ বা পুনর্ব্যক্ত করতে পারল তার সামর্থ্যবোঝায়।

২. **বোধগম্যতা(Comprehension):**বোধগম্যতা হলো কোন কিছু বোঝার সামর্থ্য। শিক্ষার্থী কোনোবিষয় শিখে তার অর্থ বা মূলভাব কতটুকু বুঝতে বা আয়ত্ত করতে পারল সেই সামর্থ্যকে বোঝায়।

৩. **প্রয়োগ (Application):**প্রয়োগ হলো কোনো বিষয় সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে কাজে লাগানোর সামর্থ্য। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক জ্ঞানঅর্থাৎ কোনো বিষয়ের অর্জিত জ্ঞান ও বোধগম্যতাকে তারা বাস্তব ক্ষেত্রে কতটুকুকাজে লাগাতে পারছে তার সামর্থ্যকে বোঝা যায়।

৪. **বিশ্লেষণ (Analysis):**বিশ্লেষণ হলো কোনো বিষয় বা ঘটনার উপাদানগুলোকে অর্থপূর্ণভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাবে ভাগ করার সামর্থ্য। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শেখা কোনো বিষয়বস্তু, কোনো ঘটনা, রূপ, সূত্র, উপাদান, নীতি বা ধারণা ইত্যাদি ক্ষুদ্রক্ষুদ্র রূপে ভেঙেআন্তঃসম্পর্ক বজায় রেখে উপস্থাপন করার সামর্থ্যকে বোঝায়।

৫. **সংশ্লেষণ (Synthesis):**সংশ্লেষণ হলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত উপাদানের সমন্বয়ে কোনো বিষয় সম্পর্কে সামগ্রিক মত বা ধারণা বা সিদ্ধান্ত প্রদান করার সামর্থ্য। এর মাধ্যমে কোনোবিষয়ের উপাদানগত বিন্যাস ও গঠন অংশের সমন্বয় বিবেচনা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসার সামর্থ্যকে বোঝায়।

৬. **মূল্যায়ন (Evaluation):** বস্তুর ধারণা বা মূল্য সম্পর্কে বিচার করাই হলো মূল্যায়ন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কোন বিষয় সমালোচনা, পর্যালোচনা, যুক্তি, প্রমাণ এবং তাৎপর্যগত দিক বিচার বিশ্লেষণ করে তার মূল্য বা মান যাচাই করার সমার্থ্যকে বোঝায়।

**ব্লুম-এর ট্যাক্সোনমির পরিমার্জন(Revised BloomTaxonomy)**

২০০১ সালে ব্লুমের প্রাক্তন কিছু শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ সম্বিলিতভাবে ব্লুমের শ্রেণিবিন্যাসের পরিমার্জন করে এর নামকরণ করেন'A Taxonomy for Teaching, Learning and Assessment'। শিখন উদ্দেশ্যের শ্রেণিবিন্যাসকে একুশ শতকের উপযোগী করে বিন্যস্ত করা হয়। এছাড়া এর শাব্দিক (Terminology) ও গঠনগত দিকেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়নকরা হয়। এই সংস্করণে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান পরিমাপের জন্য 'বিশেষ্য'(Noun)-এর পরিবর্তে 'ক্রিয়াবাচক শব্দ'(Action word) বা 'ক্রিয়াপদ'(Verb) ব্যবহারের রীতি প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া জ্ঞানীয় ক্ষেত্রের তিনটি উপ-স্তরের নাম এবং শেষ দু'টি উপ-স্তরের বিন্যাসে পরিবর্তন করা হয়। শুধু নাম ও বিন্যাসের পরিবর্তনই নয় বরং পরিমার্জিত এই শ্রেণিবিন্যাসে শিখন প্রক্রিয়ার ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়।পূর্বের ন্যায় শিখন ক্ষেত্রের পরিমার্জিত শ্রেণিবিন্যাসের পর্যায়গুলোও নিম্নতর স্তর হতে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত।

১. **স্মরণ বা মনে করা (Remember):**স্মৃতি থেকে কোনো বিষয় মনে করা, চিনতে পারা বা স্মরণ করা।

২. **বুঝতে পারা (Understand):** ব্যাখ্যা, উদাহরণ, শ্রেণিকরণ, সারসংক্ষেপকরণ, অনুমান বা তুলনার মাধ্যমে মৌখিক বা লিখিতভাবে কোনো বিষয়ের অর্থ গঠন করা।

৩. **প্রয়োগ করা (Apply):** প্রাপ্ত তথ্য বা অর্জিত জ্ঞানকে কোনো নতুন পন্থায় বা নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা বা সাদৃশ্যপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।

৪. **বিশ্লেষণ করা (Analyze):** কোনো বিষয়কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে অর্থপূর্ণভাবে বিভক্ত করা এবং অংশগুলো কীভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তা পার্থক্যকরণ বা সংগঠনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা।

৫. **মূল্যায়ন করা (Evaluate):** নির্দিষ্ট মানদণ্ড বা আদর্শের ভিত্তিতে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ এবং সমালোচনার মাধ্যমে কোনো বিষয়ের মূল্য যাচাই করা।

৬. **সৃজন(Create):**পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন উপাদান একত্রিত করার মাধ্যমে কোনো ধারণার সামগ্রিক রূপ দেওয়া, অর্জিত জ্ঞানের সমন্বয়ে নতুন জ্ঞান বা ধারণার সৃষ্টি, কোনো নতুন উৎপাদ বা সামগ্রীর ডিজাইন করা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন প্রস্তাব।

ব্লুমের শিখনক্ষেত্র সম্পর্কিত মূল শ্রেণিবিন্যাস এবং পরিবর্তিত শ্রেণিবিন্যাস নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১.১: শিখন উদ্দেশ্য সংক্রান্ত ব্লুমের মূল ও পরিমার্জিত শ্রেণিবিন্যাস

| মূল শ্রেণিবিন্যাস (১৯৫৬) | | পরিমার্জিত শ্রেণিবিন্যাস (২০০১) |
|---|---|---|
| • মূল্যায়ন<br>• সংশ্লেষণ<br>• বিশ্লেষণ<br>• প্রয়োগ<br>• বোধগম্যতা<br>• জ্ঞান | | • সৃজন<br>• মূল্যায়ন করা<br>• বিশ্লেষণ করা<br>• প্রয়োগ করা<br>• বুঝতে পারা<br>• স্মরণ করা |
| বিশেষ্যরূপ(Noun Form) | → | ক্রিয়ারূপ (Verb Form) |

**আবেগীয় ক্ষেত্র**

আবেগিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং যথাযথ গুণবিচার ও খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা বিকশিত হয়। শিখনের এই ক্ষেত্রটি ব্যক্তির আবেগ বা অনুভূতির সাথে সম্পর্কিত।মূলত শিখনের সাথে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব, আবেগ, অনুভূতি, প্রশংসা করা এবং যথাযথ গুণবিচারকরার সামর্থ্যের পরিবর্তন (তপন ও রশিদ, ২০০৫) আবেগীয় ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শিক্ষার্থীরা গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধা করবে এবং বাড়ি ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি চর্চা করবে। বিশেষ করে তাদের নেতা নির্বাচনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে। Krathwohl (১৯৬৪)-এর মতে শিখনের জ্ঞানীয় ক্ষেত্রের মত আবেগীয় ক্ষেত্রও পর্যায়ক্রমিক স্তরে বিভক্ত। আবেগীয় ক্ষেত্রের ৫টি উপ-ক্ষেত্র রয়েছে, যেমন-

১. **গ্রহণ করা (Reception):** কোনো কিছু শোনা, কোনো কিছুর প্রতি মনোনিবেশের ইচ্ছা বা কোনো কিছু সম্পর্কে ব্যক্তির সচেতনতাকে বুঝায়।নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব কিংবা আবেগ বা অনুভূতি দিয়ে কোন কিছু গ্রহণ করা।

২. **প্রতিক্রিয়া করা (Responding):** কোনো বিষয়ে ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ বা কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার প্রতি প্রতিক্রিয়া করার প্রবণতা। কাজের ফলাফল, প্রতিক্রিয়ায় সম্মতিদান, প্রতিক্রিয়ার ইচ্ছা বা প্রতিক্রিয়ার প্রতি সন্তুষ্টির ওপর এ বিষয়টি নির্ভরশীল।

৩. **মূল্য আরোপ (Valuing):**কোনো ঘটনা, বস্তু বা আচরণের ওপর মূল্য বা গুরুত্বারোপ করাকে বুঝায়। এটি সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা থেকে শুরু করে জটিল অবস্থা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে। মূল্যারোপ ব্যক্তির মাঝে কতগুলো মূল্যবোধ অন্তঃস্থকরণের মাধ্যমে হয়ে থাকে, যা তার বাহ্যিক আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

৪. **সংগঠন (Organizing):**বিচার ক্ষমতার মাধ্যমে প্রাধান্য অনুযায়ী বিভিন্ন মূল্যবোধগুলোকে সংগঠিত করার দক্ষতা। এই দক্ষতার মাধ্যমে ব্যক্তি বিভিন্ন মূল্যবোধের মধ্যে দ্বন্দ্বগুলোকে সমাধানের মাধ্যমে নিজের মাঝে অনন্য মূল্যবোধের ধারণা সৃষ্টি করে। সংগঠন দক্ষতার মাধ্যমে ব্যক্তি মূল্যবোধগুলোর মধ্যে তুলনা ও সম্পর্ক নিরূপণ করতেপারে।

৫. **মূল্যবোধের অন্তঃস্থকরণ (Internalizing values)**: এটি এমন একটি মূল্যবোধ, যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আবেগিক অভিযোজনের যোগ্যতা তৈরি করা।

**মনোপেশীজ ক্ষেত্র**

মনোপেশীজ ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মন ও পেশী একসাথে কাজ করে। এটি অনেকটা হাতে কলমে কাজ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত। একে সাধারণভাবে বলা হয় দক্ষতা। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের যেসব আচরণ পেশীজ ক্রিয়া বা কর্মের অন্তর্ভুক্ত এবং যার জন্য স্নায়ুপেশীজ সমন্বয় প্রয়োজন তাদেরকে মনোপেশীজ ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা যায় (তপন ও রশিদ, ২০০৫)।

মানুষের দৈহিক ও মানসিক সক্রিয়তার বহিঃপ্রকাশকে মনোপেশীজ দক্ষতা নামে অভিহিত করা হয়। শিখনের মনোপেশীজ উদ্দেশ্য দ্বারা কতগুলো বিচ্ছিন্ন শারীরিক কার্যকলাপ, প্রতিবর্তী ক্রিয়া বা ব্যাখ্যামূলক গতিকে বুঝায়, যার মাধ্যমে শারীরিকভাবে তথ্যের সংকেতকরণ হয়ে থাকে। এখানে ব্যক্তি কোন তথ্য বা ধারণা প্রকাশের জন্য বিভিন্ন স্থূল বা সূক্ষ্ম পেশী ব্যবহৃত করে থাকে।

মনোপেশীজ ক্ষেত্রে শারীরিক গতি, সমন্বয় এবং পেশীয় দক্ষতার ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত। এধরনের দক্ষতার বিকাশের জন্য প্রয়োজন অনুশীলন এবং এগুলো গতি, সুনির্দিষ্টতা, দূরত্ব, প্রক্রিয়া বা কোন কাজের কৌশল ইত্যাদি দ্বারা পরিমাপ করা যায়। Dave (১৯৭৪) এর মতে মনোপেশীজ ক্ষেত্রের কয়েকটি উপক্ষেত্র রয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

১. **নকলকরণ (Imitation):**সম্পাদিত কোন কাজ দেখে তা হুবহু করার চেষ্টা করা।

২. **নির্দেশনাভিত্তিক কাজ (Manipulation):**অনুকরণ না করে নির্দেশনা অনুযায়ী কোন কাজ করা।

৩. **সঠিকতা (Precision):** পূর্বে করা কোন কাজ নির্ভুলভাবে পুনরায় করা। কোন ক্রিয়া বা কাজকে তার অনুপাত ও সঠিকতা বজায় রেখে নিজের মত সম্পাদন করা।

৪. **সমন্বয়সাধন (Articulation):** বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন, ধারাবাহিকতা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

৫. **স্বাভাবিকীকরণ (Naturalization):**স্বল্প শ্রম (কায়িক ও মানসিক) ও স্বল্প সময়ে কোন কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা। এই স্তরে দক্ষতা স্বভাবের অংশ হওয়ায় অতি সহজেই কাজ সম্পাদন করা যায়।

## শিশুর শিখনে প্রেষণা(Motivation in child's learning)

### প্রেষণার ধারণা

ইংরেজি Motive,যার অর্থ উদ্দেশ্য, শব্দটি থেকে প্রেষণা বা Motivationকথাটি এসেছে। প্রেষণা হলো মানুষ ও প্রাণির এমন একটি অবস্থা যা তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করে বা কর্মশক্তি দান করে। প্রেষণা থাকার জন্যই মানুষ বা প্রাণীর মধ্যে কর্মস্পৃহা পরিলক্ষিত হয়। প্রেষণাকে আমরা গাড়ি বা রেলগাড়ির সাথে তুলনা করতে পারি। জ্বালানি বা বাষ্প যেমন গাড়ি বা রেলগাড়িকে শক্তি যোগায় ও সামনের দিকে নিয়ে যায়, প্রেষণাও তেমনি আমাদের লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনীয় আচরণের জন্য শক্তি বা তাড়না প্রদান করে। তাই বলা যায় উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হলে মানুষ বা প্রাণির মধ্যে যে সক্রিয় বা গতীয় অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকেই বলা হয় প্রেষণা। প্রেষণাকে মনোবিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

Crider, Goethals, Kavanaugh ও Solomon-এর মতে, আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন এবং আগ্রহ যা একটি প্রাণীকে কর্মে উদ্বুদ্ধ বা সক্রিয় করে তোলে এবং একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর দিকে পরিচালিত করে তাকে প্রেষণা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায় (১৯৯৩, পৃ: ১৩২, লেখক কর্তৃক অনুবাদিত)।

Buskistও Gerbingবলেন, ব্যাপকার্থে প্রেষণাকে আচরণের কারণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে এটি আচরণের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত (১৯৯০, পৃ:৩৩২, লেখক কর্তৃক অনুবাদিত),যেমন-

১. একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর দিকে আচরণের সূত্রপাত;
২. আচরণের তীব্রতা ও শক্তি; এবং
৩. আচরণের নিবৃত্তি।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, যে পরিস্থিতি বা আচরণ আমাদের কোন অভাববোধের চাপ বা তাড়নার পরিস্থিতিতে সক্রিয় করে তোলে এবং উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনের দিকে চালিত করে তাকেই প্রেষণা বলা হয়।

### প্রেষণা চক্র

প্রেষণা হচ্ছে একটি গতিশীল অবস্থা যা আমাদের মাঝে কোন উদ্দেশ্য লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা জাগ্রত করে। এই গভীর অবস্থা অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে। প্রেষণার কয়েকটি স্তর বা পর্যায় রয়েছে যেগুলো অতিক্রম করে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করি। এ স্তরগুলো হলো-

১. অভাববোধ (Need)
২. তাড়না (Drive)
৩. করণ আচরণ (Instrumental Behaviour)

৪. উদ্দেশ্য সাধন বা লক্ষ্যবস্তু (Goal)

প্রেষণার স্তরগুলো একসাথে দেখা যায় না, একটির পর আরেকটি পর্যায়ক্রমে আসে। অর্থাৎ স্তরগুলো একটি চক্রের আকারে আবর্তিত হয়। প্রেষণার পর্যায় বা স্তরগুলোর চক্রাকারে আবর্তিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রেষণাচক্র। প্রতিটি প্রেষণার ক্ষেত্রেই উপরিউক্ত স্তরসমূহ পর্যায়ক্রমে ঘটে থাকে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করাযাক। মনে করুন আপনি ক্ষুধার্ত। ক্ষুধার্ত অবস্থা আপনার মাঝে এক ধরনের অস্থিরতার সৃষ্টি করবে। ক্ষুধা মেটাবার জন্য আপনি একধরনের তাড়না অনুভব করবেন এবং খাবার পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের আচরণ করবেন। প্রেষণা প্রশমিত হলে আপনি বিশ্রাম নিবেন। এখানেই প্রেষণার পরিসমাপ্তি ঘটে না। কারণ বিশ্রামের কিছুকাল পরে হয়ত অন্য কোন প্রেষণার সৃষ্টি হয় এবং পর্যায়ক্রমে আবার উপরিউক্ত স্তরগুলোর আগমন ঘটে। নিম্নে প্রেষণা চক্রটি চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

চিত্র ১.১: প্রেষণা চক্র

**প্রেষণার শ্রেণিবিভাগ (Classification of motivation)**

প্রেষণার শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মত পার্থক্য থাকলেও বেশিরভাগ মনোবিজ্ঞানী প্রেষণাকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করার পক্ষপাতী, যেমন-

১. শারীরবৃত্তীয় বা জৈবিক প্রেষণা (Biological drives)এবং
২. সামাজিক প্রেষণা (Social drives)।

**১. জৈবিক প্রেষণা (Biological drives)**

যেসব প্রেষণা প্রাণীর জৈবিক অস্তিত্ব থেকে অর্থাৎ শরীরের বিপাক ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয় সেসব প্রেষণাকে বলা হয় জৈবিক প্রেষণা। জৈবিক প্রেষণার কিছু উদাহরণ হলো ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, যৌন প্রেষণা ও মাতৃত্ব ইত্যাদি। এসব প্রেষণার সন্তুষ্টি আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য বলে এসব প্রেষণাকে অনেক সময় মূখ্য প্রেষণাও (Primary drive)বলা হয়। জৈবিক প্রেষণার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো হল-

- জৈবিক প্রেষণা প্রাণীর শারীরিক তাগিদ বা প্রয়োজন থেকে সৃষ্টি হবে;
- এটি মানুষ বা প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য;
- প্রেষণাটি জন্মগত, শিক্ষার্জিত নয়;
- জৈবিক প্রেষণা একই শ্রেণির সকল প্রাণীর মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান থাকবে; এবং
- শরীরের ভিতরের অস্থির অবস্থা ও অভাববোধ প্রাণীর মাঝে উত্তেজনার সৃষ্টি এবং শরীরের ভারসাম্য সংস্থাপক হিসেবে প্রেষণাটি কাজ করে।

### ২. সামাজিক প্রেষণা (Social drives)

সামাজিক প্রেষণার উদ্ভব হয় মানুষের সমাজ জীবন থেকে। এসব প্রেষণা মানুষ তার পরিবেশ বা সমাজ জীবন থেকে শিখে থাকে বলে এদের বলা হয় অর্জিত বা শিক্ষালব্ধ প্রেষণা। সামাজিক পরিতৃপ্তি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য নয় বলে এসব প্রেষণাকে গৌণ প্রেষণা (Secondary dirve)বলা হয়। এরূপ কিছু সামাজিক প্রেষণা হলো- যুথচারিতা, স্বীকৃতির চাহিদা, কৃতি প্রেষণা ইত্যাদি।
কোন কিছু অর্জনের ওপর ভিত্তি করে প্রেষণাকে আমরা আরও দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন-

- অভ্যন্তরীণ বা অন্তর্নিহিত প্রেষণা(Intrinsic motivation)ও
- বাহ্যিক বা বহির্জাত প্রেষণা (Extrinsic motivation)।

- **অভ্যন্তরীণ বা অন্তর্নিহিত প্রেষণা (Intrinsic motivation):**অভ্যন্তরীণ প্রেষণা হলো ব্যক্তির নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য(Personal traits) বা গুণ, যা তাকে কোন কাজ বা আচরণ করতে শক্তি জোগায় ও পরিচালিত করে। অর্থাৎ ব্যক্তি তার নিজের আগ্রহের কারণে সহজাতভাবেই কোন বিষয়ের প্রতি আগ্রহী হয়। যেমন - কোন শিক্ষর্থীর হয়তো ইতিহাস বিষয়টির প্রতি অনুরাগ রয়েছে। সে শুধু পরীক্ষার পাশ করার জন্য বিষয়টি পড়ে না। সে ইতিহাস বিষয়টি পড়তে পছন্দ করে, কারণ এটি তার কৌতূহল নিবৃত্ত করে অথবা বিষয়টি তার কাছে আনন্দদায়ক।

- **বাহ্যিক বা বহির্জাত প্রেষণা (Extrinsic motivation):** ব্যক্তি যখন কিছু পাওয়ার জন্য বা শাস্তি এড়ানোর জন্য কোনো কাজ করে তখন তার সেই প্রেষণাকে বলা যাবে বাহ্যিক প্রেষণা, যেমন- কোনো শিক্ষার্থী হয়তো কঠোর পরিশ্রম করে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল পাওয়ার জন্য।

ব্যক্তি আচরণ শুধু অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক প্রেষণার মধ্যে কোন একটির কারণে ঘটেনা।অনেক সময় কোনো আচরণের পেছনে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় প্রেষণাই কাজ করে থাকে। যেমন-একটি শিশু ছবি আঁকে কারণ সে ছবি আঁকতে পছন্দ করে (অভ্যন্তরীণ প্রেষণা)। অন্যদিকে, বাবা-মার প্রশংসা (বাহ্যিক প্রেষণা) তাকে ছবি আঁকার প্রতি উৎসাহিত করে। অভ্যন্তরীণ প্রেষণা শিক্ষার্থীর শিখনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও বিভিন্ন সময়ে বা পরিস্থিতিতে শিখনের জন্য বাহ্যিক উদ্দীপনা বা প্রেষণারও দরকার হতে পারে। সেকারণে একজন শিক্ষকের উচিত শিক্ষার্থীর অভ্যন্তরীণ প্রেষণাকে পরিচর্যা ও উৎসাহ দেওয়ার সাথে সাথে তার বাহ্যিক প্রেষণার প্রতিও গুরুত্ব দেয়া।

### মাশলোর চাহিদা তত্ত্ব (Maslow's Need Theory)

আব্রাহাম মাশ্‌লো (১৯৫৪, ১৯৭১) প্রেষণার তত্ত্বটি প্রণয়ন করেন যা পর্যায়ক্রমিক চাহিদা তত্ত্ব নামে পরিচিত। মাশলোর তত্ত্বের মূলকথা হলো মানুষ প্রথমে তারজৈবিক চাহিদাগুলো পূরণের চেষ্টা করে এবং তারপর পর্যায়ক্রমে পরবর্তী উচ্চতর চাহিদাগুলো পূরণে সচেষ্ট হয়। মাশ্‌লো তাঁর তত্ত্বে চাহিদাগুলোকে পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করেন। মাশলোর পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো নিচের চিত্রে দেখানো হলো:

চিত্র ১.২: মাশলোর পর্যায়ক্রমিক চাহিদা তত্ত্ব

মাশলোর প্রস্তাবিত প্রেষণার পর্যায়ক্রমিকতত্ত্বের স্তরগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো:

(ক) **জৈবিক চাহিদা:** মাশলোর তত্ত্বের একদম নিচের ধাপটি হলো জৈবিক চাহিদার ধাপ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা ইত্যাদি এই চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। মানুষের চিন্তা ও আচরণ তার জৈবিক চাহিদার দ্বারা প্রভাবিত হয়। জৈবিক চাহিদার পরিতৃপ্তি না হলে আমরা পরের পর্যায়গুলোতে যেতে পারিনা।

(খ) **নিরাপত্তার চাহিদা:** এটি চাহিদা তত্ত্বের দ্বিতীয় ধাপ। জৈবিক চাহিদা পূরণ হলেই আমাদের মাঝে নিরাপত্তার চাহিদা জাগ্রত হয়। এই চাহিদার মধ্যে রয়েছে আশ্রয়ের নিরাপত্তা, চাকরির নিরাপত্তা, আয় ও সম্পদের নিরাপত্তা, দৈহিক নিরাপত্তা ও পারিবারিক নিরাপত্তা ইত্যাদি।

(গ) **স্নেহ-ভালবাসার চাহিদা:** নিরাপত্তার চাহিদা পূরণ হলে মানুষ ভালোবাসা বা স্নেহের চাহিদা পূরণের জন্য তাড়না অনুভব করে। এই চাহিদা সামাজিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, পারিবারিক সম্পর্ক ইত্যাদি। এই চাহিদার অভাবে মানুষের মাঝে নিঃসঙ্গতা কিংবা বিষণ্নতা দেখা যায়।

(ঘ) **আত্মমর্যাদার চাহিদা:** প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আত্মমর্যাদার চাহিদা থাকে। মর্যাদাবোধ তখনই আসে যখন মানুষ নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারে। এই মূল্যায়ন যথাযথ না হলে নিজের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা কমে যায়, হীনমন্যতায় ভোগে, আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়।

(ঙ) **আত্মপূর্ণতার চাহিদা:** প্রথম চারটি ধাপ যথাযথভাবে পূরণ হলেই মানুষ সর্বশেষ চাহিদা অর্থাৎ আত্মপূর্ণতার চাহিদায় যেতে পারে। সবার পক্ষে এ স্তরে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। এ পর্যায়ে ব্যক্তি নিজেকে পরিপূর্ণ করতে চায়, নিজের দক্ষতা ও সার্মথ্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চায়। তার মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, সৃজনশীলতা ও পরিবেশের সাথে পারস্পরিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে। সে নিজেকে ও অন্যকে ভালোবাসে এবং নিজেকে কাজে এমনভাবে নিয়োজিত রাখে যা নৈতিক দিক থেকে সমাজের জন্য কল্যাণকর।

***একজন শিক্ষক কেন মাশলোর তত্ত্ব সম্পর্কে জানবেন?***

শিক্ষার ক্ষেত্রে মাশ্লোর চাহিদা তত্ত্বটির গুরুত্ব অপরিহার্য। বিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীরা আসে, যাদের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা থাকে। বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষার্থীদের চাহিদাগুলো সম্পর্কে শিক্ষকদের জানা প্রয়োজন। এ তত্ত্বটি সম্পর্কে জানা থাকলে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের চাহিদার সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যা নিরূপণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন। মাশ্লোর মতে শিক্ষার্থীকে কোন কিছু অর্জনের পূর্বে তার জৈবিক চাহিদা অর্থাৎ খাদ্যের চাহিদা নিবৃত্ত করতে হবে।শিক্ষার্থীদের মৌলিক চাহিদাই যদি পূরণ না হয় সেক্ষেত্রে তার বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা বা শিক্ষার চাহিদা পূরণ করতে যাওয়া নিরর্থক হবে। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যালয়ে

আগত শিক্ষার্থী যদি ক্ষুধার্ত থাকে তবে তার পক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করা কষ্টকর হবে। সে বিদ্যালয়ে আসলেও শ্রেণিকক্ষের পাঠে মনোনিবেশন করা কঠিন হবে। শিশুর খাদ্যের চাহিদা না থাকলেও অনেক সময় তারা বাড়িতে অবহেলিত হয় বা নিরাপত্তাহীনতা ভোগে সেক্ষেত্রেও তাদের পক্ষে পাঠে মনোনিবেশন করা কঠিন হয়ে পরে। বিদ্যালয়ও তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব হবে শিশুর পাশে দাঁড়ানো। তাঁদের স্নেহ, ভালোবাসা ও সহানুভূতিই পারে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি করতে। এছাড়া বিদ্যালয়ে কিছু শিক্ষার্থী থাকে যারা একাধিক গুণাবলিসম্পন্ন, যেমন- সঙ্গীত, নৃত্য, খেলাধুলার দক্ষতা ইত্যাদি। শিক্ষকগণ তাদের এই সুপ্ত গুণাবলিরবিকাশে ভূমিকা রাখতে পারেন। তাই বলা যায় যে, জীবনের চাহিদার পর্যায়টি জানা থাকলে শিক্ষকের জন্য সঠিক সময়ে ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয়।

**শিশুর শিখনে প্রেষণার প্রয়োজনীয়তা**

আমরা জীবনে যা কিছু করি তার সব কিছুর মৌলিক উৎস হলো প্রেষণা। প্রেষণার যথাযথ পরিতৃপ্তির মাধ্যমে মানুষ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। বিদ্যালয়েরপাঠে শিক্ষার্থীর আগ্রহ বা উচ্চ প্রেষণা থাকলে বিদ্যালয়ে তার ফলাফল ভাল হয়ে থাকে। আবার শেখার প্রতি প্রেষণা বা আগ্রহের অভাবে অনেক শিক্ষার্থীই বিদ্যালয়ে ভাল ফলাফল করতে ব্যর্থ হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষক বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষার্থীর মাঝে প্রেষণার সঞ্চার করতে পারেন। এরূপ কিছু কৌশল নিচে আলোচনা করা হলো-

১.প্রেষণার আচরণিক দৃষ্টিভঙ্গিঅনুযায়ীশিশু বা শিক্ষার্থীর প্রেষিত আচরণের মূল নির্ধারক হলো বাহ্যিক পুরস্কার বা শাস্তি।পুরস্কারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিখন উপযোগী প্রেষণা সৃষ্টি করা সম্ভব। বিভিন্ন ধরনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বলবর্ধক সৃষ্টিকারী উদ্দীপক ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি করা সম্ভব। তবে নিন্দা, ঠাট্টা, ভীতি প্রদর্শন ও শাস্তি অপেক্ষা যোগ্যতার স্বীকৃতি, প্রশংসা ও উৎসাহদান প্রেষণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর। শ্রেণিকক্ষে এসব কৌশলের ব্যবহার শিক্ষার্থীদের পঠিত বিষয়ের প্রতিআগ্রহী বা উৎসাহিতকরে তোলে, সঠিক আচরণ করার দিকে পরিচালিত করে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করা থেকে বিরত রাখে।

২. সফলতার অভিজ্ঞতা প্রেষণা সৃষ্টির জন্য সহায়ক। বিপরীতে, ব্যর্থতার অনুভূতি ব্যক্তির মাঝে হীনম্মন্যতা জাগায় এবং কর্মবিমুখ করে তোলে। সে কারণে সাফল্যের অভিজ্ঞতার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং ব্যর্থতাকে পরিহার করতে শেখানো প্রেষণা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কারণ যেকোনো সাফল্য বা কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার এবং প্রশংসা ব্যক্তিকে ভালো কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে তোলে।

৩.প্রেষণার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি আব্রাহাম মাশ্‌লোর (১৯৫৪,১৯৭১) চাহিদা তত্ত্বের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। অর্থাৎ উচ্চতর চাহিদার সন্তুষ্টির পূর্বে ব্যক্তির নির্দিষ্ট মৌলিক চাহিদাগুলো নিবৃত্তি বা সন্তুষ্টিলাভ করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ইতিবাচক গুণসমূহ, যেমন- অন্যের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া বা সহমর্মিতা প্রকাশ করা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত দক্ষতা বিকাশের ওপর জোর দিতে পারেন।

৪.প্রেষণার জ্ঞানীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি তার প্রেষণা বা চাহিদাকে পরিচালনা করে। শিক্ষার্থীর কোন কিছু অর্জনের জন্য অভ্যন্তরীণ প্রেষণা(Intrinsic motivation) অর্থাৎ তাদের ব্যক্তিগত

গুণাবলি এবং তারা সফলভাবে তাদের পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে- এই বিশ্বাস বিকাশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষক প্রেষণা সৃষ্টি করতে পারেন। প্রেষণার আচরণিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রেষণা হলো বাহ্যিক প্ররোচনা বা পুরস্কারের ফলাফল। অন্যদিকে জ্ঞানীয় দৃষ্টিভঙ্গি মনে করে কোনো কিছু অর্জনের জন্য বাহ্যিক চাপকে নিরুৎসাহিত করা উচিত। বরং শিক্ষার্থীদের সুযোগ দেয়া ও দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত, যাতে তারা নিজের কৃতিত্ব অর্জনের লক্ষ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৫.প্রেষণার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সম্পর্কের চাহিদা হলো অন্যের সাথে সৌহার্দ্যের বা নিরাপত্তার জন্য সম্পর্ক তৈরি করা। বিদ্যালয়ে যেসব শিক্ষার্থী যত্নশীল ও সম্মানযোগ্য আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের সুযোগ পায় তাদের মধ্যে বিদ্যালয়েরপ্রতি ইতিবাচক মনোভাব ও মূল্যবোধ তৈরি হয়।উপরন্তু বিদ্যালয়ে এসব শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনও ভালো হয়। সেকারণে শিক্ষকদের উচিত শিক্ষার্থীদের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরির সুযোগ সৃষ্টি করা।

৬.শিক্ষক মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা ও পরামর্শ(feedback)দিলে তারা অধিকতর প্রচেষ্টার সঙ্গে বিষয়টি শিখতে উৎসাহিত হবে। শিক্ষার্থীদের কোনো বিষয়, যেমন- গণিত বা ইংরেজিবিষয়টি শিখনের ক্ষেত্রে যদি শিক্ষক শিখনের অগ্রগতি সম্বন্ধে তাদের অবহিত করেন তবে শিক্ষার্থীরা আগ্রহের সাথে বিষয়টি শিখতে অনুপ্রাণিত হয়।

৭. যেকোনো কাজের ভালো ফলাফল ব্যক্তির মাঝে আত্মবিশ্বাস, মর্যাদা ও নিরাপত্তাবোধের অনুভূতি সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে ভালো করার ক্ষেত্রে প্রেষণা হিসেবে কাজ করে।

৮.অনেকের ধারণা এই যে, শাস্তি শক্তিশালী প্রেষণা হিসেবে কাজ করে। সাধারণত সমালোচনা, তিরস্কার, বহিষ্কার, শারীরিক শাস্তি ইত্যাদি শাস্তিরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শাস্তি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে বিধায় প্রেষণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে শাস্তি পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার্থীকে তার পছন্দসই বিষয়টি থেকে বঞ্চিত করা, যেমন- খেলার সময় তাকে খেলতে না দেয়া অথবা ক্লাসের শেষে তাকে অতিরিক্ত কোনো কাজ দেয়া ইত্যাদি।

সবশেষে বলা যায় যে, আমাদের সকল কর্মশক্তির মূল উৎস হলো প্রেষণা। প্রেষণা আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করে। শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রেষণার গুরুত্ব অনেক। শিক্ষকদের প্রেষণা সংক্রান্ত জ্ঞান শিক্ষার্থীদের চাহিদা সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনে সহায়তা করে থাকে।

## শিখন তত্ত্ব (Learning Theory)

শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন তত্ত্ব শিখন শেখানো প্রক্রিয়াকে আরো সঠিক এবং গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার উপায় বলে দেয়।জীবনের প্রতিটি মূহুর্তে মানুষ কিছু না কিছু শিখে থাকে। মানুষের সব ধরনের কার্যকলাপের মূলে রয়েছে শিখন। শিখনকে আচরণের যে কোন অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যা অনুশীলন বা অভ্যাসের ফলে সংঘটিত হয়(Morgan, King, Weiszand,& Schopler,1986; পৃ: ১৭০)। শিখন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। কারণ মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যুর পূর্বমূহুর্ত পর্যন্ত কিছু না কিছু শিখছে। শিখন সম্পর্কিত অনেক তত্ত্ব রয়েছেযা কতকগুলো ধারণা ও নীতির সমন্বয়ে গঠিত। শিখন সম্পর্কিত এসব তত্ত্বের মাধ্যমে শিখন কীভাবে সংগঠিত হয় বা মানুষকীভাবে শিখে তা অনুধাবন করা যায়।এ তত্ত্বগুলো থেকে শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অর্থপূর্ণ ধারণা লাভ করা সম্ভব।শিখন তত্ত্বের আলোচনার মূল বিষয় হলো-

মানুষ বা প্রাণী একইভাবেশেখে না। শিখনের তত্ত্বগুলোও মানুষ বা প্রাণীর শিখন প্রক্রিয়াকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছে। এসব ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে শিখনের তত্ত্বগুলোকে মোটামুটি চারটি প্রেক্ষিতে ভাগ করা যায়।

১. আচরণবাদী প্রেক্ষিত (Behavioristic Perspective)
২. জ্ঞানবাদী প্রেক্ষিত (Cognitivistic Perspective)
৩. মানবতাবাদী প্রেক্ষিত (Humanistic Perspective)
৪. সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত (Socialistic Perspective)

তবে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিশুদের শিখনের প্রকৃতি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিখন শেখানো প্রক্রিয়ারগভীরতা বিবেচনা করে এই অধ্যায়ের আলোচনায়শিখন মতবাদগুলোর মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত ও গ্রহণযোগ্যআচরণবাদ ও জ্ঞানবাদ মতবাদ দু'টির সামগ্রিক প্রেক্ষিত তুলে ধরা হলো:

## ১. আচরণবাদ

আচরণবাদীদের মতে শিখন হচ্ছে আচরণের পর্যবেক্ষণযোগ্য পরিবর্তন(Mergel,১৯৯৮) ।আচরণবাদীরা বিশ্বাস করেন, শিখন সংঘটনের মূল উপাদান হলো উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়া এবং এদের সম্মিলিত ফল। অন্যভাবে বলা যায়, শিখন হলো উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ ।প্রতিক্রিয়া বলতে যেকোন আচরণকে বোঝাতে পারে, উদ্দীপক বলতে যে কোন সংবেদনকে বোঝাতে পারে। তাঁদের মতে, প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়া একটি উদ্দীপক দ্বারা সৃষ্ট ।উদাহরণস্বরূপ, শিশুকে চাঁদ দেখিয়ে বলা হলো 'চাঁদ'। কয়েকবার ঐ চাঁদ দেখানোর সাথে সাথে 'চাঁদ' শব্দটি উচ্চারণ করা হলে, পরে 'চাঁদ' দেখিয়ে কোন শব্দ উচ্চারণ না করলেও শিশু বলবে 'চাঁদ'। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আচরণ ঘটার জন্য শিক্ষার্থীর নিকট উদ্দীপক উপস্থাপন করে উদ্দীপনা (stimulus) লাভের সুযোগ দেয়া হয়, এর আলোকে শিক্ষার্থী উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করে যার ফলে শিখন সংগঠিত হয় (response)এবং শিশু চাঁদ শব্দটি উচ্চারণ করতেশিখে। এখানে চাঁদও উদ্দীপক উদ্দীপনার প্রতি সাড়া দেয়া এবং এর ফলে পরবর্তী কালে আকাশে চাঁদ দেখলে বা চাঁদের মতো গোল কিছু দেখলে তা বলতে পারাই হলো শিখন। আচরণবাদে শিখন প্রক্রিয়ার এই উপাদানগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক নিম্নের চিত্রে উপস্থাপন করা হলো-

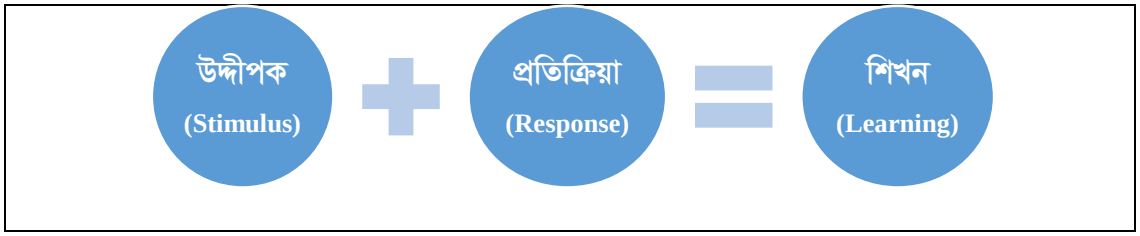


চত্র ১.৩: শিখন প্রক্রিয়ার উপাদানগুলোর মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক

শিখনের মাধ্যমে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সংযোগ বা অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়, সেগুলোকে আচরণবাদীরা বিভিন্নভাবে অভিহিত করেছেন। যেমন, কেউ বলেন অভ্যাস (Habits), কেউ বলেন উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার বন্ধন (S-R Bond), আবার কেউ বলেন সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া। আচরণবাদ তত্ত্ব অনুযায়ী আচরণ সংঘটনের জন্য বাহ্যিক পরিবেশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বা শর্ত। আর শেখানোর লক্ষ্য হচ্ছে নির্দিষ্ট উদ্দীপক (পরিবেশ) ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত আচরণ বের করে আনা ।আচরণবাদীরা মনে করেন

যে, শিখনের সাহায্যে আমরা আসলে কতগুলো অভ্যাস আয়ত্ত করি। নতুন কোন বিষয় শিখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রথমে অতীতের যেসব অভ্যাস বর্তমান শিখন পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সেসব অভ্যাসের সাহায্যে বিষয়টি শিখার চেষ্টা করে। পূর্বের অভ্যাসের সাথে মিল রেখে বিষয়টি আয়ত্তকরতে না পারলে ভুল ও চেষ্টা (trial and error approach)বা বারবার চর্চার মাধ্যমে ধীরে ধীরে তা করতে শিখে। শেখার বিষয়বস্তু এবং প্রক্রিয়ার বারবার চর্চা বা অনুশীলন এবং শেখার জন্য পুরস্কার বা বলবর্ধক(reinforcement)প্রয়োগ আচরণবাদীদের শিখন তত্ত্বেও বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আচরণবাদীদের মধ্যেযাদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন থর্নডাইক, ওয়াটসন, ওয়াটসন ও রায়নার,হাল, স্কিনার এবং প্যাভেলভ। আমরা এই অধ্যায়ে থর্নডাইক, প্যাভেলভ এবং স্কিনারের শিখনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করব।

**সংযোগবাদ(Connectionsim)**

Thorndike (1874-1949) তাঁর বিখ্যাত 'Animal Intelligence' গ্রন্থে (১৯৯৮) তাঁর সংযোগবাদ মতবাদটি প্রকাশ করেন। থর্নডাইকের মতে শিখন হলো উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নির্ভুল সংযোগ । তাঁর মতে মানুষ বা প্রাণী কোন বিষয় বার বার চেষ্টা করে ভুল ও ত্রুটির মাধ্যমে কোন কিছু শিখে। এই শিখন পদ্ধতিটিকে তিনি বলেছেন প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতি (Trial-and-Error Method)। প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে প্রাণি কীভাবে শিখে থর্নডাইক তাঁর পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। ক্ষুধার্ত বিড়াল নিয়ে তাঁর প্রসিদ্ধ পরীক্ষণটি নিচে উল্লেখ করা হলো।

***থর্নডাইকেরপরীক্ষণ***

থর্নডাইক পরীক্ষণের শুরুতে একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে খাঁচার মধ্যে রেখে একটুকরা মাছ খাঁচার বাইরে এমনভাবে রাখেন যাতে বিড়ালটা মাছটি দেখতে পায়। মাছটি এমন দূরত্বে রাখা ছিল যে, বিড়ালটি খাঁচা খুলে বাইরে আসলেই মাছটি পাবে। খাঁচার দরজাটা একটি ছিটকিনি দিয়ে এমনভাবে আটকানো ছিল যে অল্প চাপ লাগলেই ছিটকিনিটা খুলে যাবে। ক্ষুধার্ত বিড়ালটি প্রথমে খাঁচার ভিতর থেকে মাছটা পাবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো। বিড়ালটি কখনো খাঁচার মধ্যে ছুটোছুটি, কখনো আঁচড়াতে লাগলো, আবার কখনো কামড়াতে লাগলো।

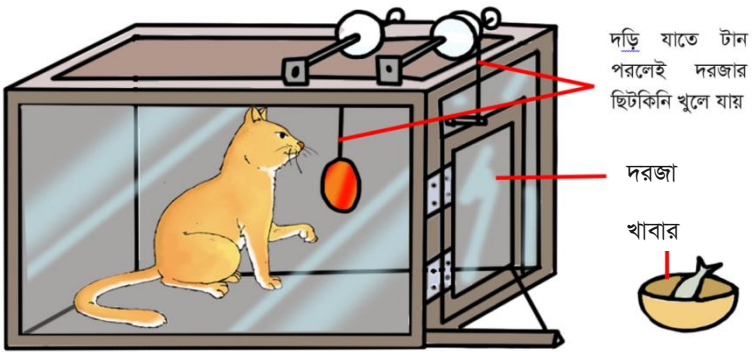


চিত্র ১.৪: থর্নডাইকের পরীক্ষণ

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ও এলোমেলো ভাবে চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ ছিটকিনির উপর বিড়ালটির পা লেগে দরজাটি খুলে যায়। বিড়ালটি বাইরে এসে ঐ খাবার খেল। বিড়ালটিকে আবার ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাঁচার মধ্যে রাখা হলে বিড়ালটি একইভাবে এলোমেলো চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ খাঁচার দরজা খুলে খাবারের কাছে পৌঁছাতে সমর্থ হলো। বিড়ালটি প্রথম দিনের তুলনায় দ্বিতীয় দিন কম ভুল করলো ও অপেক্ষাকৃত কত সময়ে খাঁচা থেকে বেড়িয়ে এলো। তৃতীয় দিনে তার প্রচেষ্টার সংখ্যা আরও কমে এলো এবং পূর্ব দিনের তুলনায় সময় আরও কম লাগল। এইভাবে পরীক্ষণ কাজটা চালিয়ে দেখা গেল যে, এক সময় বিড়ালটির ভুলের সংখ্যা কমে আসছে এবং সময় কম লাগছে। শেষকালে একদিন দেখা গেল বিড়ালটি আর একটাও ভুল প্রচেষ্টা করছে না। যখনই বিড়ালটি বার বার প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে উদ্দীপক (ছিটকিনির উপর চাপ) ও প্রতিক্রিয়ার (খাবার খাওয়া) মধ্যে সঠিক সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হল, তখনই তার ছিটকিনি খোলার শিখন সমাপ্ত হলো।

থর্নডাইকের প্রাণী সম্পর্কিত গবেষণাগুলো মানুষের শিখন সম্পর্কেও তার চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর মতে মানুষ ও প্রাণীর শিখন মূলত একই প্রক্রিয়ায় ঘটে। থর্নডাইক তিনটি মূখ্য নীতি বা সূত্রের মাধ্যমে শিখন কীভাবে হয়-তা ব্যাখ্যা করেন। সূত্র তিনটি হচ্ছে–

(ক) প্রস্তুতির সূত্র (Law of Readiness)

(খ) ফলাফলের সূত্র (Law of Effect)

(গ) অনুশীলনের সূত্র (Law of Exercise)

**(ক) প্রস্তুতির সূত্র**

থর্নডাইক বলেন, শিখনের প্রথম শর্ত হলো মানসিক প্রস্তুতি। শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি শেখার ইচ্ছা, তাড়না (Drive) বা আগ্রহ না থাকে তাহলে সে কোন কিছু শেখার জন্য ব্যস্ত হবে না। ফলে তার শিখন হবে না। শিখনের জন্য উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি ছাড়াও আরো একধরনের প্রস্তুতি সম্পর্কে শিক্ষকের জানা প্রয়োজন। সেটি হলো পাঠ্যাভাসের প্রস্তুতি বা Reading readiness। পাঠাভ্যাসের প্রস্তুতি হলো পড়াশুনা শুরুর পূর্বে শিশুর পরিপক্বতা বা পরিণমন (maturity) উপযুক্ত পর্যায়ে থাকতে হবে। প্রস্তুতি বলতে থর্নডাইক সরাসরি পরিপক্বতার কথা বলেননি। প্রস্তুতি বলতে তিনি প্রস্তুতিমূলক অভিযোজন-কে(Preparatory adjustment) বুঝিয়েছেন।

**(খ) ফলাফলের সূত্র**

উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ (S-R bond) দৃঢ়তর ও স্থায়ী হয় যদি প্রাণীর নিকট তা সন্তোষজনক হয়। বিপরীতে সংযোগের ফল যদি বিরক্তিকর হয় সেক্ষেত্রে সংযোগ দুর্বল হবে। অর্থাৎ প্রাণী সে কাজটি বারবার করে যেটি করে তৃপ্তি বা আনন্দ পাওয়া যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই সূত্রটির অনেক গুরুত্ব রয়েছে। শিক্ষক পুরস্কার বা সাফল্যের অনুভূতি সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনকে ত্বরান্বিত করতে পারেন। আবার শাস্তি বা ব্যর্থতার পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণকে অপসারণ করতে পারেন।

**(গ) অনুশীলনের সূত্র**

অনুশীলন নীতির দ্বারা থর্নডাইক সংযোগ বা অনুষঙ্গ(association) কীভাবে শক্তিশালী বা দুর্বল হয় তা ব্যাখ্যা করেছেন। অনুশীলন বেশি হলে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ বেশি শক্তিশালী হবে। অন্যদিকে

অনুশীলনের অভাবে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার সংযোগ দুর্বল হতে থাকে। অনুশীলন নীতি অনুযায়ী শিখন পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হলে - ক) প্রতিক্রিয়াটি (কাঙ্ক্ষিত শিখন) হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং খ) প্রতিক্রিয়াটি হওয়ার সম্ভাবনা দীর্ঘদিন পরও বর্তমান থাকে বা স্থায়ী হয় ।

তিনটি মূখ্য সূত্রের সাথে থর্নডাইক আরো পাঁচটি গৌনসূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন যা মানুষের শিখনের সাথে সম্পর্কিত। সূত্রগুলো হলো–

১. **একই উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of multiple response to the same stimulus):**এই নীতিতে বলা হয়েছে যে, মানুষ বা প্রাণীসমস্যার সম্মুখীন হলে একটির পর একটিঅর্থাৎ বহুসংখ্যক আচরণ প্রদর্শন করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। যখন সঠিক প্রতিক্রিয়াটি ঘটে তখনই সাফল্য আসে। সমস্যার মুখে প্রাণিটি যদি তার আচরণ পরিবর্তন করতে না পারত, অর্থাৎ বহু ধরনের আচরণের ক্ষমতা যদি তার না থাকত, তাহলে সঠিক প্রতিক্রিয়াটি কোনো দিন ঘটত না।

২. **দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিক অবস্থার সূত্র (Law of attitude, set of disposition):**শিখন প্রাণীর সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বা উন্মুখতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নীতি অনুযায়ী একজন ব্যক্তি কী করবে, কীসে সে আনন্দ পাবে, আর কীসে সে বিরক্ত হবে তা নির্ভর করে তার মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিক অবস্থার ওপর।

৩. **আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of partial activity):**এই নীতি অনুযায়ী একটি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর বেশি জোর দেয়। অর্থাৎ শিখনের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি/পরিবেশের কম গুরুত্বপূর্ণ বা অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বাদ দিয়ে শিক্ষার্থী শুধু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগী হয়।

৪. **সদৃশকরণ বা উপমানের সূত্র (Law of assimilation or analogy):** এটিকে আত্মীকরণের নীতি বা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়ার নীতি বলা যায়। একটি নতুন পরিবেশে বা পরিস্থিতিতে মানুষ পূর্বে একই ধরনের অবস্থায় যা করেছিল সেসব প্রতিক্রিয়া করবে।

৫. **অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র (Law of associative shifting):**এই নীতিতে বলা হয়েছে যে, একটি প্রতিক্রিয়াকে যদি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অপরিবর্তিত রাখা যায় তাহলে সেটিকে শেষ পর্যন্ত একটি নতুন উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়। যেমন, একটি বিড়ালকে এক টুকরা মাছ দেখিয়ে পেছনের দু'পায়ের উপর দাঁড়াতে শেখানোর পর যদিশুধু "দাঁড়াও" বলা হয় তালেই সে তা করতে শিখে।

*শিক্ষা ক্ষেত্রে সংযোগবাদ তত্ত্বের গুরুত্ব*

শিক্ষাক্ষেত্রে থর্নডাইকের শিখনের সূত্রসমূহের যথেষ্টগুরুত্ব রয়েছে। এ সূত্রগুলো কীভাবে কাজ করে নিচে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

১. শেখার জন্য শিক্ষার্থী মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত থাকলেইশিখন সম্ভব। শিক্ষার্থী মানসিক বা শারীরিকভাবে প্রস্তুত না থাকলেশিখন ব্যর্থ হবে। তাই শিক্ষক শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতার বাইরে জোর করে কিছু চাপিয়ে দিবেন না। তার দৈহিক পরিণমনের (Maturity)ওপর নির্ভর করেই তাকে শেখাবেন।

২. ফললাভের সূত্রে বলা হয়েছে যে, উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ তৃপ্তিকর বা আনন্দদায়ক হলে প্রাণী তা শেখে এবং শিখন স্থায়ী হয়। আর অতৃপ্তিকর হলে প্রাণী ভুলে যায়। শিখন স্থায়ী করতে হলে, শিক্ষক এমনভাবে পাঠদান করবেন যাতে পাঠ্য বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের নিকট আনন্দায়ক এবং বোধগম্য হয়। শিক্ষক পাঠদানের সময় সহজ হতে কঠিন বিষয়ের দিকে অগ্রসর হবেন। সহজ পাঠ দিয়ে আরম্ভ করলে শিক্ষার্থীরা সফলতার মধ্যে দিয়ে শিখবে। শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের প্রশংসাসূচক শব্দ (যেমন– বাহ্বা, বেশ, চমৎকার, ভাল

ইত্যাদি) ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের আনন্দদায়কভাবে কোন বিষয় শেখাতে পারেন। শিক্ষক উৎসাহ দান, স্বীকৃতি প্রদান, এমনকি মুখভঙ্গি দিয়েও শিক্ষার্থীকে পাঠে মনোযোগী করে তুলতে পারেন। শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে, প্রথমেই শিক্ষার্থীরা কঠিন সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হলে তাদের মাঝে হতাশা আসবে এবং শিখন বিষয়টি ভীতিকর হয়ে উঠবে।

৩. থর্নডাইকের অনুশীলনের সূত্রে বলা হয়েছে যে, শিখনের একটি শর্ত হচ্ছে বার বার চর্চা বা অনুশীলন করা। চর্চা না করলে শিক্ষার্থী শেখা জিনিস ভুলে যাবে। কবিতা, বানান, নামতাইত্যাদি শেখানোর সময় শিক্ষার্থীদেরকে অনুশীলনের সুযোগ দিতে হবে যাতে তারা বিষয়টিভালোভাবে শিখতে পারে।

মূখ্য নীতি বা সূত্রের মতে থর্নডাইকের গৌন সূত্রগুলোকেও শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে, যেমন–

ক. শিক্ষার্থীদের নিজেদের চেষ্টা বাবহু ধরনের আচরণের ক্ষমতা দ্বারা কোন সমস্যা সমাধান করার সুযোগ দিতে হবে।

খ. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোভাব বাদৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিক অবস্থারপ্রতি লক্ষ্য রেখেশ্রেণিতে পাঠদানের জন্য আনন্দদায়ক ও সুখকর পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যাতে শিখনকে ত্বরান্বিত হয়।

গ. পাঠ সহায়ক করার জন্য শিক্ষক পাঠ্য বিষয়ের বিভিন্ন অংশের কম গুরুত্বপূর্ণ বা অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বাদ দিয়ে শুধু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ বা মনোযোগী করবেন।

ঘ. শিক্ষার্থীদের অজানা বা কঠিন বিষয় শেখানোর সময় জানা থেকে অজানা এবং সহজ থেকে কঠিন বিষয় সাদৃশ্যের ভিত্তিতে শেখাবেন।

## চিরায়ত সাপেক্ষীকরণ (Classical Conditioning)

চিরায়ত সাপেক্ষীকরণের প্রবর্তক হলেন স্বনামধন্য রাশিয়ান শারীর তত্ত্ববিদ Ivan P. Paulov (১৮৪৯-১৯৩৬)। সাপেক্ষীকরণ বা সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Conditioning) বলতে বুঝায় একটি নিরপেক্ষ উদ্দীপককে (Neutral stimulus) স্বাভাবিক উদ্দীপকের (Unconditioned stimulus) সাথে বার বার সংযুক্ত করলে এক সময় নিরপেক্ষ উদ্দীপকটি নিজেই সাপেক্ষ উদ্দীপকের (Conditioned stmulus) মত কাজ করে এবং সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়াটি করতে সক্ষম হয়। সাপেক্ষীকরণের মাধ্যমে প্রাণী কীভাবে শেখে তা ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি যে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষণটি করেছিলেন তা নিচে বর্ণনা করা হলো-

### *প্যাভলভের পরীক্ষণ*

প্যাভলভের তার পরীক্ষণটি একটি ক্ষুধার্ত কুকুরের ওপর করেছিলেন। তিনি পরিক্ষণটি করার জন্য পরীক্ষাগারটিকে এমনভাবে সজ্জিত করেন যাতে যান্ত্রিক উপায়ে মাংস কুকুরের মুখে পরিবেশন করা সম্ভব ছিল এবং পরীক্ষক একটি কক্ষ থেকে সবকিছুই দেখতে পেতেন। তবে কুকুরটি পরীক্ষককে দেখতে পেত না। পরীক্ষণের শুরুতে মেট্রোনোম নামক এক ধরনের পরিমাপক ঘড়ি চালিয়ে দেওয়া হয়। কুকুরটিকে প্রথমে ঘড়ির টিক টিক শব্দ শোনানো হয়। দেখা গেল টিক টিক শব্দ শুনে কুকুরটি প্রথমে কান খাড়া করে, তবে লালাক্ষরণ করে না। এক্ষেত্রে টিক টিক শব্দটি নিরপেক্ষ উদ্দীপক (Neutral stimulus)। কয়েক সেকেন্ড পরে কুকুরটিকে মাংস দেয়া হলো। দেখা গেল, এখন লালা নির্গত হচ্ছে এবং পরিমাপক বোতলটিতে জমা হচ্ছে। এখানে ক্ষুধার্ত কুকুরটির কাছে মাংস ছিল স্বাভাবিক উদ্দীপক (Unconditioned stimulus) এবং লালাক্ষরণ ছিল স্বাভাবিক

প্রতিক্রিয়া(Unconditioned response)।

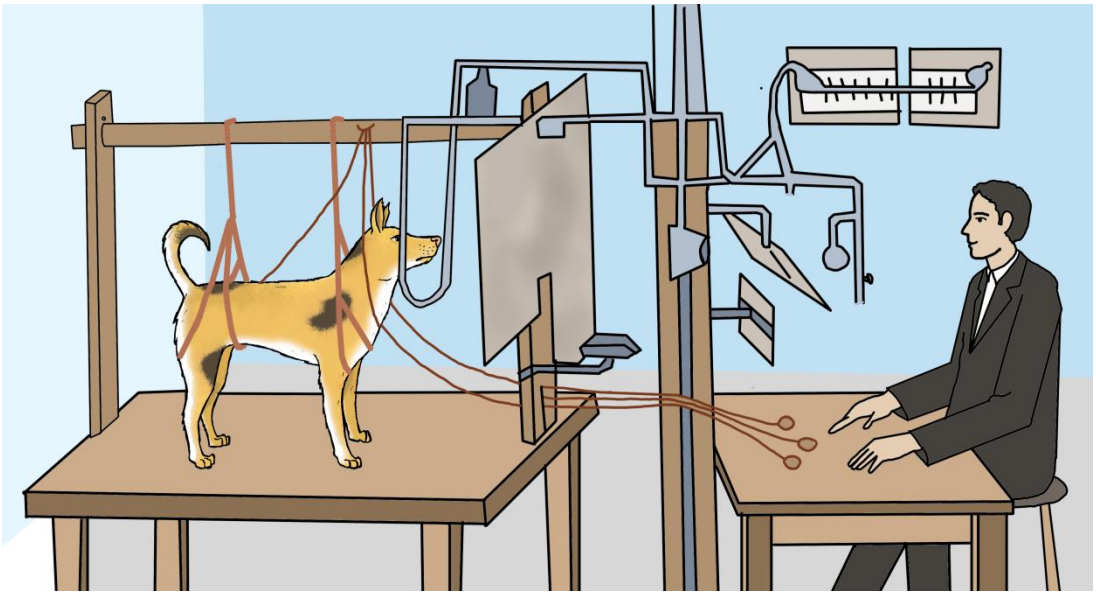

চিত্র ১.৫: প্যাভলভের পরীক্ষণ

পরীক্ষক এরপর প্রথমে টিক টিক শব্দ শোনানোর পর পরই কুকুরটিকে মাংস দেওয়া শুরু করলেন। বেশ কয়েকবার টিক টিক শব্দের পর পরই কুকুরটিকে মাংস দেওয়ার এক পর্যায়ে দেখা গেল মাংস না দিলেও শুধুমাত্র টিক টিক শব্দ করলেই কুকুরটির মুখ থেকে লালা নির্গত হচ্ছে। এখানে টিক টিক শব্দটিই হচ্ছে সাপেক্ষ উদ্দীপক (Conditioned stimulus)এবং এই টিক টিক শব্দটিকে মাংসের সাথে উপস্থাপন করে সাপেক্ষীকরণ (Conditioned) করা হয়েছে।

সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়াটিকে নিচে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| স্বাভাবিক উদ্দীপক (মাংস) | → | স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (লালাক্ষরণ) | | |
| নিরপেক্ষ উদ্দীপক (টিক টিক শব্দ) | → | স্বাভাবিক উদ্দীপক (মাংস) | → | স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (লালাক্ষরণ) |
| সাপেক্ষ উদ্দীপক (টিক টিক শব্দ) | → | সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (লালাক্ষরণ) | | |

চিত্র ১.৬: চিরায়ত সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়া

***শিক্ষাক্ষেত্রে চিরায়ত সাপেক্ষীকরণের গুরুত্ব***

শিক্ষাক্ষেত্রে চিরায়ত সাপেক্ষীকরণ তত্ত্বের গুরুত্ব অনেক। কারণ এই তত্ত্ব অনুসারে শিক্ষালব্ধ বিভিন্ন ধরনের অভ্যাস, শিক্ষা, শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি সবকিছুই হলো এক ধরনের অবিচ্ছিন্ন সাপেক্ষ প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়া। এরূপ কিছু গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো-

১. শিশুর ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া বা সাপেক্ষীকরণেরবেশ অবদান রয়েছে। সাপেক্ষীকরণের মাধ্যমেই শিশু বিভিন্ন বস্তুর নামগুলো শিখে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, শিশু জীবনের শুরুতে কেবল কতগুলো অর্থহীন শব্দ করতে পারে। যখন তার ভাষার বিকাশ হতে থাকে তখন সে দেখে কোন বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করলে সাধারণত সে যা চায় তাই পায়। উদাহরণস্বরূপ, গ্লাসের সাথে পানি অথবা ফিডারের সাথে দুধকে সংযোগ করার মাধ্যমে তার চাহিদা বুঝানোর চেষ্টা করে। এভাবেই ধীরে ধীরে সে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু দেখলে বা বোঝাতে গেলে ঐ শব্দটি উচ্চারণ করে।

২. শিশুদের অনেক অভ্যাস, যেমন– সকালে ঘুম থেকে ওঠা, বিশেষ সময়ে খাওয়া, পড়তে বসা কিংবা বিছানায় শুতে যাওয়া ইত্যাদি সাপেক্ষীকরণের মাধ্যমেই গড়ে তোলা যায়।

৩. আবেগিক বিকাশের ক্ষেত্রে সাপেক্ষীকরণের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ভয়, ঘৃণা, বিরক্তি, পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতি মনোভাবগুলো সাপেক্ষীকরণের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যালয়ে শিক্ষকের আচরণ বা তাঁর শেখানোর পদ্ধতি যদি শিক্ষার্থীর কাছে বিরক্তিকর বা ভীতিকর হয়, তবে ঐ পদ্ধতি বা শিক্ষকের প্রতি যে ভয় তা পাঠ্য বিষয়টিতে সঞ্চালিত হয়। শিক্ষণ পদ্ধতির ত্রুটি বা অন্য কোন অপ্রাসঙ্গিক কারণ থেকে উদ্ভূত আবেগ যেন শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষক ও স্কুলের প্রতি শিক্ষার্থীদের ভয় বা বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি না করে সেদিকে পিতামাতা ও শিক্ষক সকলকেই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

৪. শুধু ভাল অভ্যাস গঠনে নয় খারাপ বা নেতিবাচক অভ্যাস বর্জনেও প্যাভলভের সাপেক্ষীকরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। খারাপ অভ্যাস বর্জনের বা বিলুপ্তির জন্য প্রয়োজন পুরস্কারটি অপসারণ করা।

**করণ শিখন (Operant Conditioning)**

Burrhus Frederic Skinner (১৯০৪) করণ শিখনের প্রবর্তক।স্কিনারের মতে, প্রাণী সেই আচরণই শেখে যা তার কোন প্রয়োজন বা অভাব মেটায়। যেমন– শিশু ক্ষুধা পেলেই কাঁদে, কান্নাকে সে খাবার পাওয়ার কৌশল(Instrument)হিসেবে ব্যবহার করে। তাই বলা যায়, যে আচরণ মানুষ বা প্রাণীর জীবনে কোন প্রেষণা বা অভাব মেটায় সে আচরণ শেখাকেই বলা হয়করণ শিখন । করণ আচরণ শেখার প্রক্রিয়ায় কোন একটি নির্দিষ্ট অবস্থার প্রেক্ষিতে আচরণ সংঘটিত হয় এবং সংঘটিত আচরণের জন্য বলবর্ধক দিয়ে সে আচরণকে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করা হয়। এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় সাপেক্ষীকরণ (Conditioning)। করণ সাপেক্ষীকরণে কোন নির্দিষ্ট আচরণের প্রতি প্রতিক্রিয়া করার জন্য আগে থেকে কোনো উদ্দীপক ব্যবহার করা হয় না। বরং প্রতিক্রিয়া বা আচরণ সংঘটনের পর প্রাণী পুরস্কার পায়, যাকেবলে বলবর্ধক (Reinforcement)। প্রাণী কীভাবে শেখে তার ওপর স্কিনার যে পরীক্ষণ করেছিলেন তা নিচে বর্ণনা করা হলো।

*স্কিনারের পরীক্ষণ*

বি.এফ. স্কিনার একটি ক্ষুধার্ত ইঁদুর নিয়ে তাঁর পরীক্ষণটি করেন। পরীক্ষণটি করার জন্য তিনি একটি বাক্স বা খাঁচা ব্যবহার করেন যাকে বলা হয় স্কিনার বক্স (Skinner Box)। এই যন্ত্রের এক পাশে একটি চাবি আছে। চাবিটিতে চাপ দিলে বক্সের ভিতর নির্দিষ্ট একটা পাত্রে পানি বা খাদ্য যান্ত্রিক উপায়ে উপস্থিত হয়।

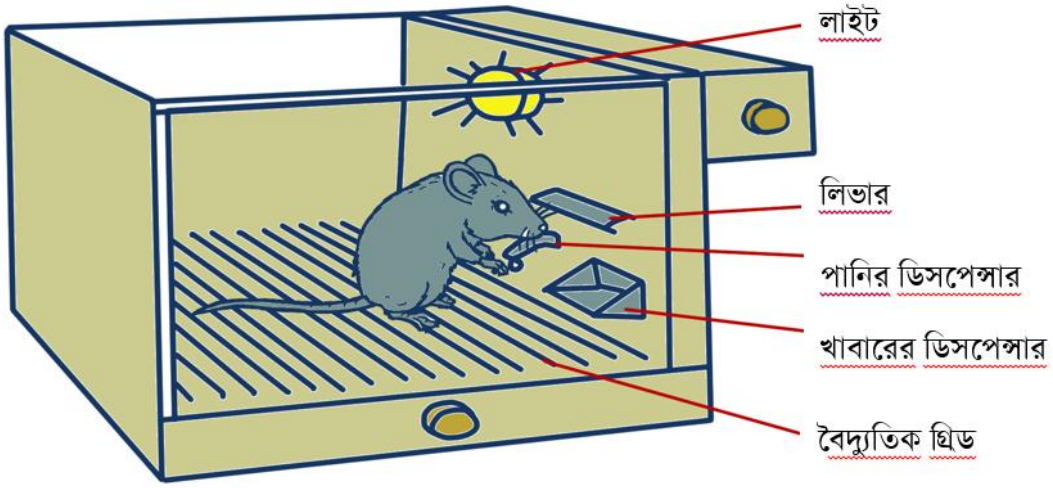


চিত্র ১.৭: স্কিনারের বক্স ও পরীক্ষণ

খাবার খোঁজার জন্য ক্ষুধার্ত ইঁদুরটি খাঁচার ভেতর ছুটোছুটি করার সময় হঠাৎ একবার চাবিতে চাপ পড়ে যায়। চাবিতে চাপ পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে খাঁচার ভেতর খাবার চলে আসে এবং ইঁদুরটি খাবার খায়। তবে ইঁদুরটি প্রথমে খেয়ালই করেনি যে, চাবিতে চাপ দেওয়াতে খাবার এসেছে। এরপর ইঁদুর খাবারের আশায় আবার ছুটোছুটি করতে লাগলো। এভাবে দ্বিতীয়বার হঠাৎ করে চাবিতে পড়ার সাথে সাথে আবার খাবার আসলো। তৃতীয়বারও ইঁদুরটি দৈবাৎ চাবিতে চাপ দিল এবং খাবার আসলে ইঁদুরটি খেল। চতুর্থবার চাবিতে চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইঁদুরটি খাবার খেতে ঢুকলো। কারণ ইঁদুরটি ইতোমধ্যে বুঝে গেল যে চাবিতে চাপ দেওয়ার সাথে খাবার পাওয়ার একটি সম্পর্ক রয়েছে। এরপর ইঁদুরটি খুব ঘন ঘন চাবিতে চাপ দিতে লাগলো খাবারের জন্য। এখানে ইঁদুরটি চাবি চাপ দেওয়া ও খাবার পাওয়ার সাথে সংযোগ স্থাপন করে খাবার খেতে শিখলো।

***বলবর্ধক(Reinforcement)কী?***

কোন উদ্দীপক যদি একটি প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা বা হার বৃদ্ধি করে তবে তাকে বলা হয় বলবর্ধক। অর্থাৎ প্রাণীপুরস্কারের লোভে সেটি বারবার করতে চায়। বলবর্ধনদু'ধরনের, যেমন-

- ধনাত্মক বলবর্ধন (Positive Reinforcement)এবং
- ঋণাত্মক বলবর্ধন (Negative Reinforcement)।

ধনাত্মক বলবর্ধন হলো এমন একটি শর্ত, যার উপস্থিতিতে প্রাণীর মধ্যে নির্দিষ্ট আচরণ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, ঋণাত্মক বলবর্ধনপ্রাণীকে কোনো কাজ পুনরায় করতে নিরুৎসাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, স্কিনারের পরীক্ষণে ইঁদুরটি চাবিতে চাপ (প্রতিক্রিয়া) দিয়েখাবার (পুরস্কার বা ধনাত্মক বলবর্ধক) পেত বলেই সেঐ প্রতিক্রিয়াটি বারবার করত। প্রতিক্রিয়ার পর যদিখাবারেরপরিবর্তেবৈদ্যুতিক শক (ঋণাত্মক বলবর্ধক) দেয়া হয় তবে ইঁদুরটি আর চাবিতে চাপ দিবে না অর্থাৎ আচরণ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

আচরণ শেখানোর জন্য বলবর্ধক কীভাবে দেওয়া হবে তার জন্য একটি অনুসূচি(Schedule)অনুসরণ করা হয়। বলবর্ধক কখন প্রদান হবে আর কখন হবে নাতা নির্ধারণ করা হয় বলবর্ধনের অনুসূচির(Schedule of Reinforcement) মাধ্যমে। বলবর্ধনের অনুসূচিদু'ধরনের, যেমন-

(ক) অবিরাম বলবর্ধন (Continuous Reinforcement) ও

(খ) সবিরাম বলবর্ধন (Partial Reinforcement)

প্রাণী যতবার কাঙ্ক্ষিতআচরণ করবে অর্থাৎ চাবিতে চাপ দিবেততবারই যদি বলবর্ধক (খাবার) প্রদান করা হয়, তবে তাকে অবিরাম বলবর্ধন বলে।যদি প্রতিটি আচরণের পর বলবর্ধক না দিয়ে মাঝে মাঝে বলবর্ধক প্রদান করা হয় তবে সেটিকে বলে সবিরাম বলবর্ধন। প্রকৃতি অনুযায়ী সবিরাম বলবর্ধনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন- অনুপাতভিত্তিক অনুসূচি (Ratio Schedule)এবং সময়ভিত্তিক অনুসূচি (Interval Schedule)।প্রতি আচরণে বলবর্ধক না দিয়ে কতটি আচরণ পর বলবর্ধক প্রদান করা হবে তা অনুপাতভিত্তিক অনুসূচির মধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। আর সময়ভিত্তিক অনুসূচিরমাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় যে কত সময় পর পর বলবর্ধন দেয়া হবে।

*শিক্ষাক্ষেত্রে স্কিনারের মতবাদের গুরুত্ব*

প্রাণীর ও মানুষের সব রকমের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। করণ শিখনের মূল কথাই হচ্ছে প্রাণীর সন্তুষ্টি বা তৃপ্তি লাভ যাকে স্কিনার বলেছেন পুরস্কার অর্থাৎ বলবৃদ্ধি (Reinfroement)। কোনো আচরণের পরিবর্তন বা শিখন তখনই সম্ভব হবে যখন তা করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি বা প্রাণী পুরস্কৃত হয়। শ্রেণি শিখনকে সার্থক করতে হলে শিক্ষার্থীর নতুন আচরণকে বিভিন্ন উপায়ে বলবর্ধন প্রয়োগ করতে হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে স্কিনারের তত্ত্ব বা মতবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে।

১. কাঙ্ক্ষিতআচরণ বা শিখন সাধনের জন্য শিক্ষককে যথাযথ সংকেত বা পুরস্কার দিতে হবে।

২. শিখন পদ্ধতির প্রত্যেকটি স্তর হবে সংক্ষিপ্ত এবং তা আগের শেখা আচরণের ওপর ভিত্তি করে হবে।

৩. শিখনের প্রথম দিকে পুরস্কার দিতে হবে। ক্রমান্বয়ে পুরস্কার কমিয়ে এনে তা মাঝে মাঝে সতর্কতার সাথে দিতে হবে।এতে শিক্ষার্থীর সঠিক আচরণ বা শিখন দীর্ঘস্থায়ী হবে।

৪. সঠিক আচরণ বা প্রতিক্রিয়া করার পরপরই পুরস্কার দিতে হবে কারণ পুরস্কার দিতে বিলম্ব হলে শিখন বিঘ্নিত হতে পারে।

## ২. জ্ঞানবাদ

জ্ঞানবাদ শিখনের আধুনিক তত্ত্ব যা শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সক্ষমতার পাশাপাশি তার পূর্ব অভিজ্ঞতা, মানসিক সংগঠন ও বিশ্বাসের প্রভাবের কথা স্বীকার করে। এই মতবাদে শিক্ষার্থী কীভাবে শেখে এবং জ্ঞানের প্রকৃতি কেমন তা ব্যাখ্যা করে। জ্ঞানবাদী তত্ত্বের মধ্যে সমগ্রতাবাদ ও গঠনবাদ তত্ত্ব অন্যতম। সমগ্রতাবাদে শিখনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রত্যক্ষণ ও অন্তর্দৃষ্টিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। অন্যদিকে গঠনবাদে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় যা অধিকাংশক্ষেত্রে শিখনে সহায়তা করে। গঠনবাদের ক্ষেত্রেভিগটস্কির সামাজিক গঠনবাদ মতবাদ অন্যতম যা শিখনের ক্ষেত্রে শিশুর সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাবের কথা স্বীকার এবং শিখন প্রক্রিয়ায় বিদ্যালয় ও সমাজের সংযোগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

আচরণবাদীরা শিখনের ফলকে পরিমাপ করেন উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া হিসাবে কিন্তু সেই প্রতিক্রিয়ায় মানসিক কোন সংযুক্তি থাকে কিনা তা বিবেচনা করা হয় না। কিন্তু শিখনে উদ্দীপক ছাড়া আরও কিছু জড়িত থাকে যা আচরণবাদীরা খুব বেশি গুরুত্ব দেন না। এই অতিরিক্ত উপাদানটি হলো জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া। জ্ঞানবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে মনে করা হয় শিখন হলো ব্যক্তির নিজস্ব ও অন্তর্নিহিত কোন এক প্রক্রিয়া যা শিখন সম্পাদন করে থাকে। তাদের কাছে শিখন একটি প্রক্রিয়াজাত বিষয় এবং এটি সরাসরি পরিমাপ করা যায় না বরং তা

ব্যাখ্যার বিষয়। তাদের মতে মানুষ বা প্রাণী উদ্দীপকের প্রভাবে যা শিখছে তা বোঝা যাবে তার আচরণ দেখে। সুতরাং আচরণ হচ্ছে শিখনের একটি ইন্ডিকেটর বা নির্ণায়ক মাত্র।

শিখনের জ্ঞানবাদী মতবাদ তুলনামূলক নতুন এবং এর সৃষ্টি হয়েছে আচরণবাদী মতবাদের সীমাবদ্ধতাগুলোকে বিবেচনায় এনে। কারণ মানুষের অনেক জটিল আচরণের ব্যাখ্যা আচরণবাদের আলোকে দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তাছাড়া কম্পিউটার ও নিউরোসাইন্সের উন্নতির ফলে শিখনের অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়াগুলো যান্ত্রিকভাবে দেখা সম্ভব হয়েছে। ফলে জ্ঞানবাদী মতবাদ শিখনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে এবং আধুনিক শিক্ষায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যারা এই মতবাদের পক্ষে নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন তারা হলেনওয়ার্দিমার, কোহলার ও কাফকার সমগ্রতাবাদ (Guestal Theory)এবং পিঁয়াজে, ভাইগটস্কি, ব্রুনার, অসুবেল প্রমুখের তত্ত্বের আলোকে প্রণীত গঠনবাদ (Constructivism)। এছাড়া কার্ট লিউইনের ফিল্ড থিওরিওসিগমন্ড ফ্রয়েডের মনসমীক্ষণবাদএর মধ্যেও জ্ঞানবাদের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। পরবর্তী আলোচনায় সমগ্রতাবাদ ও গঠনবাদ তত্ত্ব দু'টি বিশ্লেষণ করা হলো:

**সমগ্রতাবাদ (Guestal Theory)**

জার্মানিতে ১৯১২ সালে ম্যাক্স ওয়ার্দিমার কর্তৃক গেস্টাল মতবাদের বিকাশ ঘটে। গেস্টাল একটি জার্মান শব্দ যার অর্থ রূপ অথবা আকার। শব্দটিকে পরে বাংলায় সমগ্রতাবাদ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সমগ্রতাবাদীরা মনে করেন যে, কেবল উদ্দীপক অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া ঘটে না। বরং ব্যক্তি উদ্দীপককে কীভাবে প্রত্যক্ষণ করে এবং প্রত্যক্ষণ অনুযায়ী কীভাবে সাজায় তার ওপর নির্ভর করে তার প্রতিক্রিয়া ঘটে। এ কারণেই একই উদ্দীপকের প্রেক্ষিতে সবার প্রতিক্রিয়া সমান হয় না। মূলত উদ্দীপককে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞানীগণ দীর্ঘদিন গবেষণা চালিয়ে অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন তত্ত্ব প্রদান করেন। তারা একটি শিম্পাঞ্জি নিয়ে এই গবেষণাটি করেন। শিম্পাঞ্জিটি খাঁচায় রেখে তার ভেতরে ২টি লাঠি এমনভাবে রাখলেন যাদের দুটিকে একত্রে জোড়া দিয়ে লম্বা করা যায়। এবার খাঁচার বাইরে একটি কলা এমনভাবে রাখলেন যা হাত বাড়িয়ে আনা যায় না, আবার কেবল একটি লাঠি দিয়েও আনা যায় না। কিন্তু দুটি লাঠি জোড়া দিয়ে লম্বা করে সেটা আনা যায়। শিম্পাঞ্জিটি বহু চেষ্টা করেও হাত, পা বা একটি লাঠি দিয়ে কলার নাগাল পেল না। অতএব সে যখন ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বসেছিল তখন হঠাৎ করেই তার মনে লাঠি জোড়া দেওয়ার চিন্তা আসলো এবং মুহূর্তের মধ্যে উঠে গিয়ে তাই করলো। লম্বা লাঠি দিয়ে কলা পাওয়া সহজ হলো এবং তা খেতে পারলো।

এই পরীক্ষণে লাঠি জোড়া দেওয়ার শিখনটি কোন প্রচেষ্টার ফল নয়, আবার সরাসরি উদ্দীপকের কারণেও ঘটেনি। বরং শিম্পাঞ্জিটির মনে হঠাৎ করেই চিন্তাটি আসে, যাকে এর তাত্ত্বিকগণ অন্তর্দৃষ্টি হিসেবে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ শিম্পাঞ্জিটি কলা খাওয়ার জন্য তার অন্তর্দৃষ্টিকে কাজে লাগিয়েছে। কোন শিখন পরিস্থিতিতে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোগ ঘটানোর কাজটি অনুশীলন অথবা বলবর্ধক ছাড়া কীভাবে সম্পাদিত হয় তা আচরণবাদ মতবাদে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে অন্তর্দৃষ্টিমূলক মতবাদের আলোকে জ্ঞানবাদী তাত্ত্বিকরা এর ব্যাখ্যা দিতে পারেন। মূলত অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন একটি সমগ্রতাবাদী বিষয়; কারণ এখানে সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রাণীর চিন্তা চেতনায় প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি হয় এবং সে অনুযায়ী আচরণ সম্পন্ন করে।

**গঠনবাদ (Constructivism)**

গঠনবাদের মূলধারণা হলো ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী কোনো তথ্য বা জ্ঞানকে সরাসরি গ্রহণ করে না বরং কোন কিছু সম্পর্কে তার শিখন হয়ে থাকে ধারণা গঠন ও পুনর্গঠনের মাধ্যমে।জ্ঞান কীভাবে গঠন হবে তা নির্ভর করে ব্যক্তি বা শিক্ষার্থী পূর্ব অভিজ্ঞতা, মানসিক সংগঠন এবং বিশ্বাসের ওপর। এই ধারণা গঠনের মূল উপাদান হলো সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বা ভাষা। গঠনবাদীদের মতে, শিশুরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান করে তার চারপাশে পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা গঠন করে এবং নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন করে। শিখন মতবাদগুলোর মধ্যে বর্তমানে গঠনবাদ অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী একটি মতবাদ। এই মতবাদদ্বারা শিক্ষার্থী কীভাবে শেখে এবং জ্ঞানের প্রকৃতি কীরূপ হবে-তা ব্যাখ্যা করা যায়। যাদের কাজের মধ্য দিয়ে গঠনবাদের বিকাশ ঘটেছে, সমৃদ্ধ হয়েছে তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন জন ডিউই (John Dewe), জ্যাঁ পিয়াজে (Jean Piaget),ভিগট্স্কি (L. S. Vigotsky), ব্রুনার (Jerome Bruner)প্রমুখ। কারো কারো মতে, গঠনবাদের প্রধান পথিকৃৎ হলেন জন ডিউইযিনি কর্তৃত্বপরায়ণ শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার (authoreterian process) পরিবর্তে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক শিক্ষা পদ্ধতির কথা বলেন।তিনি এটিকে প্রগতিশীল শিক্ষা (progressive education) পদ্ধতিবলেছেন। এই প্রগতিশীল শিক্ষাই পরে জ্ঞানীয় মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গঠনবাদ (constructivism)নামে আত্মপ্রকাশ করে।গঠনবাদের প্রকৃতি তিনটি মৌলিক তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেমন (হক এবং হোসেন, ২০১৫)

১. বর্তমানে অর্জিত শিখনের ভিত তৈরি হয়েছে পূর্ববর্তী শিখনের কাঠামোর উপর;
২. সকল শিখনই তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; এবং
৩. বিষয়ের অর্থ বা সংবোধন নির্ভর করে অন্যান্য বিষয়ের আন্তঃসম্পর্কের ওপর।

গঠনবাদকে দুইটি ধারায় ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে, যেমন– (১) জ্ঞানমূলক গঠনবাদ (Cognitive constructivism) ও (২) সামাজিক গঠনবাদ (Social constructivism) । এই অধ্যায়ে আমরা শুধু সামাজিক গঠনবাদের অন্তর্ভুক্ত ভিগট্স্কির মতবাদ নিয়ে আলোচনা করব।

*শিখন প্রক্রিয়ায় গঠনবাদেরপ্রয়োজনীয়তা*

শিক্ষার ক্ষেত্রে গঠনবাদের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। শিক্ষকের গঠনবাদ সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে তা শিক্ষাদান কাজে লাগাতে পারেন।এই মতবাদে অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা একেবারেই শূন্য জ্ঞান নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে না, বরং তার কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে এবং তার চিন্তা করার ও ভিন্নমত প্রকাশ করার ক্ষমতা রয়েছে। শিক্ষার্থীর কাছে কোন নতুন তথ্য উপস্থাপন করা হলে সে তার অভিজ্ঞতা ও প্রতিফলনের মাধ্যমে জ্ঞান বা ধারণাকে পুনর্গঠন করে। অর্থাৎ প্রত্যেক শিক্ষার্থী ব্যক্তিগতভাবে বা সামষ্টিকভাবে নতুন তথ্যের অর্থ গঠন কওে শেখে।গঠনবাদঅনুসারে অর্থ গঠন বা তৈরি করার প্রক্রিয়াই হলো শিখন।এ ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক তার শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু ও তার চিন্তার মধ্যে মিথস্ক্রিয়া করার এবং শিক্ষার্থীকে তার নিজস্ব ধারণা তৈরি করার সুযোগ দেবেন। শিক্ষাবিদগণ গঠনবাদ অনুসারে শিখন কেমন হতে পারে তার কিছু নীতিমালা প্রদান করেছেন। শিক্ষকরা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করতে পারেন।

১. শিখন একটি সক্রিয় প্রক্রিয়া। তাই শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে।
২. গঠনবাদ অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয়েরঅর্থ গঠন বা তৈরি করার প্রক্রিয়াই হলো শিখন যা মানসিকভাবে সংঘটিত হয়। তাই শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নিজস্ব ধারণা তৈরি ও চিন্তার জন্য শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দিতে হবে।

৩. শিখনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানহলো ভাষা। সুতরাং শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে তার মাতৃভাষায় প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করা প্রয়োজন।

৪. শিখনের জন্য প্রয়োজনপূর্বজ্ঞান যার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী নতুন জ্ঞান আহরণ করবে। তাই শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় বিষয়বস্তু এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর তার পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন বিষয় শিখতে পারে।

৫. শিখন একটি সামাজিক এবং সামষ্টিক কার্যাবলি। আর এই কার্যাবলির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সামাজিক প্রেক্ষাপট, কথপোকথন বা ভাষা ও মিথস্ক্রিয়া। এগুলোর মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরজ্ঞানের বিকাশ ঘটে।সে কারণে শিক্ষণ প্রক্রিয়ায়শিক্ষার্থীদের জন্যমিথস্ক্রিয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক, সহপাঠী, বন্ধু, পরিবার এবং আশপাশের ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা বা গুরুত্ব রয়েছে।

গঠনবাদী শিখন পদ্ধতি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক। এই মতবাদে মুখস্থবিদ্যা এবং শিক্ষক নির্ভরতা পরিহার করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় পাঠদানে সমস্যাযুক্ত বিষয়বস্তু উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীর উদ্ভাবনী ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। ধারণা করা হয় যে, বাহ্যিক বলবর্ধনের চেয়ে অন্তস্থ বলবর্ধন প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে শিখন প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করলে শিখন কার্যকর হবে।

*সামাজিক গঠনবাদ: ভিগট্স্কির শিখন মতবাদ*

L. S. Vigotsky-রশিখন মতবাদটি ১৯২০ ও ১৯৩০ দশকের দিকে দিলেও পাশ্চাত্য বিশ্বে তাঁর মতবাদটি ১৯৫০ দশকে পরিচিতি লাভ করে। ভিগট্স্কিরশিখন মতবাদের মূলধারণা হলো সামাজিক মিথস্ক্রিয়া(Social interaction)অর্থাৎ সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে সক্রিয় মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর জ্ঞানের কাঠামোতে পরিবর্তনের ফলে তার জ্ঞানমূলক বা বুদ্ধি বিকাশ ঘটে। ভিগট্স্কি মনে করেন এই মিথস্ক্রিয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো ভাষা। এছাড়া তিনি তাঁর 'Thought and Language'বইতে উল্লেখ করেছেন যে,শিশুরধারণার বিকাশও তার ভাষার ওপর নির্ভরশীল। শিশু যখন ভাষা দিয়ে তার পর্যবেক্ষিত বস্তুটিকে বর্ণনা করতে পারে তখনই তার ধারণার বিকাশ ঘটে। ভিগট্স্কিরমতবাদের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো-

১. More Knowledgable Other (MKO)
২. Zone of Proximal Development (ZPD)

১.More Knowledgable Other:এই ধারণাটি দ্বারা কোন কাজ, শিক্ষামূলক প্রক্রিয়া বা ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে শিশু বা শিক্ষার্থীর চেয়ে অধিকতরও ভালো ধারণা বা উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বুঝানো হয়, যাদের কাছ থেকে শিশু জ্ঞান লাভের সুযোগ পেয়ে থাকে। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর বাবা, মা, বড় ভাই বা বোন এবং শিক্ষক সবাইকে ভালো ধারণা বা উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বলা যেতে পারে, যাদের কাছ থেকে শিশু নতুন নতুন জ্ঞান বা তথ্য জানতে, বুঝতে ও শিখতে পারে।

২.Zone of Proximal Development: ভিগট্স্কিরমতে জ্ঞানমূলক বিকাশের ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত হয়ে থাকে, যাকে তিনি বলেছেনZone of Proximal Development (ZPD)। এর অর্থ হলো শিশুর বিকাশ শুরু হতে থাকে যখন সে সামাজিক আচরণে সম্পৃক্ত হয় এবং এর পরিপূর্ণ বিকাশ নির্ভর করে সামাজিকমিথস্ক্রিয়ার ওপর। বিকাশের একটি পর্যায়ে যেয়ে শিশু স্থির হয়ে যায়। এ পর্যায়েশিশুর একক প্রচেষ্টার চেয়ে সমবয়সীদের সহযোগিতা বা বড়দের নির্দেশনার মাধ্যমে তার জ্ঞান বিকাশ অনেক বেশি হয়। নিচের চিত্রটিতে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো

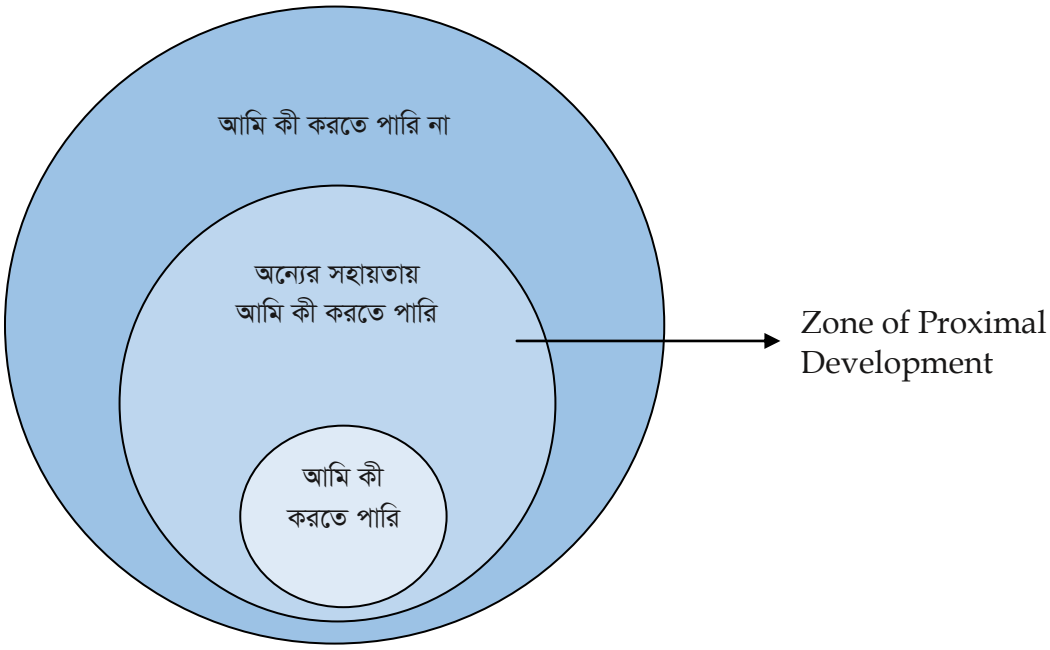


চিত্র ১.৮:Zone of ProximalDevelopment-এর ধারণা।

ভিগট্স্কির মতে, সামাজিকীকরণের মাধ্যমেই শিশুর সচেতনতার বিকাশ ঘটে। ভিগট্স্কি জ্যাঁ পিয়াজে মত জ্ঞানমূলক বিকাশ নিয়ে কথা বলেছেন। তবে তিনি যে বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন সেগুলো হলো–

১. শিশুর জ্ঞানীয় বিকাশ কৃষ্টি(Culture)দ্বারা প্রবাহিত হয়। আর সে কারণে বিভিন্ন কৃষ্টিতে শিশুর জ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

২. বিভিন্ন সামাজিক উপাদান বিশেষ করে সমাজিক মিথস্ক্রিয়ার (Social interaetion) মাধ্যমে শিশুর জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। এই সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার উৎস হলো Zone of Proximal Development (ZPD)-এ উল্লেখিত নির্দেশিত শিখন (Guided learning)|

৩. শিশু যে পরিবেশে বড় হয় সে পরিবেশ তার চিন্তাকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ সে কী চিন্তা করবে এবং কীভাবে চিন্তা করবে তা পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৪. ভিগট্স্কি ভাষার ওপর গুরুত্বরোপ করেছেন কারণ শিশুর জ্ঞানীয় বিকাশের ওপর ভাষার ভূমিকা অত্যাধিক। তাঁর মতে জীবনের প্রারম্ভে শিশুর চিন্তা ও ভাষা পৃথক থাকলেও তিন বছর বয়সে এদু'টি বিষয়কে সমন্বিত করে শিশুকোনো কিছু করার বা শেখার চেষ্টা করে।

ভিগট্স্কির বিকাশ মতবাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জ্ঞানের দৃঢ়িকরণ (Scaffolding)| জানা থেকে অজানার জগতে প্রবেশের জন্য শিক্ষার্থীদের কীভাবে পরিচালিত করা যায় তার দিকদর্শন রয়েছে দৃঢ়িকরণের ধারণার মধ্যে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের কোনোজটিল বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য দৃঢ়িকরণ ধারণা প্রয়োগ করেন। দৃঢ়িকরণ ধারণা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো বিষয় বোঝার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সমস্যা হলেবা বিষয়টি অনুধাবন করতে না পারলে শিক্ষক সহপাঠীদের মধ্য থেকে যে বিষয়টি ভালো জানে তাকে দিয়ে বিষয়টি শিখাতে পারেন। এর ফলে সমবয়সী হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ বা মিথস্ক্রিয়া সার্থক হয় এবং বিষয়টি সহজেই আয়ত্বের মধ্যে চলে আসে। অন্যান্য কৌশলের

পাশাপাশি দৃঢ়িকরণের জন্য Tharpe and Gallimore (১৯৮৮) উদ্ভাবিত নিচের ছয়টি পদক্ষেপ শিক্ষকরা অনুসরণ করতে পারেন (হক এবং হোসেন, ২০১৫:পৃ: ১৪৪)-

১. **মডেলিং:** অর্থাৎ কী করতে হবে তা বলে বা করে দেখানো। এই পদ্ধতি শিশুর শিক্ষার জন্য অত্যন্ত সহায়ক।

২. **পুরস্কার ও শাস্তির দক্ষ ব্যবস্থাপনা:** কোনো পদক্ষেপ সম্পাদিত হওয়ার পর শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত বলবর্ধন প্রদান। বলবর্ধন শিক্ষার্থীকে একই কাজ বার বার করতে প্ররোচিত করে।

৩. **কর্মদক্ষতার ফলাবর্তন প্রদান:** সম্পাদিত কাজের যথাযথ ফলাবর্তন বা ফিডব্যাক প্রদান। নিজের কাজের সঠিকত্ব বা ত্রুটির মাত্রা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারলে শিশু পরবর্তী ধাপে তা শুধরে নিতে পারে।

৪. **উপযুক্ত কর্ম সম্পাদনের নির্দেশনা:** কোন কাজ কীভাবে সম্পাদিত হবে তার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া। প্রকৃত নির্দেশ পেলে শিশুর পক্ষে ZPD-এর একটি স্তর থেকে উন্নততর স্তরে যাওয়া সহজ হয়।

৫. **প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান:** শিক্ষার্থীর মনে কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দেওয়া। ZPD- এর একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে যাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে নানবিধ প্রশ্নের সৃষ্টি হতে পারে, সেগুলোর উত্তর না পেলে এই স্তর উৎরানো যায় না।

৬. **চূড়ান্ত জ্ঞানীয় কাঠামো প্রদান:** কোন সমস্যার সমাধান যেহেতু অপরের সহায়তায় দলীয়ভাবে করা হয় তাই অর্জিত জ্ঞানের সঠিক কাঠামো সম্মিলিতভাবেই প্রস্তুত করা এই পর্যায়ের কাজ।

ভিগট্স্কির বিকাশ মতবাদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হলো প্রান্তসীমা (ZPD)ও দৃঢ়িকরণ (Scaffolding)যা শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের জন্য এক বিশেষ হাতিয়ার। নতুন কোনো বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সময় যদি তার গঠন ও কাঠিন্যের মাত্রা সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা থাকে, তবে শিক্ষার্থী কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা অনুমান করা যায়। যখন শিক্ষার্থী তার জ্ঞানের প্রান্তসীমায় গিয়ে ঠেকবে তখনই তিনি স্ক্যাফোল্ডিং বা দৃঢ়িকরণের আশ্রয় নিবেন। জের মতো ভিগট্স্কিও বিশ্বাস করেন শিশুরা সক্রিয়ভাবে তার জ্ঞান গঠন করে। ভিগট্স্কিও জ্যাঁ পিয়াজের মতো জ্ঞানমূলক বিকাশ নিয়ে কথা বললেও তাঁদের চিন্তায় ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায় । এই পার্থক্যগুলো হলো:

সারণি ১.২: ভিগট্স্কি ও জ্যাঁ পিয়াজের তত্ত্বের পার্থক্য

| বিষয় | ভিগট্স্কি'র তত্ত্ব | পিয়াজে'র তত্ত্ব |
|---|---|---|
| ১.সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত | সামাজিক ও সংস্কৃতি পরিবেশের ওপর জোড়ালো গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। | সামাজিক সংস্কৃতি প্রেক্ষিতের ওপর গুরুত্বারোপ করলেও তা ভিগট্স্কির মত দৃঢ় নয়। |
| ২. গঠনবাদ | সামাজিক গঠনবাদ | জ্ঞানীয় গঠনবাদ |
| ৩. পর্যায় | কোন পর্যায়ক্রমিক স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়নি। | শিশুর বিকাশকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যেমন- ইন্দ্রিয় পেশীর সমন্বয় কাল, প্রাক-প্রয়োগিক কাল, বাস্তব প্রায়োগিক কাল এবং রীতিবদ্ধ প্রায়োগিক কাল। |
| ৪.বিকাশের প্রক্রিয়া/প্রক্রিয়াসমূহ | বিকাশের প্রান্তবর্তী সীমা বা অবস্থা, ভাষা, সংলাপ (dialogue), সাংস্কৃতিক উপাদান। | স্কীমা, উপযোজন, সাদৃশ্যকরণ, প্রয়োগ, সংরক্ষণ, শ্রেণিকরণ, hypothetical deductive reasoning |
| ৫. ভাষার ভূমিকা | শিশুর বিকাশে প্রধান ভূমিকা পালন করে। বিশেষকরেচিন্তা গঠনে ভাষার শক্তিশালী ভূমিকা রয়েছে। | ভাষার ভূমিকা থাকলেও শিশুর ভাষাকে পরিচালনার ক্ষেত্রে জ্ঞান প্রধান ভূমিকা পালন করে। |
| ৬. শিক্ষার গুরুত্ব | সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান শেখাতে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। | শিক্ষা শুধু শিশুর জ্ঞানীয় দক্ষতাকে পরিমার্জিত করে। |
| ৭. শিখন শেখানো ক্ষেত্রে ব্যবহার | শিক্ষক হলেন একজন সাহায্যকারী (Facilitator)এবংনির্দেশক। তিনি পরিচালক নন। শিক্ষক নিজেও অধিক দক্ষ সমবয়সীদের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের শিখনের জন্য অনেক ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করবেন। | পিয়াজের তত্ত্বও একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। অর্থাৎ শিক্ষক হবেন একজন সাহায্যকারী ও নির্দেশক। তিনি পরিচালক হবেন না। তিনি শিক্ষার্থীদের তাদের জগৎ অনুসন্ধান করতে এবং জ্ঞান আবিষ্কার করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন। |

### শিক্ষায় ভিগট্স্কির *মতবাদের ব্যবহার*

শিক্ষার্থীরা কীভাবে শিখে তা একজন শিক্ষককে জানতে হবে। শিশুরা বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বেই কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তবে শিক্ষার্থীরা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বা সমাজ থেকে যে শিখন অভিজ্ঞতা বা ধারণা নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে সেগুলোকে পরবর্তীতে যাতে যৌক্তিকভাবে প্রতিস্থাপন করতে পারে সেদিকেই শিক্ষককে গুরুত্ব দিতে হবে। শ্রেণিকক্ষে ভিগট্স্কির মতবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে চারটি মূলনীতি কাজ করে সেগুলো হলো–

১. শিখন এবং বিকাশ হলো এক ধরণের সামাজিক সহযোগিতামূলক কার্যকলাপ।

২. ZPD ধারণাটি শিক্ষাক্রম ও পাঠটীকা প্রণয়নের নির্দেশক হিসেবে কাজ করে থাকে।

৩. বিদ্যালয়ের শিখন একটি অর্থপূর্ণ প্রেক্ষিতে সংগঠিত হওয়া উচিত। 'বাস্তব জগত' থেকে শিশুর যে শিখন ও জ্ঞানের বিকাশ হয় তা থেকে বিদ্যালয়ের শিখন পৃথক হবে না।

৪. বিদ্যালয়ের বাইর থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতাসমূহ শিশুর বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

**বুদ্ধিমত্তা**

বুদ্ধিমত্তাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ব্যক্তির যুক্তি, বোধ, আত্মসচেতনতা, শিখন, আবেগিক জ্ঞান, যৌক্তিকতা, পরিকল্পনা, সৃজনশীলতা এবং সমস্যা সমাধানের সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বুদ্ধিমত্তাকে আরও বিস্তৃত করে সংজ্ঞায়িত করলে বলা যায় যে তথ্য বুঝতে পারার ক্ষমতা ও তা জ্ঞান হিসেবে ধারণ এবং পরবর্তীতে পরিবেশ অথবা অবস্থা অনুযায়ী খাপ খাইয়ে চলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা। David Wechsler (১৯৯৪) বুদ্ধিমত্তাকে ব্যক্তির আপন পরিবেশে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার, যুক্তিপূর্ণভাবে চিন্তা করা এবং কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করাকে বুঝিয়েছেন।

যে সকল প্রভাবক শিক্ষা গ্রহণকে প্রভাবিত করে, তাদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বুদ্ধিমত্তা। বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে জ্ঞান অর্জন এবং প্রয়োগের সক্ষমতা। শিক্ষা, পেশা, সমাজে খাপ খাইয়ে চলাসহ সকল ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার ধারণা বিস্তৃত।

সুতরাং বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলা, বিভিন্ন বস্তু এবং পদ্ধতির মাঝে সম্পর্ক অনুধাবন করা, সমস্যা সমাধান করতে পারা, স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারা, স্বল্প সময়ে অধিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারা, নিজের এবং অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হবার সামর্থ্য।

**বুদ্ধিমত্তার বৈশিষ্ট্য**

বুদ্ধিমত্তার মূল বিষয়গুলো নিম্নে তুলে ধরা হল-

১. এটি শিশুর স্বল্প সময়ের মধ্যে অধিক জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে।

২. শিশু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে এবং সে অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে পারবে।

৩. শিশু তার পূর্বের অভিজ্ঞতা হতে সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

৪. শিশু নিয়ম মেনে ভবিষ্যতের মুখোমুখি হয়।

৫. সে সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখে।

৬. জন্ম থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটে।

৭. ছেলে এবং মেয়েদের বুদ্ধিমত্তার বিকাশে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়।

৮. ছেলে এবং মেয়েদের বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পার্থক্য দেখা যায়।

৯. বুদ্ধিমত্তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বংশগতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় কিন্তু এর উন্নতির জন্য সহায়ক পরিবেশ আবশ্যক।

অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীদের মতে বুদ্ধিমত্তা কৈশোর পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বৃদ্ধ বয়সে ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। Pinter বলেন যে, ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধিমত্তার বিকাশ খুব দ্রুততর হয় এবং তারপর তা ১৪ থেকে ২২ বছর বয়সের মাঝামাঝি কোন একটি সময়ে এসে থেমে যায়। Terman এর মতে, শিক্ষার্থী এবং কিশোররা ১৬ বছর বয়সে তাদের বুদ্ধিমত্তার সীমারেখায় পৌঁছায়। তবে Binet এর মতে, এই সীমারেখা ১৫ বছর বয়স।

অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীদের মতে, স্বল্প বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন শিশুদের বুদ্ধিমত্তা ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণ শিশুদের ক্ষেত্রে এই বুদ্ধিমত্তা ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। তবে অতিমেধাবী শিশুদের ক্ষেত্রে ২০ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটতে থাকে। তবে বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঠিক কোন সময়সীমা পর্যন্ত বিকাশমান থাকে, তা সঠিক করে বলা এখনও সম্ভব হয়নি।

এটি বলা যথাযথ হয় যে, বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে মানিয়ে চলার, চিন্তার, অনুধাবন করার, যুক্তি দিয়ে বুঝার এবং সঠিক উপায়ে আচরণ করার সক্ষমতা। আমরা এটাও বলতে পারি যে, প্রাক-শৈশবকালে বুদ্ধিমত্তার বিকাশের গতি প্রাপ্তবয়স কালের চেয়ে দ্রুততর হয়।

উনিশ শতক থেকে মানুষের বুদ্ধিমত্তা মাপার কৌশল বের করার চেষ্টা শুরু হয়। Theodore Simon এর সহায়তায় Alfred Binet ১৯০৫ সালে সর্বপ্রথম বুদ্ধি অভীক্ষা প্রস্তুত করেন। পরবর্তী কালেBinet এই স্কেলটি বহুবার সংশোধন করেন। ১৯১৬ সালে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Lewis M. Terman স্কেলটি পুনরায় সংশোধন করেন এবং এটিকে Stanford Binet Intelligence Scale হিসেবে নামকরণ করা হয়। এছাড়া ১৯৮৬ সালে Elizabeth Hagen Ges Jerome Sattler এর সহযোগিতায় Robert Thorndike এই Stanford–Binet Intelligence Scale এর ৪র্থ সংস্কার বের করেন। সন্নিকট সময় ২০০৩ সালে Gale Roid এই স্কেলের ৫ম সংস্কার প্রকাশ করেন।

বুদ্ধি অভীক্ষার ইতিহাসে বেলেভিউ হাসপাতালের Dr. David Wechsler কর্তৃক তৈরি করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি অবদান। তার প্রাথমিক অভীক্ষা Wechsler-Bellevue Intelligence Scale (WBIS) ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয় যা প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের বুদ্ধিমত্তা মাপার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। তিনি লক্ষ্য করেন যে সে সময় প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য আলাদা তেমন কোন বুদ্ধি অভীক্ষা ছিল না বরং শিশুদের বুদ্ধি অভীক্ষাটি সংস্কার করে বড়দের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতো। অতপর তিনি এই প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের বুদ্ধি অভীক্ষার জন্য আলাদা একটি অভীক্ষা তৈরির নিমিত্তে এই স্কেলটি প্রস্তুত করেন। ১৯৩৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত শিশু এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের বুদ্ধি পরিমাপ করার জন্য তিনটি স্কেল প্রস্তুত এবং সংশোধন করা হয়েছে। এই তিনটি স্কেল সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) হচ্ছে এমন একটি বুদ্ধি অভীক্ষা যা বয়স্ক এবং বয়:সন্ধিকাল অতিক্রম করা ব্যক্তিদের বুদ্ধিমত্তা এবং জ্ঞানীয় ক্ষমতা পরিমাপ করে। ১৯৫৫ সালে মূল WAIS প্রকাশিত হয় যা মূলত ছিল ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত Wechsler–Bellevue Intelligence Scale এর একটি সংশোধিত সংস্করণ। বর্তমানে এটির ৪র্থ সংস্করণ ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এটিই এখন পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

ব্যবহৃত সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত বুদ্ধি অভীক্ষা। এর ৫ম সংস্করণের কাজ ২০১৬ সালে শুরু হয় এবং আশা করা যাচ্ছে যে এটি ২০১৯ সালে সম্পূর্ণ হবে।

৬ থেকে ১৬ পর্যন্ত শিশুদের বুদ্ধি অভীক্ষার জন্য Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) ব্যবহৃত হয়। ২০১৪ সালে এর সর্বশেষ সংস্করণ (WISC-V) প্রকাশিত হয়।

১৯৬৭ সালে ২ বছর ৬ মাস থেকে ৭ বছর ৭ মাস বয়সী শিশুদের বুদ্ধি অভীক্ষার জন্য Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI) ব্যবহার করা হয়। এটি Wechsler Adult Intelligence Scale Ges Wechsler Intelligence Scale for Children এরপর পর্যায়ক্রমে উদ্ভূত হয়। এটি এখন পর্যন্ত ১৯৮৯, ২০০২ এবং ২০১২ সালে মোট ৩ বার সংশোধিত হয়।

বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে একটি ধারণা যা কোনো ভৌত একক দ্বারা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির বুদ্ধি অভীক্ষার মাধ্যমে তার বুদ্ধিমত্তার পরিমাপ করা হয়। এই পরিমাপের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার, যথা- প্রকৃত বয়স (Chronological Age), মানসিক বয়স (Mental Age) এবং বুদ্ধাংক (Intelligence Quotient-IQ)।

**বুদ্ধি সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা**

বুদ্ধি বলতে আমরা যা সাধারণভাবে বুঝি সেটি একটিমাত্র শক্তি না। একাধিক শক্তি এ সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা বহুদিন ধরে চলে আসছে। বিনে এবং স্টার্ন বুদ্ধি বলতে সাধারণ বুদ্ধি (Ganeral Intelligence)- কে বুঝিয়েছেন এবং বুদ্ধি পরিমাপক হিসেবে IQ বা বুদ্ধ্যাঙ্ক শব্দটি ব্যবহার করেছেন। মনোবিজ্ঞানী ওয়েসলার তাঁর বুদ্ধি অভীক্ষায় সাধারণ এবং বিশেষ বুদ্ধি অর্থাৎ বাচনিক এবং কার্যসম্পাদনমূলক বুদ্ধি সম্পর্কে বলেছেন। ওয়েসলার বুদ্ধি সম্পর্কিত ধারণাটি চার্লস স্পিয়ারম্যানের (১৯২৭) ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। স্পিয়ারম্যানের মতে প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে সাধারণ বুদ্ধি, যাকে তিনি বলেছেন'G'এবং বিশেষ বুদ্ধি (Specific intelligence), যাকে তিনি বলেছেন `S', উভয়টি রয়েছে। কোন ব্যক্তির সব ধরনের কাজ করার সমান শক্তি থাকে না; কোন কাজে তার কম দক্ষতার, আবার কোন কাজে বেশি দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন- কারো নৃত্য, সঙ্গীত প্রভৃতিতে যথেষ্ট নৈপুণ্য থাকতে পারে, কিন্তু গণিত কিংবা বিজ্ঞানে তেমন নাও থাকতে পারে। আবার কোন ব্যক্তির গণিতে দক্ষতা দেখা গেলেও সাহিত্যে কোন দক্ষতা দেখা যায় না। মনোবিজ্ঞানী থার্সটোন, থমসনের ও গার্ডনার একটি বিশেষ মানসিক ক্ষতার অস্তিত্ব স্বীকার করেননি।তাঁদের মতে, বুদ্ধি হল অনেক মৌলিক শক্তির সমন্বিত রূপযা বহুমুখী বুদ্ধিমত্তা নামে পরিচিত।

**বহুমুখী বুদ্ধিমত্তা (Multiple Intelligence)তত্ত্ব**

আমেরিকার হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হাওয়ার্ড গার্ডনার (১৯৮৩, ১৯৯৯) খ্রিষ্টাব্দে তাঁর'Frames of Mind'গ্রন্থে বুদ্ধির বহু উপাদান তত্ত্বটি প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, ব্যক্তির বুদ্ধি কেবল গাণিতিক এবং ভাষাগত ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই প্রচলিত বুদ্ধি অভীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত IQবা কোন একক সংখ্যার দ্বারা বুদ্ধির পরিমাপ বুদ্ধিকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত কওে না। ভাষাগত ও গাণিতিক বুদ্ধির পরিবর্তে তিনি কয়েক ধরনের বুদ্ধির উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন এবং অর্জিত জ্ঞান ব্যবহার করে। বুদ্ধি বলতে তিনি সমস্যা সমাধানের যোগ্যতাকে বুঝিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে গার্ডনার ছয় ধরনের বুদ্ধির উল্লেখ করলেও পরবর্তী

কালে জৈবিক ও সাংস্কৃতিক গবেষণার থেকে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে তিনি আরও তিন ধরনের বুদ্ধি এর সাথে সংযোজন করেন। বুদ্ধির এ ধরনগুলো নিচে আলোচনা করা হলো-

**১. মৌখিক বা ভাষাভিত্তিক বুদ্ধিমত্তা**(Verbal or Linguistic intelligence)**:**শব্দ বা ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে কোন কিছু প্রকাশের দক্ষতাই হলো মৌখিক বা ভাষাভিত্তিক বুদ্ধি। উদাহরণস্বরূপ- কোন বিষয় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারা বা ব্যাখ্যা করতে পারা, কোন কিছু রচনা করতে পারা, বক্তৃতা বা বিতর্ক করারদক্ষতা ইত্যাদি। লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বক্তা- এদের মাঝে এ ধরনের বুদ্ধি দেখা যায়।

**২. যুক্তিমূলক-গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা**(Logical-mathematical intelligence)**:**এ ধরনের বুদ্ধি হলো যুক্তিমূলক ও গাণিতিক প্রয়োগের দক্ষতা।কোন বিষয়ে যুক্তি প্রদান, বিচার বিশ্লেষণ ও গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারার দক্ষতা ইত্যাদি। বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার,হিসাবরক্ষক এদের মধ্যে এই দক্ষতা দেখা যায়। এ বুদ্ধিতে যারা অগ্রগণ্য তারা সাধারণত গণিত ও কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এ অন্যদের চেয়ে ভাল এবং যুক্তি প্রদানে বেশি পারদর্শী হয়ে থাকে। 'যুক্তি প্রদান'-কে অনেকে ভাষাভিত্তিক বুদ্ধি বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। কিন্তু গাণিতিক, জ্যামিতিক এবং প্রতীকি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যে যুক্তিমূলক দক্ষতার প্রয়োজন হয় তা গাণিতিক বুদ্ধির অন্তর্গত। আর কোন বিষয় উপস্থাপন করা, ব্যাখ্যা করা, বক্তৃতা বা বিতর্ক করার জন্য যেযুক্তির প্রয়োজন সেটিহলোবাচনিক-ভাষাভিত্তিক বুদ্ধি।

**৩. দৃষ্টি বা স্থান সম্পর্কীয় বুদ্ধিমত্তা**(Spatial intelligence)**:**এটি হলোত্রিমাত্রিক চিন্তার দক্ষতা। আনুপাতিক দিক ঠিক রেখে ছবি আঁকতে পারা, ছবি ব্যাখ্যা করতে পারা, মানচিত্র, চার্ট ও নকশা বুঝতে পারা, কোন কিছুর চিত্র কল্পনা করতে পারা ও প্রতিকৃতি বানাতে পারার দক্ষতা। স্থপতি, চিত্রশিল্পী, কারিগর ও নাবিক এদের মধ্যে এই দক্ষতা দেখা যায়। এ ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণত হাত ও চোখের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে থাকে।

**৪. শরীরবৃত্তীয় বা শারীরিক ক্রিয়াজনিত বুদ্ধিমত্তা**(Bodily-kinesthetic intelligence)**:**শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং শরীরচর্চামূলক ক্রিয়াকলাপে ব্যবহৃত বুদ্ধি, যেমন- দৌড়, সাঁতার, ক্রিকেট, ফুটবল, হাডুডু ইত্যাদিতে যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রদর্শন। হস্তশিল্পী, কর্মকার, চাষী, কাঠুরিয়া খেলোয়াড়, সার্জন, নৃত্যশিল্পীপ্রভৃতি পেশার ব্যক্তিরা এধরনের দক্ষতার অধিকারী।

**৫. সংগীতে পারদর্শিতা বা সংগীতমূলক বুদ্ধিমত্তা**(Musical intelligence)**:**গান-বাজনা, অঙ্গভঙ্গি, নৃত্য, প্রকৃতির বিভিন্ন শব্দ সহজে অনুধাবন ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপে পারদর্শিতা প্রদর্শন করা। সঙ্গীত কম্পোজার ও সঙ্গীত শিল্পীদের মাঝে এই দক্ষতা দেখা যায়।

**৬. আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা**(Interpersonal Intelligence)**:**অন্যকে বোঝার এবং অন্যের সাথে সুসম্পর্ক গড়ার দক্ষতাকে বুঝায়। এ শ্রেণির বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বহির্মুখী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন(Extrovert)হয়ে থাকে।এরা নেতৃত্বদান এবং জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে দক্ষ হয়ে থাকে। দক্ষ শিক্ষক, মানসিক চিকিৎসক, প্রশিক্ষকরা ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে এই দক্ষতা দেখা যায়।

**৭. অন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা বা বুদ্ধিমত্তা**(Intrapersonal intelligence)**:**ব্যক্তির নিজেকে বুঝার এবং নিজের জীবনকে সার্থকভাবে পরিচালনার দক্ষতাকে বুঝায়। আত্মসচেতন হওয়া, আত্মপোলব্ধি করতে পরা, একা একা কাজ করতে ভালবাসা ইত্যাদিহলো অন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা বা বুদ্ধির উদাহরণ। মনোবিজ্ঞানী, সাধু, ধর্মসাধক-এদের মাঝে এই দক্ষতা বেশি থাকে। এ ধরনের বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন (Introvert)এবং জটিল দর্শনের অধিকারী হয়ে থাকে এবং একাকিত্ব ভালবাসে। বহু উপাদান তত্ত্বের একটি দুর্বলতা হলো অন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধি কারণ এ ধরনের বুদ্ধি পরিমাপ করা কঠিন।

**৮. প্রকৃতিবিষয়ক দক্ষতা বা বুদ্ধিমত্তা**(Naturalist Intelligence)**:**প্রকৃতিবিষয়ক দক্ষতা বা বুদ্ধি বলতে প্রকৃতির পর্যবেক্ষণ করার এবং প্রকৃতি ও মানুষের তৈরি বিষয়কে অনুধাবনের দক্ষতাকে বুঝায়। এইবুদ্ধি প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থা ও গতির সাথে খাপ খাইয়ে চলার যোগ্যতা, প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাতে পারা, প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের তথ্য সংগ্রহ করা ও গবেষণা করা ইত্যাদি দক্ষতাকে বুঝায়। কৃষক, উদ্ভিদবিদ, পরিবেশবাদীদের মধ্যে এই পারদর্শিতা দেখা যায়।

**৯. অস্তিত্বমূলক বুদ্ধিমত্তা**(Existential intelligence)**:**মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কিত গভীর প্রশ্ন করার যোগ্যতা বা সংবেদনশীলতা এইবুদ্ধির অন্তর্গত। যেমন-জীবনের অর্থ কী; কেন আমরা মারা যাই বা কেন মানুষ মারা যায়; আমরা এখানে কীভাবে এসেছি; এ পৃথিবীতে আমাদের কাজ কী ইত্যাদি। বুদ্ধির এক্ষেত্রটি দর্শনের সাথে সম্পর্কিত।

***বুদ্ধির বহু উপাদান সম্পর্কে শিক্ষকের জানা প্রয়োজন কেন?***

গার্ডনার মতে প্রতিটি বুদ্ধিমত্তার জন্য রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ বা প্রকাশভঙ্গি। শিখনের ক্ষেত্রে এ বুদ্ধিমত্তাগুলোর অনন্য ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষক এই তত্ত্বসম্পর্কে ধারণা রাখেন এবং বুদ্ধিমত্তার এই লক্ষণগুলোমাথায় রেখেবিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করলে শিশু শিক্ষার্থীরা তা দ্রুত শিক্ষণীয় বিষয়গুলোআয়ত্ত করতে পারবে।গার্ডনার বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমত্তা অনুসারে কার্যক্রম পরিচালনা কৌশল ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাসী এবং আত্মনির্ভরশীল হয়। আমাদের বিদ্যালয় এবং সংস্কৃতির অধিকাংশ ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে শুধুভাষাগত বা বাচনিক এবং গাণিতিক বুদ্ধির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। বিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা ভাষাগত ও গাণিতিক বুদ্ধির ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলেও তাদের কোন বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতা রয়েছে। যেমন- কারো খেলাধুলায়, কারো বা নৃত্য বা সঙ্গীতে পারদর্শিতা রয়েছে। এ সব প্রতিভার অধিকারী শিক্ষার্থীদের প্রতি নজর না দেওয়ার কারণে তাদের সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশিত হয় না এবং তাদেরকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় না। গার্ডনারের মতে বিদ্যালয়ে সমস্ত রকমের বুদ্ধির বিকাশ ঘটাবার চেষ্টা চালাতে হবে। এ তত্ত্বটি শিক্ষকরা জানলে তারা বিভিন্ন ধরনের সহশিক্ষা কার্যকলাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার প্রকাশ ঘটাতে পারেন, যেমন- গান, নাচ, সহযোগিতামূলক শিখন, শিল্পকর্ম, ভূমিকা অভিনয়, খেলাধুলা, বিতর্ক ইত্যাদি। শিক্ষকগণ শিখণের বিষয় অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারেন। যেমন-

সারণি ১.৩: বিভিন্ন বুদ্ধিমত্তা অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয়

| বুদ্ধির ধরন | শিক্ষণীয় বিষয় |
|---|---|
| • মৌখিক বা ভাষাভিত্তিক বুদ্ধি | • শব্দকোষ/মালা |
| • যুক্তিমূলক-গাণিতিক বুদ্ধি | • সংখ্যা বা যুক্তি |
| • স্থানগত বা স্থান সম্পর্কীয় বুদ্ধি | • ছবি |
| • সংগীতমূলক বুদ্ধিমত্তা | • সঙ্গীত |
| • অন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা বা বুদ্ধি | • আত্ম-প্রতিফলন |
| • শরীরবৃত্তীয় বা শারীরিক ক্রিয়াজনিত বুদ্ধি | • শারীরিক/শারীরবৃত্তীয় অভিজ্ঞতা |
| • আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধি | • সামাজিক অভিজ্ঞতা |
| • প্রকৃতিবিষয়ক দক্ষতা বা বুদ্ধি | • প্রাকৃতিক পরিবেশের অভিজ্ঞতা |

তবে গার্ডনার বলেন, খুব কমক্ষেত্রেই স্বাধীনভাবে বা এককভাবে কাজ করে বুদ্ধির বহু উপাদান সাধারণত সম্মিলিতভাবে কাজ করে। অর্থাৎ কোন দক্ষতা অর্জন বা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একাধিক বুদ্ধি একসাথে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ- একজন নৃত্যশিল্পীর নৃত্যের দক্ষতা একাধিক দক্ষতার সম্মিলিত ব্যবহারের মাধ্যমেপ্রকাশ পায়, যেমন-

১. **সঙ্গীতবিষয়ক বুদ্ধিঃ** যার সাহায্যে সে সঙ্গীতের ছন্দ মাত্রার তারতম্য অনুধান করে।
২. **আন্তঃব্যক্তির বুদ্ধিঃ** এর সাহায্যে সে কীভাবে অনুপ্রাণিত হবে কিংবা তার নৃত্যের ছন্দের মাধ্যমে দর্শকদের আবেগময়ভাবে আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে তা অনুধাবন করতে পারে।
৩. **শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলি সম্পর্কিত বুদ্ধিঃ** এই বুদ্ধির মাধ্যমে সে তার নৃত্যের কলাকৌশল বা ভঙ্গিমাকে সফলভাবে তুলে ধরে।

*শ্রেণিকক্ষে বুদ্ধির বহু উপাদান তত্ত্বকে প্রয়োগের জন্য শিক্ষকের করণীয়*

শ্রেণিকক্ষ বিভিন্ন ধরনে শিক্ষা উপকরণ দ্বারা সজ্জিত করে কিংবা পাঠ উপস্থাপনের সময় শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কয়েক ধরনের বুদ্ধিও দক্ষতাকে উদ্দীপিত করতে পারেন। যেমন- বিজ্ঞান ক্লাশে শিক্ষক কোন উপকরণ দিয়ে অনুসন্ধান বা তুলনা করতে দিতে পারেন। এতে করে শিক্ষার্থীদের সংবেদীয় এবং বিশ্লেষণমূলক দক্ষতার বিকাশ ঘটতে পারে। আবার গল্প বা সাহিত্যের ক্লাশে যদি শিক্ষার্থীর কল্পনা শক্তিকে কাজে লাগানো যায় তবে তা তাদের মাঝে ভাষাগত এবং কাল্পনিক দক্ষতার বিকাশ ঘটানো সম্ভব। অঙ্কন ক্লাসে শিক্ষক শিক্ষার্থীর স্থানগত, প্রকৃতি সম্পর্কিত দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারেন। বহুবিধ বুদ্ধি তত্ত্বের জ্ঞান দ্বারা শিক্ষকগণ শেখন-শেখানো ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কোন একক দক্ষতা বা কোন একই সাথে একাধিক দক্ষতার বিকাশ ঘটতে পারেন। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের একক বা একাধিক বুদ্ধির বিকাশের জন্য শ্রেণিকক্ষে কী কী কৌশল প্রয়োগ করবেন তা পরবর্তী পাঠ **'শিখন শেখানো পদ্ধতি নির্বাচন ও প্রয়োগে শিশুর ভিন্নতা'** -এ প্রদান করা হয়েছে।

সবশেষে বলা যায়, শিক্ষক শিখন শেখানো পদ্ধতিতে শুধু ভাষাগত এবং গাণিতিক বুদ্ধিমত্তার ওপর জোর না দিয়ে বহুমুখী বুদ্ধি উপাদানের জ্ঞান ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সব ধরনের সুপ্ত সম্ভাবনাকে বা প্রতিভাকে কাজে লাগাবেন। শিক্ষক তার পাঠদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় এমনভাবে পড়াবেন যাতে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু জানতে, কাজ করতে, চিন্তা করতে এবং এগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। শিক্ষক যদি বুদ্ধি সম্পর্কিত তাত্ত্বিক জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ (Application)করে শিক্ষার্থীদের আচরণে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে পারেন তবেই তার পাঠদান সফল ও সার্থক হবে।

# অধ্যায় ২

# শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল

শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রমের একটি অন্যতম বিষয় হলো শ্রেণি ব্যবস্থাপনা। শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রমের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে দক্ষ শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ওপর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় শিক্ষকের বিষয়জ্ঞান, শিখন শেখানো কৌশল, শিখন উপকরণ ইত্যাদি যতই ভালো হোক না কেন, তা কার্যকর হবে না যদি তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা না যায়। সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হয় যথাযথ শ্রেণি ব্যবস্থাপনা।

অধ্যায়ের এ অংশে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা ও এর বিভিন্ন উপাদান, যেমন- শ্রেণিকক্ষে আচরণের প্রভাবক উপাদান, ইতিবাচক শ্রেণি পরিবেশ তৈরির কৌশল, শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কৌশল, ভারসাম্যপূর্ণ শ্রেণি ব্যবস্থাপনার কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের কোন একক ও সঠিক ফর্মুলা নেই। বিভিন্ন ধরনের কৌশলের মধ্য থেকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব ও শৃঙ্খলার চর্চার ওপর ভিত্তি করে যেটা সবচেয়ে বেশি মানানসই তাই নির্বাচন ও প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষককে এটা বুঝতে হবে যে শ্রেণিকক্ষে কী ঘটছে এবং এর সাথে মানানসই কোন কৌশল ব্যবহার করা দরকার।

## শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার সাথে বিভিন্ন বিষয় জড়িত। এসব বিষয়ের মধ্যে আছে পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠ পরিচালনা ও বিভিন্ন কাজ করা, পাঠের সুবিধা অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করা এবং শিক্ষার্থীদের একক বা দলীয় কাজে যুক্ত করা। আবার অনেক শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে অসদাচরণ করে, শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ করে না এবং শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি করে। এ ধরনের শিক্ষার্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা দরকার হয়। সুষ্ঠুভাবে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে শ্রেণি কার্যক্রমের সাথে জড়িত বিভিন্ন বিষয় বা উপাদানকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করাকে বলা হয় শ্রেণি ব্যবস্থাপনা। এর মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন উপাদানের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করে শিখন শেখানো কার্যক্রমের মান উন্নয়ন করা যায়।

শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা মানে শ্রেণিকক্ষে বরাদ্দ সময়টুকু কোনভাবে কাটিয়ে দেয়া নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হলো পরিকল্পিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কার্যকর শিখনের সুযোগ তৈরি করা। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে যত বেশি সময় বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমে যুক্ত থাকবে তত বেশি শিখবে। বিপরীতক্রমে শ্রেণিকক্ষের কার্যক্রম থেকে যত বেশি বিযুক্ত থাকবে শিখনের সুযোগ তত কমবে। যথাযথ পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন, শিক্ষার্থীদের অসদাচরণ নিয়ন্ত্রণ ও তাদের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার কিছু নীতি প্রতিষ্ঠা করা, শ্রেণিকক্ষে কার্যকর যোগাযোগ কৌশল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজে সক্রিয় রাখা ইত্যাদি কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা করা যায়।

### শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আচরণ

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখন অনেকাংশে তাদের আচরণের ওপর নির্ভর করে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আচরণ দু'ধরনের হয়- সহযোগিতামূলক ও অসহযোগিতামূলক আচরণ। শিক্ষার্থীরা যখন শিক্ষকের নির্দেশনা

অনুসারে বিভিন্ন কাজে যুক্ত হয় তখন তা সহযোগিতামূলক আচরণ। পক্ষান্তরে তারা যখন শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ করে না এবং শ্রেণিকক্ষের কাজের ব্যাঘাত ঘটায় এমন আচরণ করে তখন তা অসহযোগিতামূলক আচরণ। শ্রেণি ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম বিষয় হলো শিক্ষার্থীদের অসহযোগিতামূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে তাদের দিয়ে সহযোগিতামূলক আচরণ করানো।

শিক্ষার্থীদের অসহযোগিতামূলক আচরণের ফলে শিখন শেখানো কার্যক্রম ব্যহত হয়। এ ধরনের আচরণের জন্য অবশ্য বিভিন্ন কারণ রয়েছে, যাঅনেকাংশে শিক্ষকের কর্মকাণ্ডের (অনুপোযোগী শিখন শেখানো কৌশল) ফলে সৃষ্টি হয়। এ ধরনের শিখন শেখানো কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এটা মনে রাখা জরুরি যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আচরণ (সহযোগিতামূলক বা অসহযোগিতামূলক যা-ই হোক) তাদের শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এক্ষেত্রে তিন ধরনের উপাদানের প্রভাব দেখা যায়, যথা- ভৌত উপাদান, সামাজিক উপাদান ও শিক্ষাবিষয়ক উপাদান।

সারণি ২.১: শ্রেণিকক্ষের আচরণে প্রভাব বিস্তারকারী পরিবেশগত উপাদান

| ভৌত উপাদান | সামাজিক উপাদান | শিক্ষা বিষয়ক উপাদান |
|---|---|---|
| • বসার ব্যবস্থা<br>• কোলাহল/ আশেপাশের শব্দের মাত্রা<br>• কাজ ও চলাফেরার জন্য জায়গার পরিমাণ<br>• তাপমাত্রা | • শিক্ষার্থীরা একক বা দলগতভাবে কাজ করে<br>• পরস্পরের প্রতি শিক্ষার্থীদের ব্যবহার<br>• দল গঠনের প্রকৃতি ও আকার<br>• শিক্ষার্থীদের মনোযোগ/সহযোগী আচরণ | • শিক্ষকের শিখন শেখানোর পদ্ধতি<br>• শিক্ষকের গ্রহণ/বর্জন<br>• প্রয়োজনীয় শিক্ষাবিষয়ক কাজের ধরন<br>• প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকলাপের ধরন |

শিক্ষার্থীদের আচরণের ওপর শ্রেণিকক্ষের ভৌত উপাদানের বড় ধরনের প্রভাব রয়েছে। চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ইত্যাদির মধ্যে জায়গার পরিমাণ, উপকরণসমূহের অবস্থান, কোলাহল বা শব্দের মাত্রা, তাপমাত্রা ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। এরূপ কিছু ভৌত উপাদান, যেমন- দল গঠন, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্র, শ্রেণিকক্ষের নিয়ম-কানুন ইত্যাদি আবার সামাজিক উপাদানকে প্রভাবিত করতে পারে। একইভাবে শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন উপাদান যেমন- শিখনের ক্ষেত্রে মুখ্য অগ্রাধিকার কী হবে, প্রত্যেক কাজের জন্য বণ্টিত সময় কত, কী জ্ঞান ও দক্ষতা শেখানো হবে, কখন শেখানো হবে ইত্যাদি বিষয় সামাজিক ও ভৌত উপাদানকে প্রভাবিত করে। নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর জন্য যে ধরনের শিক্ষাবিষয়ক কর্মকাণ্ড নির্ধারণ করা হয় তা তাদের কাছে উৎসাহব্যঞ্জক নাও হতে পারে। ফলে শিক্ষকের কাজ বা প্রতিক্রিয়ার প্রতি সে শত্রুভাবাপন্ন হতে পারে। এসকল উপাদানের বাইরেও শিশুদের পারিবারিক বৈশিষ্ট্য, সঙ্গীদলের বৈশিষ্ট্য, সহাপাঠীদের বৈশিষ্ট্য, বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি তাদের শ্রেণিকক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করে।

শিশুরা শ্রেণিকক্ষে যেসব অসহযোগিতামূলক আচরণ করতে পারে তা নিম্নরূপ:

- শিক্ষকের শিখন শেখানো কাজে অমনোযোগী থাকা ও কোন ধরনের সাড়া না দেয়া
- শিক্ষকের নির্দেশ অমান্য করা ও নিজেদের মধ্যে কথা বলা।
- সহপাঠীদের প্রতি শারীরিক ও মৌখিক আক্রমণ বা হিংস্র আচরণ

- বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কাজ, যেমন- প্রতারণা, মিথ্যা বলা ইত্যাদি
- শ্রেণিকক্ষে হৈ চৈ করা, জিনিসপত্র ছোঁড়াছোঁড়ি করা ইত্যাদি
- ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির শিশুদের আচরণগত ভিন্নতা ও অনৈক্য।

বাংলাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায় (Malak, Deppeler & Sharma, 2014)শিশুদের আচরণগত সমস্যাগুলো কতটা গুরুতর ও কত বেশি সেগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শিত হয়, তার ওপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়:

সারণি ২.২: বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের আচরণগত সমস্যার ধরন

| আচরণসমূহ | বিবরন |
|---|---|
| গুরুতরআচরণসমূহ | |
| আক্রমণাত্মক | সহপাঠীদেরকে শারীরিকভাবেআক্রমণ করা, যেমন: মারামারি করা। |
| শিক্ষকদেরপ্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণ | শিক্ষকদেরকে অসম্মান করা (যা অনেক শিক্ষকের নিকট মানসিক আঘাত হিসেবে চিহ্নিত), যেমন: সালাম না দেয়া, শিক্ষকের সাথে তর্কে লিপ্ত হওয়া, শিক্ষকের নির্দেশকে অমান্য করা প্রভৃতি। |
| অধিক (পুনঃপুন) প্রদর্শিত আচরণসমূহ | |
| বিশৃঙ্খল আচরণ | শ্রেণিতে শিখন শেখানো কার্যক্রমকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করা, যেমন: নিজেদের মধ্যে এলোমেলো কথা বলা, অনুমতি ছাড়া কথা বলা, শ্রেণিকক্ষের ভিতরে এলোমেলোভাবে হাঁটা-চলা করা, অন্যের জিনিস হাইবেঞ্চ থেকে ছুঁড়ে মারা, অন্যের ইউনিফর্মে কলম দিয়ে দাগানো প্রভৃতি। |
| অনর্থক অভিযোগ করা | সহপাঠীদের নামে অকারণে অভিযোগ করা, যেমন: "আমাকে মেরেছে", "আমাকে ধাক্কা দিয়েছে", "আমাকে গালি দিয়েছে" প্রভৃতি যা প্রকৃতপক্ষে ভিত্তিহীন ও বানিয়ে বলা। |
| অনর্থক শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করা | মিথ্যে বলে ঘন ঘন শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করা, যেমন: পানি খাওয়া বা টয়লেট এর কথা বলে শ্রেণিকক্ষ থেকে বের হয়ে অন্য কাজ করা যেমন: খেলা)। |
| অন্যান্য | |
| চুরি করা | সহপাঠীর জিনিস না বলে নেওয়া, যেমন: কলম, পেন্সিল, রাবার প্রভৃতি। |
| অন্যমনস্ক থাকা | শিক্ষার্থীকে দেখে মনে হবে মনোযোগী, কিন্তু বাস্তবে সে শ্রেণি শিখনে মনোযোগ না দিয়ে অন্য কাজ করে, যেমন: শিক্ষক হয়তো দেখবেন শিক্ষার্থী মনোযোগ দিয়ে লিখছে, কিন্তু আসলে সে খাতায় ছবি এঁকে খেলছে। |
| খারাপ ভাষা ব্যবহার করা | শ্রেণিতে অনুপোযুক্ত এবং অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ (ভাষা) ব্যবহার করা যা বাংলদেশের সংস্কৃতির সাথে বেমানান। |

শিক্ষার্থীদের এসব আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু শ্রেণি ব্যবস্থাপনা। এজন্য প্রথমেই একটি ইতিবাচক শ্রেণি পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন।

### অনুকূল শ্রেণি পরিবেশ প্রতিষ্ঠা

কার্যকর শ্রেণি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি অনুকূল শ্রেণি পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা দরকার। প্রশ্ন হলো- অনুকূল শ্রেণি পরিবেশ কী? অনুকূল শ্রেণি পরিবেশ হলো শ্রেণিকক্ষের এমন একটি অবস্থা যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও উষ্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। এ ধরনের শ্রেণি পরিবেশে শিক্ষার্থীরা অসহযোগিতামূলক আচরণ ও ভয়-ভীতিমুক্ত পরিবেশে শিখতে পারে। শিক্ষার্থীরা পাঠে মনোযোগী হয় এবং বিভিন্ন ধরনের কাজে সক্রিয় থাকে।

কীভাবে অনুকূল শ্রেণি পরিবেশ তৈরি করা যায়? শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে এটা ব্যক্তির পছন্দের ওপর নির্ভর করে, ব্যক্তি তার নিজস্ব কৌশল অনুসরণ করে অনুকূল শ্রেণি পরিবেশ তৈরি করেন। যেমন- কেউ শ্রেণিকক্ষে নানা নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা ও তা মানতে বাধ্য করে শ্রেণিকক্ষে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। আবার, কেউ নিয়ম-কানুনের অত কড়াকড়ি না করে আকর্ষণীয় পাঠ উপস্থাপন ও তাতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শ্রেণিকক্ষে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। তবে কিছু সাধারণ কৌশল অবলম্বন করে একটি অনুকূল শ্রেণি পরিবেশ তৈরি করা যায়। এগুলো হলো-

- সম্পর্ক উন্নয়ন করা
- আচরণ বিধি প্রতিষ্ঠা
- যোগাযোগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা
- জেন্ডার ও জাতিগত বৈষম্য দূর করা
- বিশেষ চাহিদার প্রতি সাড়া দেওয়া

নিচে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

### সম্পর্ক উন্নয়ন

অনুকূল শ্রেণি পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পর্ক উন্নয়ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিন ধরনের দক্ষতার প্রতি মনোযোগী হতে হবে- সাধারণ মানবীয় সম্পর্ক উন্নয়ন দক্ষতা, শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন দক্ষতা এবং অভিভাবকদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন দক্ষতা। নিম্নে প্রত্যেকটি দক্ষতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

### ১. সাধারণ মানবীয় সম্পর্ক উন্নয়ন দক্ষতা

- **বন্ধুত্বভাবাপন্নতা:** শিক্ষার্থীদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন মনোভাব পোষণ করা। এমনকি যে শিক্ষার্থী বিরক্ত করে তার সাথেও হাসিমুখে এবং ভদ্রভাবে কথা বলা।
- **ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি:** সমস্যা নিয়ে দোদুল্যমান না থেকে বা সমস্যাকে দীর্ঘায়িত না করে সমাধান খোঁজা।
- **শোনার সামর্থ্য:** মন দিয়ে শিক্ষার্থীদের কথা শোনা এবং বোঝানো যে তাদের মতামত মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

- **সত্যিকারের প্রশংসা করার সামর্থ্য:** ভালো কাজ বা পারদর্শিতার জন্য সত্যিকার প্রশংসা করা।

**২. শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন দক্ষতা**

- **নিয়মিত মনোযোগ দেয়া:** শিক্ষার্থীদের প্রতি মনোযোগী হওয়া। তাদের সাথে ঘনঘন তবে সংক্ষেপে কথা বলা, তাদের খোঁজখবর করা।
- **সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ:** শিক্ষার্থীদের প্রতি সমর্থন ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা। দেখা হলে তাদের খোঁজখবর করা।
- **নিয়মিত সহায়তাদান:** শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়মিত সহায়তাদানের ইচ্ছে রাখা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান।
- **শিষ্টাচার ও সুআচরণের মডেল উপস্থাপন:** শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যেসব আচরণ যেমন- শিষ্টাচার, ভালো আচরণ ইত্যাদি প্রত্যাশা করা হয় তা নিজের ক্ষেত্রে অনুশীলন করা এবং শিক্ষার্থীদের সামনে এসব ক্ষেত্রে নিজেকে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা।

**৩. অভিভাবকদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন দক্ষতা**

- **নিয়মিত যোগাযোগ:** শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ। এক্ষেত্রে পথেঘাটে দেখা হলে, বাড়ি পরিদর্শনে গিয়ে বা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে উপস্থিত হলে সন্তানদের বিষয় নিয়ে তাদের সাথে কথা বলা যায়। ক্ষেত্রবিশেষে চিঠি দিয়ে বা ফোন করেও যোগাযোগ হতে পারে।
- **স্পষ্টভাবে যোগাযোগ:** যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে বিষয় তাদের জানানো হবে তা সহজ ও স্পষ্ট হওয়া।
- **প্রত্যাশা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলা:** শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক অগ্রগতির উদ্দেশ্যে তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে শিক্ষক হিসেবে নিজের প্রত্যাশা কী তা স্পষ্টভাবে জানানো।
- **ইতিবাচক বিষয়কে অগ্রাধিকার:** শিক্ষার্থীদের সীমাবদ্ধতার প্রতি অনেক বেশি গুরুত্ব না দিয়ে তাদের অগ্রগতি অর্থাৎ শিক্ষার্থী কী পারছে, সহায়তা পেলে আরও কী অগ্রগতি হতে পারে, কোন ক্ষেত্রে এবং কী ধরনের সহায়তা প্রয়োজন ইত্যাদির প্রতি গুরুত্ব দেয়া।

শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাথে সুসম্পর্ক একটি কার্যকর, পরস্পর সহায়তাপূর্ণ ও উপভোগ্য শ্রেণি পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

**আচরণবিধি প্রতিষ্ঠা**

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি আচরণবিধি প্রতিষ্ঠা অনুকূল শ্রেণি পরিবেশ তৈরিতে সহায়ক। তবে আচরণবিধিতে নিয়ম-কানুনের সংখ্যা ও পরিসর নির্ভর করবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার ধরনের ওপর। অত্যধিক বা অপর্যাপ্ত নিয়ম-কানুনের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। শ্রেণিতে অনেক বেশি এবং আনুষ্ঠানিক নিয়ম-কানুন থাকলে শিক্ষার্থীদের কাছে তা কর্তৃত্বপরায়ণ মনে হবে এবং তারা এর প্রতি সাড়া দিবে না। ফলে শ্রেণি পরিবেশ বন্ধুত্বপূর্ণ থাকবে না। আবার একজন শিক্ষকের পক্ষে সব শিক্ষার্থীর প্রতি এককভাবে মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয় না। তাই শ্রেণি কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক নিয়ম-কানুন থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে নতুন শিক্ষকদের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের করণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করে একটি সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি থাকলে অধিকাংশ শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সমস্যা এড়ানো সম্ভব হয়। ফলে শ্রেণিকার্য পরিচালনা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা আলাদা আচরণবিধি থাকতে পারে। আবার সব কাজের জন্য একটি সমন্বিত আচরণবিধিও থাকতে পারে। তবে সমন্বিত আচরণবিধি থাকলেও কাজের ভিন্নতার প্রেক্ষিতে বিশেষ আচরণবিধি প্রণয়নের দরকার হয়। কাজ বাস্তবায়নের জন্য কী ধরনের আচরণবিধি দরকার আগে থেকেই তার পরিকল্পনা করে রাখা কাজের জন্য সহায়ক। নিম্নে শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি আচরণবিধির উদাহরণ দেয়া হলো-

সারণি ২.৩: শ্রেণি আচরণবিধি প্রতিষ্ঠার ছক (নমুনা)

| **শ্রেণি কার্যক্রম** | **শিক্ষার্থীদের করণীয়**(শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে শিক্ষক নির্ধারণ করবেন) |
|---|---|
| শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের প্রবেশ | - শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে শিক্ষককে সম্মান জানাবে<br>- |
| শ্রেণি কার্যক্রমের সমাপ্তি | - |
| ছোট দলে কাজ | - |
| বড় দলে/শ্রেণিকক্ষে সকলে একত্রে কাজ | - |
| প্রদত্ত কাজ সম্পন্ন হলে | - |
| ক্লাস ক্যাপ্টেন/দল নেতার কাজ | - |
| একক বা দলীয় প্রজেক্টের কাজ | - |
| শিক্ষক কোন কারণে শ্রেণিকক্ষে না থাকলে/ত্যাগ করলে | - |
| টয়লেট/বাথরুমে যেতে হলে | - |
| উপস্থিতি যাচাই/রোল কলের সময় | - |

একটি আচরণবিধি প্রণয়নের পর তার সাথে পরিচিত হতে ও মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগে। তবে একবার এর সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেলে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা সহজ হয়ে যায়। এজন্য শিক্ষা বছরের শুরুর দিনই শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে এসব নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অবহিত করবেন। তবে এক্ষেত্রে কিছু বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন। এগুলো হলো-

- ধরে নিবেন না যে একবার বলার পরই শিক্ষার্থীরা আচরণবিধি মনে রাখবে। তাই আচরণ বিধি সম্পর্কে পদ্ধতিগতভাবে এবং বারবার শিক্ষার্থীদেরকে অবহিত করতে হবে।
- শিক্ষক নিজেই আচরণ বিধিনির্ধারণ করবেন না বরং শিক্ষার্থীদের মতামতেরভিত্তিতে শ্রেণি নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা করবেন।
- শুরুতেই অনেক বেশি নিয়ম-কানুন অনুসরণের জন্য চাপ দিবেন না। বরং কিছু সাধারণ নিয়ম-কানুন দিয়ে শুরু করুন।

- শুরুতে নিয়মের আধিক্য এড়াতে সমগ্র শ্রেণির/বড় দলের কাজ ছাড়া অন্য কোন কোন ধরনের কাজ করাবেন না। এতে একসাথে বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন নিয়মের আধিক্য এড়ানো যাবে।

একজন দক্ষ শিক্ষক কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরও পর্যবেক্ষণ করবেন যে প্রণীত আচরণ বিধি যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা। এসব ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন বাদ দিতে হবে। আবার ক্ষেত্রবিশেষে কিছু নতুন নিয়ম-কানুন প্রণয়নের দরকার হতে পারে। তবে এসব নিয়ম-কানুন প্রণয়নের কারণ ব্যাখ্যা করলে তা শিক্ষার্থীদের সমর্থন ও সহযোগিতা পেতে সহায়ক হয়।

### যোগাযোগ মাধ্যম প্রতিষ্ঠা

শ্রেণি ব্যবস্থাপনার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শিক্ষার্থীদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ। যোগাযোগের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়কে মাথায় রাখতে হয়- আমরা কী জন্য যোগাযোগ করি এবং কীভাবে যোগাযোগ করি। শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগের উদ্দেশ্য হলো প্রয়োজনীয় তথ্য বিনিময় ও নির্দেশনা প্রদান। এজন্য মৌখিক ও ইশারা-ইঙ্গিত দুই ধরনের পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়। পরবর্তী পাঠে শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই এখানে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করা হলো।

### জেন্ডার ও জাতিগত বৈষম্য দূর করা

শ্রেণি ব্যবস্থাপনার অপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থী এবং নারী/পুরুষ শিক্ষকের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক এবং বিভিন্ন জাতি-বর্ণের শিক্ষার্থীদেও মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে ছেলে শিক্ষার্থীদের তুলনায় মেয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা কম। মেয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের অনুভূতি সেভাবে প্রকাশও করে না। অপর এক গবেষণায় দেখা গেছে, শিক্ষকরাও ছেলে শিক্ষার্থীদের তুলনায় মেয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে কথা কম বলে এবং তাদের নাম কম মনে রাখে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক কর্তৃক অধিক প্রাধান্য পাওয়া এবং মেয়েদের তুলনায় নিজের প্রতি অধিক আস্থা ও আত্মশ্রদ্ধা থাকায় ছেলে শিক্ষার্থীরা বিশেষ ক্ষমতা চর্চা ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা পোষণ করে। ফলে শ্রেণিকক্ষে তাদের অসহযোগিতামূলক আচরণ প্রদর্শিত হয়। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে, যেমন-

- তারা নিজেদের কৌতুকপূর্ণ করে তুলে এক ধরনের জনপ্রিয় ভাবমূর্তি তৈরি করতে চায়;
- বিদ্যালয়ের কাজে তারা বিরক্ত এবং বিদ্যালয়কে অপছন্দ করে;
- তারা নিজেদেরকে আগ্রাসী হিসেবে জাহির করতে চায়;
- তারা মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায় এবং মেয়েদের সামনে নিজেদের জাহির করতে চায়;
- তারা তাদের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা প্রকাশ করতে চায়।

জেন্ডারের মত শিক্ষার্থীদের জাতি-বর্ণ ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ও শ্রেণিকক্ষে তাদের আচরণ নির্ধারণ করে দেয়। সাধারণত দরিদ্র ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের শিশুদের মত স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ করে না। আবার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় ভাষা ও সংস্কৃতিগত ভিন্নতার কারণে নিজেদের ঠিকভাবে প্রকাশ করে না। এ ধরনের শিশুরা অন্যদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মৌখিক নিগ্রহের পাশাপাশি দমন, তিরস্কার ও বিব্রতকর অবস্থার শিকার হয়। এসব নিগ্রহ ও নিজেকে ঠিকভাবে প্রকাশ করতে না পারার ফলে এই শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন আচরণগত সমস্যা দেখা দেয়, যা শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ ধরনের সমস্যা মোকাবেলার জন্য শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের নৃ-তাত্ত্বিক, জাতিগত বা অর্থনৈতিক

ভিন্নতাকে স্বীকৃতি, সম্মান ও সমর্থন দিতে হবে। শিক্ষার্থীদেরও সেভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এছাড়া বিদ্যালয়ে জেন্ডার সমতা ও সংঘাত মোকাবেলা সংক্রান্ত নীতিমালা ও প্রয়োজনীয় রিসোর্স থাকা বাঞ্ছনীয়।

### বিশেষ চাহিদার প্রতি সাড়া প্রদান

শ্রেণিকক্ষে কিছু শিক্ষার্থী আছে যাদের প্রয়োজন সাধারণ শিশুদের থেকে ভিন্ন। তাদের এ ধরনের বিশেষ চাহিদার কারণ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা, যেমন- দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা, শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধকতা। শ্রেণিকক্ষের স্বাভাবিক সুবিধা এবং নিয়ম-কানুন তাদের জন্য সহায়ক নাও হতে পারে। ফলে তারা নিজেদেরকে অবহেলিত ভাবে এবং নানা ধরনের আচরণগত সমস্যা তৈরি হয়। তাছাড়া প্রতিবন্ধকতার কারণে তাদের শিখনও বাধাগ্রস্ত হয়। আবার হাইপার একটিভ ডিসঅর্ডার বা অটিস্টিক শিশু থাকলে তারা শ্রেণিকক্ষে অন্য শিশুদেরও বিরক্ত করে এবং মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটায়। কিছু শিশু শ্রেণিকক্ষে অন্যদের মনোযোগ পাওয়ার জন্যও নানা ধরনের সমস্যাপূর্ণ আচরণ করে। ফলে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শিশুদের চাহিদার প্রতি যথাযথ সাড়া দান ও সঠিক পরিচালনা কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে এ ধরনের সমস্যা কমিয়ে আনা যায়। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে:

- তাদেরকে শ্রেণিকক্ষের সামনের দিকে শিক্ষকের কাছাকাছি বসানো এবং তাদের কাছাকাছি গিয়ে কথা বলা। তবে এ ধরনের শিশুদের একসাথে না বসিয়ে অন্য শিশুদের সাথে বসাতে হবে।
- শারীরিক প্রতিবন্ধিতা থাকলে তার বসার ও কাজ করার জন্য সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা।
- কোন বিষয় আলোচনা বা ব্যাখ্যার সাথে সাথে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি ও দর্শনযোগ্য উপকরণ ব্যবহার করা।
- তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ও বোঝানো যে শিক্ষক তাদের প্রতি আগ্রহী ও তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছেন।
- শিক্ষকের কথায় সাড়া প্রদান ও কাজের জন্য তাদের বাড়তি সময় দেয়া।
- সমস্যাপূর্ণ আচরণ করলে কাজটি থামানোর জন্য সরাসরি আদেশ না দিয়ে অন্য কাজ দিয়ে সমস্যাপূর্ণ আচরণ থেকে তাদের বিরত করা।
- বিভিন্ন সংকেত বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বোঝানো যে অন্যদের সমস্যা হচ্ছে।
- পার্শ্ববর্তী শিশুদের মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করা ও সহায়তা করা।

### শৃঙ্খলা (Discipline) প্রতিষ্ঠা

শ্রেণি ব্যস্থাপনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শৃঙ্খলা। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে উদ্দেশ্যমুখী আচরণে অভ্যস্ত করে তোলা যায়। শিক্ষার্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণে ৩ ধরনের শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, যথা- প্রতিরোধমূলক শৃঙ্খলা, সহায়তামূলক শৃঙ্খলা ও সংশোধনমূলক শৃঙ্খলা। নিচে এ তিন ধরনের শৃঙ্খলা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

#### *প্রতিরোধমূলক শৃঙ্খলা*

শ্রেণিকক্ষে সমস্যাপূর্ণ আচরণ ঘটার আগে তা প্রতিরোধ করাই উত্তম। প্রতিরোধের নানা উপায় আছে। এর একটি উপায় হলো সতর্কতা এবং পূর্বানুমান। সতর্ক থাকলে কোন ধরনের সমস্যামূলক আচরণ ঘটার পূর্বেই

তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়া যায়। অন্য উপায় হলো পাঠের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য, ভিন্নতা ও বহুমুখিতা আনা। এগুলো নিম্নোক্ত উপায়ে হতে পারে-

- **বৈচিত্র্যঃ** শিক্ষার্থীদের সামনে পাঠকে এমনভাবে উপস্থাপন করুন যেন তারা এর জন্য সময় ও শ্রম দিতে ইচ্ছুক হয় এবং পাঠ তাদের কাছে উপভোগ্য হয়। এটাও বিবেচনায় রাখতে হবে যে পাঠের মাধ্যমে অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের কীভাবে সহায়তা করবেন। শ্রেণিকক্ষে বিদ্যমান সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা পূরণের উপযোগী উপকরণ তৈরি করুন।
- **ভিন্নতাঃ** পাঠে শিক্ষার্থীদের একঘেয়েমি দূর করতে বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড যুক্ত করুন। শোনা, লেখা, আলোচনা করা, পড়া, সমস্যা সমাধান, বর্ণনা প্রদান ইত্যাদি নানা কর্মকান্ড যুক্ত করার জন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা করুন।
- **বহুমুখিতাঃ** যদি পরিকল্পনামাফিক পাঠদান কাজ অগ্রসর না হয় তবে এ ধরনের আকস্মিক অবস্থা মোকাবেলার জন্য আগে থেকেই কিছু বিকল্প ব্যবস্থা রাখুন। কোন কাজ করতে গিয়ে যদি আপনার খুব বেশি সমস্যা হয় তবে তা নিয়ে জোরাজুরি করার দরকার নেই। কাজটি থামিয়ে রেখে পরবর্তী কাজে চলে যান।

শ্রেণিকক্ষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার পর শিক্ষার্থীদেরকে তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত আচরণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও শ্রেণিকক্ষের আচরণবিধি সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

*সহায়তামূলক শৃঙ্খলা*

শিক্ষার্থীরা সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধরনের ত্রুটিপূর্ণ আচরণ করবে। এ ধরনের আচরণ প্রতিটি শ্রেণিকক্ষেই ঘটতে পারে এবং ঘটতে থাকবে। সংবেদনশীলতা ও সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান ব্যবহারের মাধ্যমে কোন বড় ইস্যু তৈরি হওয়ার আগেই এ ধরনের সমস্যাসমূহ সমাধান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের কাজ হলো সমস্যাটিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা এবং পুরো শ্রেণির ইস্যু না বানিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে এ বিষয়ে সতর্ক করা। সমস্যা সমাধানের জন্য প্রত্যেক শিক্ষক নিজস্ব কৌশল উন্নয়ন ও ব্যবহার করবেন। তবে এক্ষেত্রে নিম্নের কৌশলগুলোও ব্যবহার করা যায়।

- সমস্যামূলক আচরণ প্রদর্শনকারী শিক্ষার্থীর সাথে চোখে চোখে যোগাযোগ রাখা (Eye contact) এবং তার দিকে তাকিয়ে থাকা।
- বাক্যের মাঝামাঝি থেমে যাওয়া এবং সমস্যামূলক আচরণসম্পন্ন শিক্ষার্থীর দিকে তাকানো।
- মাঝেমাঝে শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন অংশে আসা-যাওয়া করা।
- সমস্যামূলক আচরণসম্পন্নশিক্ষার্থীর কাছে যাওয়া এবং তাকে শ্রেণির কাজে মনোযোগী হতে বলা।
- ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে সমস্যাজনক আচরণসম্পন্নশিক্ষার্থীকে সতর্ক করা, যেমন- মাথা নাড়ানো, ভ্রূ কুঁচকানো, হাতের ইশারা দেয়া ইত্যাদি।
- সমস্যামূলক আচরণসম্পন্ন শিক্ষার্থীর কাছে এগিয়ে যাওয়া এবং সেখানে থেকে পাঠ চালিয়ে যাওয়া।
- শ্রেণিকক্ষের কোন বস্তুর কারণে শ্রেণিকক্ষে আচরণগত সমস্যা দেখা দিলে তা দ্রুত এবং শিক্ষার্থীদের মনোযোগের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে সরিয়ে নেয়া।

- সমস্যামূলক আচরণসম্পন্ন শিক্ষার্থীর সাথে এককভাবে কথা বলা।এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সময় বের করার জন্য অন্য শিক্ষার্থীদের কোনো কাজ দেয়া।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরভালো আচরণের প্রশংসা করা। যেমন, ধন্যবাদ দেয়া।

*সংশোধনমূলক শৃঙ্খলা*

যদি কোনো একজন বা একদল শিক্ষার্থী বারবার ছোটখাট সমস্যামূলক আচরণ করতে থাকে তাহলে সংশোধনমূলক শৃঙ্খলার দরকার হতে পারে। যদি এ ধরনের আচরণের ফলে আপনার শ্রেণি কার্যক্রম বা আপনি যে ধরনের শ্রেণিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চান সেক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটে তবে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বড় প্রয়োজন অবশ্যই এ ধরনের সমস্যামূলক আচরণের পরিসমাপ্তি ঘটানো। এজন্য শিক্ষার্থীর নাম, তার দ্বারা সংঘটিত সমস্যামূলক আচরণ ও প্রত্যাশিত আচরণ চিহ্নিত করা দরকার। এরপর শান্তভাবে তার কাছে গিয়ে সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্টভাবে বিষয়টি বুঝিয়ে বলতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে শিক্ষার্থী শিক্ষকের কথা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান যাই করুক এর রেশ যেন অবশিষ্ট সময়জুড়ে না থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে এ ধরনের অনমনীয় আচরণের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন হয় এবং এটা ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে হয়। এজন্য উপযুক্ত শাস্তি, যেমন- আলাদাভাবে কাজ করতে দেয়া, প্রদত্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য ছুটির পরও বিদ্যালয়ে অবস্থান করা, অতিরিক্ত বাড়ির কাজ দেয়া ইত্যাদি সম্পর্কে সকল শিক্ষার্থীকে সচেতন করা প্রয়োজন হয়।

প্রত্যেক শিক্ষক তার কাজের জন্য সর্বোত্তম এক সেট কৌশল উন্নয়ন ও ব্যবহার করবেন। পাশাপাশি নিম্নোক্ত করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো মেনে চলা দরকার।

**করণীয়**

- শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত শাস্তি অবশ্যই সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।
- সমস্যাজনিত আচরণসম্পন্ন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে শুনুন তার কী ধরনের আচরণ করা উচিত।
- সমস্যামূলক আচরণকে যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা।

**বর্জনীয়ঃ**

- শাস্তি হিসেবে বিদ্যালয়ে অধিক কাজ দেয়া।
- এক বা দু'জনের অপরাধে শ্রেণিকক্ষের সকলকে শাস্তি দেয়া।
- বিদ্রুপ ও উপহাস করা।
- সমস্যাজনিত আচরণসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে প্রধান শিক্ষক বা অন্য কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তির কাছে পাঠানো। এটা কেবল সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবেই পাঠানো যেতে পারে।

## একটি ভারসাম্যপূর্ণ শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

কীভাবে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা করতে হবে এ বিষয়ে প্রত্যেক শিক্ষকেরই সুসংগঠিত ধারণা থাকা উচিত। উপরে যেমন আলোচনা করা হয়েছে যে প্রথমবার শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মোকাবেলা করার পূর্বে অনেক ধরনের পরিকল্পনার দরকার হয়। এ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো শ্রেণিকক্ষের ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষার্থীদের গতিবিধি, রিসোর্স সংস্থাপন ইত্যাদি। প্রথমবার শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতার পর আপনাকে সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি প্রণয়ন ও সমন্বিতভাবে অনুকূল শ্রেণি পরিবেশ তৈরির জন্য কাজ করতে হবে। এজন্য আপনাকে সুনির্দিষ্ট

নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং নিয়ম-কানুনসমূহ অনুসৃত না হলে প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে। সাথে এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে আপনি যেসব আচরণবিধি ও নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করেছেন তা বিদ্যালয়ের সামগ্রিক নীতি ও কর্মপ্রক্রিয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আপনার প্রণীত নিয়ম-কানুন ও আচরণবিধির সাথে পরিচিত এবং এর প্রতি তার সমর্থন রয়েছে তা নিশ্চিত করা।

শ্রেণি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শিক্ষক কর্তৃক নিয়মিত পর্যালোচনা হওয়া দরকার। পর্যালোচনার জন্য নিচের শ্রেণি ব্যবস্থাপনার কিছু প্রশ্ন করা যেতে পারে, যথা-

- শ্রেণিকক্ষে স্বচ্ছন্দ কিন্তু উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক পরিবেশ আছে?
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা কি নিরাপদ ও সুরক্ষিত বোধ করে?
- অধিকাংশ শিক্ষার্থী কি মনে করে যে তাদের অগ্রগতি হয়েছে?
- শিক্ষার্থীরা কিশ্রেণিকক্ষের নিয়ম-কানুনের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পেরেছে?
- সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কী পরামর্শ রয়েছে?
- সমস্যামূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণে প্রণীত নিয়ম-কানুন কতটা কার্যকর?

চার্লসের (২০০৪) মতে প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য 'আমার প্রয়োজন', 'আমার পছন্দ' ও 'আমার অপছন্দ' এই তিনটি বিষয় নিয়ে ভাবা, তা লেখা ও সে অনুযায়ী কাজে প্রতিফলন ঘটানো খুবই সহায়ক অনুশীলন। অগ্রাধিকারসমূহ এই তিনটি শিরোনামের অধীনে লিখে শিক্ষকগণ বুঝতে পারেন কোন একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিকক্ষের জন্য এর কিছু অগ্রাধিকার কতটা যথার্থ।

প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থীদের জন্য আপনি যেসব ব্যবস্থা নিতে চান সেগুলোও লিখে ফেলুন। এরপর পূর্বের মত এগুলো নিয়েও নিজেকে প্রশ্ন করুন। যেমন-

- শিক্ষার্থীর অপরাধের মাত্রার সাথে এটি কি যৌক্তিকভাবে নির্ধারিত?
- কোনো একটি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য কি এটি যথাযথ?
- এর প্রতি শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া কী?
- গৃহীত ব্যবস্থা কতটা ন্যায়সঙ্গত তা পরীক্ষার পর আমি কি এর কিছু পরিবর্তন করতে প্রস্তুত?

এভাবে চিন্তা, পরিকল্পনা ও কাজের ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ শ্রেণি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ধারাবাহিক অনুশীলনের মাধ্যমেই একটি কার্যকর শ্রেণি ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয়।

সকল শিক্ষক, বিশেষ করে শিক্ষার্থী শিক্ষক ও নতুন নিয়োগকৃত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। একটি অনুকূল শ্রেণি পরিবেশ তৈরির কৌশল হিসেবে শিক্ষক ও তার শিক্ষার্থীদের যৌথ প্রচেষ্টায় শ্রেণি আচরণবিধি ও সঠিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রতিষ্ঠা করা যায়। সমস্যামূলক আচরণ কখনো পুরোপুরি দূর করা যায় না। তবে শিক্ষক কর্তৃক সঠিক পরিকল্পনা ও সে অনুযায়ী ন্যায্য ও সঙ্গত রোলমডেল উপস্থাপন করা গেলে সমস্যামূলক আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট মানসিক সমস্যা ও অপ্রীতিকর অনুভূতিকে প্রশমন করা যায়।

## শিশুর ভিন্নতা

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সকল শিশুর অংশগ্রহণের অধিকার আছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং বাংলাদেশ সরকার প্রণীত শিশু অধিকার আইন অনুযায়ী সকল শিশুরই মৌলিক শিক্ষার অধিকার আছে এবং এ উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির অধিকার আছে। আমাদের শিক্ষানীতিও একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের কথা বলেছে যেখানে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও শারীরিক প্রতিবন্ধিতা নির্বিশেষে সকল শিশুরই একই বিদ্যালয়ে এবং একই শ্রেণিকক্ষে বসে শিক্ষালাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং বাস্তব কারণেই শ্রেণিকক্ষ বলতে এখন একীভূত শ্রেণিকক্ষই বোঝায়।

আমরা জানি যে প্রতিটি শিশুই আলাদা। ফলে শ্রেণিকক্ষের অনেক শিশুর মধ্যে নানা ধরনের ভিন্নতা দেখা যায়। কেউ হয়তো দ্রুত শিখে, কেউ ধীরে, কেউ হয়তো কম শুনতে বা কম দেখতে পায়, কারও বাসায় ব্যবহৃত ভাষা বিদ্যালয়ের ব্যবহৃত ভাষা হতে ভিন্ন। এসব ভিন্নতার কারণে প্রত্যেক শিশুর শিখন চাহিদাও ভিন্ন হয়। যেমন যে ধীরে শেখে অন্যদের সাথে শিখতে গেলে তার হয়তো একটু আলাদা সহায়তার দরকার হয়। একইভাবে যার বাসায় ব্যবহৃত ভাষা ভিন্ন (যেমন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশু) তাকে শিক্ষকের নির্দেশনা বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত ভাষার পাশাপশি তার নিজের ভাষায় বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হয়। তা না হলে তার পক্ষে অন্যদের সাথে পড়াশোনা চালিয়ে নেয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন/চাহিদা অনুযায়ী সহায়তা দেয়ার জন্য তাদের ভিন্নতা চিহ্নিত করা প্রয়োজন এবং এরপর ভিন্নতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা নির্ণয় করা প্রয়োজন। এ পাঠে শিক্ষার্থীদের নানা ধরনের ভিন্নতা, ভিন্নতা চিহ্নিত করার উপায়, ভিন্নতা অনুযায়ী চাহিদা নিরূপণ করার উপায় এবং শিশুদের ভিন্নতা ও ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা নির্ণয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

### শিশুদের ভিন্নতার ধরন

উপরে যেমন বলা হয়েছে যে প্রতিটি শিশুই আলাদা। তারা বয়সে কাছাকাছি হলেও একে অন্যের থেকে আলাদা। কেউ লাজুক, কেউ চটপটে, কেউ দ্রুত শিখে, কেউ ধীরে, কেউ পড়ায় ভালো কিন্তু অঙ্কে কাঁচা, কেউ ক্লাসে মনোযোগী, কেউ নিজে মনোযোগী নয় আবার অন্যদেরও সমস্যা করে, কেউ অন্যদের মত ভালো দেখতে বা শুনতে পায় না। শিশুদের মধ্যে আরও নানা ধরনের ভিন্নতা দেখা যায়। এই ভিন্নতাসমূহ তাদের শিখনকে প্রভাবিত করে। শিশুদের এসব ভিন্নতাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো-

**শিক্ষার্থীদের শেখার ধরনগত ভিন্নতা** - কেউ ভাষাগত বিষয় ভালো শেখে, কেউ গাণিতিক বিষয় ভালো শেখে, কেউ পড়ে ভালো শেখে, কেউ কাজ করার মাধ্যমে ভালো শেখে ইত্যাদি। হাওয়ার্ড গার্ডনারের বহুমুখী শিখন তত্ত্বে শিশুদের এ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন শিখন দক্ষতার কথা বলা হয়েছে।

**শিক্ষার্থীদের পারগতার স্তরে ভিন্নতা** - শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার ভিন্নতার কারণে এ ধরনের পার্থক্য দেখা যায়। যেমন- কেউ দ্রুত শেখে, কেউ ধীরে শেখে।

**শিক্ষার্থীদের প্রতিবন্ধিতার কারণে সৃষ্ট ভিন্নতা** - বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতার কারণে অন্য শিশুদের থেকে কিছু শিশুর ভিন্ন চাহিদা দেখা যায়। যেমন- দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা, শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা ইত্যাদি কারণে অন্য শিশুদের থেকে তারা কিছুটা ভিন্ন হয়।

**শিক্ষার্থীদের আচরণগত ভিন্নতা** - শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আচরণের ভিত্তিতেও তাদেরকে আলাদা করা হয়। যেমন- কিছু শিক্ষার্থী রয়েছে যারা শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে এবং শিক্ষকের সাথে সহযোগিতামূলক আচরণ করে। আবার কিছু শিক্ষার্থী শ্রেণি কার্যক্রমে ঠিকভাবে অংশগ্রহণ করে না, উপরন্তু শিক্ষক ও অন্য শিক্ষার্থীদের শিখন শেখানো কার্যক্রমে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

**শিক্ষার্থীদের জেন্ডার ভিন্নতা** - উন্নত দেশগুলোতে জেন্ডার ভিন্নতা শিখন শেখানো কার্যক্রমে কোন ধরনের প্রভাব না ফেললেও আমাদের মত দেশে এখনো জেন্ডারভিন্নতার কারণে শিশুদের শিখন কার্যক্রম প্রভাবিত হয়।

**শিক্ষার্থীদের ভাষাগত ভিন্নতা** - বাংলাভাষী শিশুদের কাছে ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা না থাকলেও বিভিন্ন ভাষাভাষী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুরা (যেমন: ত্রিপুরা, লুসাই, তঞ্চঙ্গ্যা) বিদ্যালয়ে ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়। এ ধরনের ভিন্নতা তাদের শিখনকে প্রভাবিত করে।

**শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতি, রীতিনীতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থাগত ভিন্নতা** -শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতিগত পার্থক্য, আর্থ-সামাজিক অবস্থাগত পার্থক্য ইত্যাদি কারণেও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। যেমন- যেসব শিশুর বাসায় পড়াশোনা জানা লোক নেই তাদের বাড়ির কাজ দেয়া হলে সহায়তার অভাবে তাদের পক্ষে সেটা করা সম্ভব নাও হতে পারে।

### শিক্ষার্থীদের ভিন্নতা চিহ্নিতকরণ ও চাহিদা নিরূপণ

শিখন শেখানো কার্যক্রমে শিশুদের সঠিক সহায়তা প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট করে তাদের ভিন্নতা চিহ্নিত করা ও সে অনুযায়ী সঠিক চাহিদা নির্ণয় করা প্রয়োজন। কিছু সতর্কতামূলক লক্ষণ দেখে বোঝা যায় যে শিক্ষার্থীর কোন ধরনের ভিন্নতা আছে কিনা এবং থাকলে তা কী ধরনের। নিম্নে শিক্ষার্থীদের ভিন্নতা অনুযায়ী সতর্কতামূলক লক্ষণ ও এজন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা নিরূপণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

### শিক্ষার্থীদের শেখার ধরনগত ভিন্নতা

মানুষ ভিন্ন ভিন্নভাবে শিখে। এ থেকে প্রমাণিত হয় মানুষের বুদ্ধিমত্তার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। যেমন, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বুদ্ধিমত্তা আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছেমানুষের কমপক্ষে আট ধরনের বুদ্ধিমত্তা রয়েছে। এ বুদ্ধিমত্তার মাত্রা সকল মানুষের সমান নয়। কেউ একটিতে প্রবল আবার অন্যগুলোয় দুর্বল। বাড়িতে বা শ্রেণিকক্ষে শিশুদের/শিক্ষার্থীদের আচরণ ও কার্যকলাপ থেকে এ পার্থক্য সহজে বোঝা যায়। ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিমত্তার রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ বা প্রকাশভঙ্গি। এ লক্ষণ দেখে আমরা প্রত্যেকের বুদ্ধিমত্তার প্রকার সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি। যেমন আমাদের মধ্যে কেউ পড়ে কোন বিষয় আয়ত্ত করে, কেউবা শুনে, আবার কেউ কেউ ছবি বা ভিডিও দেখে শিখতে পছন্দ করে। এর মাধ্যমে শিশুদের প্রবল ও দুর্বল বুদ্ধিমত্তাসমূহও চিহ্নিত করা যায়। শিখনের ক্ষেত্রে এ বুদ্ধিমত্তাগুলোর অনন্য ভূমিকা রয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে হাওয়ার্ড গার্ডনার-এর বহুমুখী বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আলোচনার সুবিধার্থে বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ অনুসারে কীভাবে নির্দিষ্ট কৌশল ও কার্যক্রম প্রয়োগ করলে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও দ্রুত আয়ত্ত করতে পারে তা হাওয়ার্ড গার্ডনার-এর বহুমুখী বুদ্ধিমত্তার তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বর্ণনা করা হলো-

শিখনে ভিন্নতাকে সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধিমত্তা ও তা চিহ্নিতকরণের লক্ষণসমূহ জানা একান্ত প্রয়োজন যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

- **মৌখিক ও ভাষাবৃত্তীয় বুদ্ধিমত্তা**

এটা শিশুর যোগাযোগ, ভাবপ্রকাশ এবং বিনিময়ের জন্য ভাষা ব্যবহারের সামর্থ্যকে বোঝায়। শিশু গান, গল্প ইত্যাদি মনে রাখতে সমর্থ হয়। যে শিশুর এ বুদ্ধিমত্তা প্রবল সে শোনা, বলা ও পড়ার মাধ্যমে সহজে শেখে। এর লক্ষণগুলো হলো-

- এক্ষেত্রে শিশু শুনতে পছন্দ করে।
- শিশু বলতে পছন্দ করে।
- শিশু পড়তে পছন্দ করে।
- শিশু লিখতে পছন্দ করে।
- শিশু সহজে বানান করতে পারে।
- শিশু গল্প বলতে ও লিখতে পারে।
- শিশু সাবলীল ভাষায় বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে পারে।
- শিশুর শব্দভাণ্ডার বেশি ও তা যথাযথ ব্যবহার করতে পারে।
- শিশু গুছিয়ে কথা বলতে পারে।
- শিশু প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী হয়।
- শিশু ভালো বক্তৃতা দিতে পারে।

- **যৌক্তিক ও গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা**

এর দ্বারা শিশুর গণনা করা, হিসাব করা, সংখ্যায় ব্যক্ত করার সামর্থ্য বোঝায়। বোঝায় প্রতীক ব্যবহার করা এবং গাণিতিক কাজ করা। যে শিশুর এ বুদ্ধিমত্তা প্রবল সে সংখ্যা, নকশা, যুক্তি প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে সহজে শেখে। এর লক্ষণগুলো হলো-

- এক্ষেত্রে শিশু গুণতে আনন্দ পায়।
- শিশু বস্তুর সাহায্য ছাড়াই কোন বিষয়ে সহজে ধারণা লাভ করে।
- শিশু সংক্ষিপ্ততা পছন্দ করে।
- শিশু যুক্তি দায়িত্ব বিচার বিবেচনা করে।
- শিশু ধাঁধা ও অঙ্কের খেলা পছন্দ করে।
- শিশু সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে পছন্দ করে।
- শিশু সমস্যা সমাধান করতে আনন্দ পায়।
- শিশু যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে।

- **দৃষ্টি ও অবস্থানমূলক বুদ্ধিমত্তা**

এটি শিশুর কোনো স্থানেরবৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষণ করা ও পার্থক্য করার সামর্থ্যকে বোঝায়। শিশু কোনো জিনিস দেখতে সমর্থ হয়, উপাদানসমূহ অনুমান করতে পারে এবং সৃজনশীলতার সাথে কোনো স্থানকে নিজের সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করতে পারে। যে শিশুর এ বুদ্ধিমত্তা প্রবল সে ছবি, রেখাচিত্র ও রূপকল্পনার সাহায্যে সহজে শেখে। এর লক্ষণগুলো হলো-

- এক্ষেত্রে শিশু ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করে।
- শিশু ছবির সাহায্যে মনে রাখে।

- শিশু ছবি আঁকতে ও রঙ করতে ভালোবাসে।
- শিশু প্রতিকৃতি বানাতে পছন্দ করে।
- শিশু মানচিত্র, চার্ট ও নকশা সহজে বুঝতে পারে।
- শিশু কোন কিছুর চিত্র সহজে কল্পনা করে।
- শিশু রূপক শব্দ ও বাক্য বেশি ব্যবহার করে।

- **ছন্দ ও সংগীতমূলক বুদ্ধিমত্তা**

এর দ্বারা শিশুর শব্দ শোনা ও সাড়া প্রদানের এবং শব্দের বিভিন্ন ধরন সৃষ্টির সামর্থ্য বোঝায়। যে শিশুর এ বুদ্ধিমত্তা প্রবল সে ছড়া, ছন্দ ও ধ্বনির তালে তালে সহজে শেখে। এর লক্ষণগুলো হলো-

- এক্ষেত্রে শিশু তাল ও লয়ের প্রতি আর্কষণ বেশি থাকে।
- শিশু সুর ও ছন্দ পছন্দ করে।
- শিশু গান পছন্দ করে।
- শিশু কবিতা ও ছড়া তালে তালে আবৃত্তি করতে পছন্দ করে।
- শিশু বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পছন্দ করে।
- শিশু প্রকৃতির ছন্দময় শব্দ শুনে সহজে আকৃষ্ট হয়।

- **অনুভূতি ও শরীরবৃত্তীয় বুদ্ধিমত্তা**

এর দ্বারা বোঝায় শিশুর শারীরিক নড়াচড়া বা চলাফেরা সমন্বয় করার এবং বিভিন্ন বস্তু ও উপকরণ নিজের সুবিধাজনক উপায়ে ব্যবহার করার সামর্থ্য। যে শিশুর এ বুদ্ধিমত্তা প্রবল সে শারীরিক কলাকৌশল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে সহজে শেখে। এর লক্ষণগুলো হলো-

- এক্ষেত্রে শিশু খেলাধুলা পছন্দ করে।
- শিশু কোন কিছু ধরতে বা স্পর্শ করতে চায়।
- শিশু হতেনাতে কাজ করতে পছন্দ করে।
- শিশু হস্তশিল্পে দক্ষ হয়।
- শিশু শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর নিজের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকে।
- শিশু অংশগ্রহণ করে সহজে শেখে।
- শিশু বস্তু সহজে নিয়ন্ত্রণ করে।
- শিশু শুনে বা দেখে শেখার চেয়ে যা নিজে করে শেখে তা বেশি মনে রাখে।

- **প্রকৃতিবিষয়ক বুদ্ধিমত্তা**

এর দ্বারা শিশুর প্রকৃতিকে সংশ্লিষ্ট করার সামর্থ্যকে বোঝায়। শিশু উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রজাতি চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়। যে শিশুর এ বুদ্ধিমত্তা প্রবল সে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান প্রত্যক্ষণ করে সহজে শেখে। এর লক্ষণগুলো হলো-

- এক্ষেত্রে শিশু গাছপালা ও পশুপাখি পর্যবেক্ষণ করতে পছন্দ করে।
- শিশু পশু-পাখি ও গাছপালার বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিন্তা করতে পছন্দ করে।
- শিশু গাছপালা ও পশুপাখি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পছন্দ করে।
- শিশু গাছ লাগাতে ও যত্ন করতে ভালোবাসে।

- শিশু জীবজগতের বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করতে পছন্দ করে।
- শিশু, প্রাণী ও উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা/পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পছন্দ করে।

- **আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা**

এটি শিশুর অন্যের সাথে সফলভাবে মিথস্ক্রিয়া করা ও সামাজিক জীবনে নিয়োজিত হওয়ার সামর্থ্য। এ ধরনের শিশু অন্যদের নেতৃত্ব প্রদান ও সংগঠিত করতে সমর্থ। যে শিশুর এ বুদ্ধিমত্তা প্রবল সে অন্যের সঙ্গে ও দলে কাজ করে সহজে শেখে। এর লক্ষণগুলো হলো-

- এক্ষেত্রে শিশু অন্যকে মনের কথা সহজে বুঝতে পারে।
- শিশু অন্যের সঙ্গে সহজে সম্পর্ক গড়ে তোলে।
- শিশুর অনেক বন্ধুবান্ধব থাকে।
- শিশু অন্যের ঝগড়া-বিবাদ মেটাতে এবং মধ্যস্থতা করতে পছন্দ করে।
- শিশু অন্যের কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করে।
- শিশু দলে কাজ করতে পছন্দ করে।
- শিশু সামাজিক পরিস্থিতি সহজে বুঝতে পারে।

- **অন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা**

এটি শিশুর নিজেকে বুঝতে পারার সামর্থ্য। এর মাধ্যমে বোঝায় শিশুর নিজের শক্তি ও দুর্বলতা জানা। যে শিশুর এ বুদ্ধিমত্তা প্রবল সে একাকী চিন্তা ও কাজ করে সহজে শেখে। এর লক্ষণগুলো হলো-

- এক্ষেত্রে শিশু একাকী থাকতে পছন্দ করে।
- শিশু কম কথা বলে।
- শিশু অধিক চিন্তা করে।
- শিশু নিজে নিজে শিখতে চায়।
- শিশু নিজের সম্মন্ধে সচেতন থাকে।
- শিশু কোন ঘটনার পূর্বাভাস সহজে অনুমান করতে পারে।
- শিশু নিজে নিজে কাজ করতে উৎসাহিত হয়।
- শিশু নিজের সবলতা ও দুর্বলতা সহজে বুঝতে পারে।
- শিশু সামাজিক র্কমকাণ্ড থেকে সাধারণত নিজেকে দূরে রাখে।

## শিক্ষার্থীদের চাহিদা

শিক্ষার্থীদের শেখার ধরনগত ভিন্নতার ক্ষেত্রে তাদের চাহিদা হলো সে যেভাবে শিখতে পছন্দ করে বা যেভাবে ভালো শিখে সেভাবে তাকে সহায়তা করা। যেমন যে ছন্দ ও সংগীতের মাধ্যমে শিখতে পছন্দ করে তাকে ছন্দ ও সংগীতের মাধ্যমে শেখার সুযোগ পাওয়া। যার আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা প্রবল তাকে অন্যদের সাথে দলে কাজ করে শেখার সুযোগ পাওয়া। অর্থাৎ প্রত্যেককে তার প্রবণতা ও পছন্দ অনুযায়ী শেখার সুযোগ পাওয়া। শ্রেণিকক্ষে যেহেতু বিভিন্ন ধরনের শিশু থাকে তাই শিশুদের বহুমুখী বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চাহিদা নিরূপণ করে সে অনুযায়ী শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করলে শিশুদের বহুমুখী বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক শিখন চাহিদা পূরণ হতে পারে।

এক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তাভেদে শিশুদের সুনির্দিষ্ট চাহিদাগুলো হলো-

- মৌখিক ও ভাষাবৃত্তীয় বুদ্ধিমত্তা প্রবল এমন শিশুদের ক্ষেত্রে শোনা, বলা ও পড়ার তথা ভাষা দক্ষতা ব্যবহারের মাধ্যমে শেখার সুযোগ পাওয়া।
- যৌক্তিক ও গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা প্রবল এমন শিশুদের ক্ষেত্রে সংখ্যা, নকশা, যুক্তি প্রয়োগ ইত্যাদি দক্ষতা ব্যবহারের মাধ্যমে শেখার সুযোগ পাওয়া।
- অনুভূতি শরীরবৃত্তীয় বুদ্ধিমত্তা প্রবল এমন শিশুদের ক্ষেত্রে শারীরিক কলাকৌশল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে শেখার সুযোগ পাওয়া।
- দৃষ্টি ও অবস্থানমূলক বুদ্ধিমত্তা প্রবল এমন শিশুদের ক্ষেত্রে ছবি, রেখাচিত্র ও রূপকল্পনা ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে শেখার সুযোগ পাওয়া।
- ছন্দ ও সংগীতমূলক বুদ্ধিমত্তা প্রবল এমন শিশুদের ক্ষেত্রে ছড়া, ছন্দ ও ধ্বনির তাল লয় ব্যবহারের মাধ্যমে শেখার সুযোগ পাওয়া।
- প্রাকৃতিক বুদ্ধিমত্তা প্রবল এমন শিশুদের ক্ষেত্রে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান প্রত্যক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শেখার সুযোগ পাওয়া।
- আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা প্রবল এমন শিশুদের ক্ষেত্রে অন্যের সঙ্গে ও দলে কাজ করে শেখার সুযোগ পাওয়া।
- অন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা প্রবল এমন শিশুদের ক্ষেত্রে একাকী চিন্তা ও কাজ করে শেখার সুযোগ পাওয়া।

শুধু যার যে ধরনের বুদ্ধিমত্তা প্রবল সে ধরনের শেখার সুযোগ পাওয়াই যথেষ্ট নয়। যেসব বুদ্ধিমত্তা কম প্রবল সে ধরনের সুযোগও শিশুদের শিখনে সহায়ক হতে পারে। তাই শিক্ষার্থীদের শিখনে বহুমুখী শিখন কৌশল ব্যবহার এবং সে অনুযায়ী শিখন পরিকল্পনা করা দরকার।

### শিক্ষার্থীদের পারগতার স্তরগত ভিন্নতা

একই ক্লাসের সকল শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি সমান নয়। কেউ খুব দ্রুত শেখে, কেউ ধীরে শেখে। ফলে শিক্ষার্থীদের মাঝে এক ধরনের ব্যবধান বা পার্থক্য থেকে যায়। উদাহরণ হিসেবে যদি দ্বিতীয় শ্রেণির বাচ্চাদের অগ্রগতি লক্ষ করেন তবে দেখবেন যে কেউ কেউ ভালোভাবে বর্ণ ও শব্দ চিনে পড়তে পারে না। কেউ কেউ পড়তে পারে তবে নিজ থেকে কিছু লিখতে পারে না। কেউ বলতে, পড়তে ও লিখতে পারে। আবার কেউ কেউ দ্বিতীয় শ্রেণিতে যেসব যোগ্যতা অর্জন করার কথা তার চেয়েও বেশি কিছু পারে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের শিখনের মাত্রা বা স্তরগত পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং একই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পারগতার স্তরগত এই ভিন্নতা নির্ণয় না করা হলে এবং সে অনুযায়ী তাদের সহায়তা করা না হলে শিক্ষার্থীদের শিখন ব্যহত হয়। তবে মনে রাখতে হবে যে, পিছিয়ে পরা শিক্ষার্থীদের সীমাবদ্ধতাগুলো জেনে তাদেরকে ভিন্ন দলে ভাগ করা যাবে না। বরং অভিন্ন পাঠ-পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের শিখনসীমাবদ্ধতাগুলো দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে।

### শিক্ষার্থীদের প্রতিবন্ধিতার কারণে সৃষ্ট ভিন্নতা

শিশুদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা তাদের শিখনের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে। শিশুদের শিখন শেখানোর ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা বাধা হিসেবে কাজ করে সেগুলো হলো দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা, শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধকতা, অটিজম ও শিখন প্রতিবন্ধকতা। নিম্নে প্রত্যেক ধরনের প্রতিবন্ধিতার লক্ষণ ও প্রয়োজনীয় চাহিদা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

- **শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা**

শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা বলতে কানে কম শোনা বা একেবারেই না শোনাকেবোঝায়। অনেক সময় শ্রবণ সমস্যাগ্রস্তদেখে বোঝা যায় না যে তার সমস্যা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তার সমস্যা থাকতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে শিশুটিও তার শ্রবণ সমস্যা সম্পর্কে ততটা সচেতন থাকে না। কারণ শ্রবণ সমস্যা না থাকলে শুনতে কেমন লাগে সে সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। ফলে এ ধরনের অসচেতনতার কারণে বিদ্যালয়ে এ ধরনের অচিহ্নিত শিক্ষার্থী থেকে যেতে পারে। এক্ষেত্রে কিছু সাধারণ লক্ষণ দেখে বোঝা যেতে পারে যে শিক্ষার্থীর শ্রবণজনিত কোন সমস্যা আছে কিনা।

– **শ্রবণ প্রতিবন্ধিতার লক্ষণ**

যেসব লক্ষণ দেখে শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা যায় তা হলো-

**মনোযোগের অভাব:** শিক্ষার্থী যদি ক্লাসে অমনোযোগী হয় তবে ধরা নেয়া যায় যে ক্লাসে যা বলা হচ্ছে তা সে শুনতে পাচ্ছে না। অথবা বিকৃতভাবে শব্দ শুনছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক কী বলছে তা শোনার জন্য শিক্ষার্থী মাথা বাড়িয়ে দিবে অথবা শোনার কোন চেষ্টাই করবে না।

**দুর্বল বাকশক্তি:** শ্রবণ সমস্যা থাকলে শিক্ষার্থীর বাকশক্তি দুর্বল হতে পারে। অথবা শিশুটি খুব উচ্চ স্বরে বা খুব মৃদু স্বরে কথা বলে।

**নির্দেশনা অনুসরণে অসমর্থ:** শিক্ষার্থী শিক্ষকের নির্দেশনা ঠিকভাবে অনুসরণে ব্যর্থ হতে পারে।

**কাছ থেকে দিলে শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা:** মৌখিক যোগাযোগের ওপর নির্ভরশীল বিষয়াদি ছাড়া যদি শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাছাকাছি এসে কিছু করার নির্দেশ দেয় বা লিখিতভাবে কোন কাজ করতে বলে এবং সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নির্দেশনা অনুযায়ী কাজটি ভালোভাবে করতে পারে। কখনো কখনো শিক্ষক কী বলছে তা শোনার জন্য শিক্ষার্থী মাথা বাড়িয়ে দিতে পারে বা ঝুঁকে পড়তে পারে।

**অভিব্যক্তি থেকে বোঝা ও যোগাযোগের চেষ্টা করা:** শ্রবণ শক্তির ঘাটতির জন্য শিক্ষার্থী তার অন্যান্য সহপাঠীরা কাজটি কীভাবে শুরু করেছে প্রথমে তা অনুসরণ করার চেষ্টা করে। অথবা কীভাবে কাজটা শুরু করতে হবে তা বোঝার জন্য শিক্ষক বা অন্যান্য সহপাঠীদের দিকে তাকিয়ে থাকে। মৌখিক ভাষা নয় বরং শিক্ষার্থী অভিব্যক্তি, শারীরিক নাড়াচাড়া প্রাসঙ্গিক জানা তথ্য থেকে সহপাঠী বা শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে এবং এতে অনেক সময় সে কোন বক্তব্য বা নির্দেশনার অর্থ ভুল বোঝে।

**উচ্চস্বরে পড়তে বলা:** কারো পঠন শুনতে অসুবিধা হতে পারে এবং আরো উচ্চস্বরে পড়ার জন্য তাকে অনুরোধ করতে পারে।

**ভুল উত্তর দেয়া বা উত্তর না দেয়া:** শিশুকে প্রশ্ন করা হলে ভুল উত্তর দেয় অথবা উত্তর দিতে পারে না।

**বিশেষ ক্ষেত্রে কাজ করতে আগ্রহী:** কানে শুনতে অসুবিধাগ্রস্ত শিশুরা ছোট গ্রুপে, নির্জন পরিবেশে ও ক্লাসের সামনের সারিতে বসে কাজ করতে আগ্রহী হয়।

**বিশেষ আচরণ:** শ্রবণশক্তি কমে যাওয়ার ফলে শিক্ষার্থী লাজুক হতে বা নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে। অথবা অবাধ্য ও একগুঁয়ে হয়ে পড়ে। কথা বলতে হয় এ ধরনের শিখন তৎপরতায় অংশ নিতে শিক্ষার্থী অনিচ্ছুক হয় এবং কোন কৌতুক বা রসিকতার সময় তা না বোঝার কারণে সবার সঙ্গে হাসে না। শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে সামাজিক তৎপরতা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে।

– **শ্রবণ প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চাহিদা**

শ্রবণ প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর দিক থেকে যে ধরনের চাহিদা তৈরি হয় তা হলো-

- শ্রবণ সহায়ক উপকরণ যেমন হিয়ারিং ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে শোনা।
- শিক্ষার্থীদের শ্রবণের বিকল্প উপায় ব্যবহার যাতে না শুনলেও তারা বিষয়বস্তু বুঝতে পারে। যেমন- ছবি বা ভিডিও প্রদর্শন। ইশারা ভাষা ব্যবহার বা আকার-ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বিষয়বস্তুবোঝানো।
- স্বল্প শ্রবণ প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কাছকাছি থেকে এবং জোরে বলা।

- **দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা**

দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বলতে চোখে দেখতে সমস্যা হওয়াকে বোঝায়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বিভিন্ন প্রকার ও মাত্রার হতে পারে। যেমন- ক্ষীণ দৃষ্টি, আংশিক দৃষ্টি, অন্ধত্ব ইত্যাদি। অনেকক্ষেত্রে ক্ষীণদৃষ্টি বা দৃষ্টিহীনতার বিভিন্ন লক্ষণ দেখে বোঝা যায়। কিন্তু এমন অনেক সমস্যা থাকতে পারে যা হয়তো কারও নজরে পড়ে না।

– **দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার লক্ষণ**

নিম্নরূপ সতর্কতামূলক লক্ষণ দেখে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা বোঝা যেতে পারে-

**চোখ ঢেকে রাখা ও ঝুঁকে দেখার চেষ্টা:**যে চোখে সমস্যা শিক্ষার্থী কোন কিছু দেখার সময় সে চোখ ঢেকে রাখবে বা বন্ধ করে রাখবে। অথবা কোন কিছু দেখার জন্য অস্বাভাবিকভাবে সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে দিবে।

**মুখের অস্বাভাবিক অভিব্যক্তি:** শিক্ষার্থী কোন কিছু পড়ার সময় বা চোখের কোন কাজ করতে গিয়ে ট্যারা চোখে তাকাবে, চোখ পিট পিট করবে, ভ্রু কুঁচকিয়ে রাখবে অথবা কুঁচকানো মুখভঙ্গি করবে।

**ছোট জিনিস খুঁজতে অসুবিধা হওয়া:** ক্ষীণ দৃষ্টির কারণে ছোট কোন জিনিস চিহ্নিত করতে বা খুঁজে নিতে অসুবিধা হবে।

**আলোর প্রতি সংবেদনশীল:** শিক্ষার্থী উজ্জ্বল আলোর প্রতি অসহনশীল হতে পারে এবং আলোর দিকে তাকাতে সমস্যা হতে পারে। আলো দেখলে শিক্ষার্থী চোখ বন্ধ করে ফেলবে অথবা ট্যারা চোখে তাকাবে। এমনকি মৃদু আলোয় সে কিছু দেখতে সমস্যায় পড়তে পারে বা অন্ধকারে কোন কিছুই দেখতে পারে না।

**পাঠে সমস্যা:** কোন কিছু পড়তে গিয়ে শিক্ষার্থী কিছু অংশ বাদ দিয়ে পড়তে পারে বা চোখের খুব কাছে নিয়ে এসে বই পড়তে পারে বা কোন জিনিস কাছে এনে কাজ করতে পারে। তবে তারা যেকোনো মৌখিক যোগাযোগ বা নির্দেশনায় খুব ভালো কাজ করতে পারে।

**লিখতে সমস্যা:**শিক্ষার্থীর লিখন সমস্যা হতে পারে। অর্থাৎ লিখতে গিয়ে লেখার খাতার লাইনের বাইরে চলে যেতে পারে, আঁকাবাঁকা হতে পারে বা তার হাতের লেখা বুঝতে পারা কঠিন হতে পারে।

**খেলাধুলা বা কাজকর্ম এড়িয়ে চলা:**দূরের দৃষ্টিক্ষীণতায় শিক্ষার্থী মাঠের খেলাধুলা বা অঙ্গ সঞ্চালনমূলক কাজকর্ম এড়িয়ে চলতে পারে।

– **দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চাহিদা**

দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রে শিখন শেখানো কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর দিক থেকে নিম্নোক্ত ধরনের চাহিদা অনুভূত হয়-

- যেহেতু দেখতে পায় না তাই দেখার বিকল্প উপায়ে শিক্ষার্থীর সাথে যোগাযোগ করা। যেমন- মৌখিক যোগাযোগ ও বিষয়বস্তু মুখে বর্ণনা করা ও শোনানো।
- স্বল্প দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর কাছাকাছি থেকে দেখার সুযোগ পাওয়া।
- বিষয়বস্তু পরবর্তীতেও শোনা/স্মরণ করার সুযোগ/ যেমন- অডিও রেকর্ড বা লিখিত বর্ণনা যা অন্যরা পড়ে শোনাতে পারে।
- লেখার ক্ষেত্রে সহপাঠী বা অন্য শ্রুতি লেখকের সহায়তা নেয়া।
- প্রয়োজনে ব্রেইল পদ্ধতির সহায়তা নেয়া।

- **শারীরিক প্রতিবন্ধিতা**

শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে পারে শিক্ষার্থীরা। এ ধরনের প্রতিবন্ধিতা হতে পারে যে হাত দিয়ে ঠিকভাবে কিছু ধরতে না পারা, ঠিকভাবে বসতে না পারা, ঠিকভাবে হাটতে না পারা, নিজের পরিচর্যা করতে না পারা ইত্যাদি। এ ধরনের প্রতিবন্ধিতার কারণে ঐ শিক্ষার্থীদের শিখন শেখানো কার্যক্রমে অংশগ্রহণে সমস্যা হয়। তবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেলে তারা অংশগ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে কিছু লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে তাদের চিহ্নিত করা ও পরবর্তী সহায়তা প্রদান করা যায়।

– **শারীরিক প্রতিবন্ধিতার লক্ষণ**

নিম্নোক্ত লক্ষণ দেখে শিশুর শারীরিক প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা যেতে পারে-

**অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহারে অসুবিধা হওয়া:**শিশুর শরীরের কোন একটি অঙ্গ বা শরীরের বিশেষ অংশ নাড়াচাড়া বা ব্যবহার করতে অসুবিধা হওয়া। কখনো কখনো শিশু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে বা হাত নাড়তে অসুবিধা হয়। অথবা শিশু হাঁটার সময় ঝাঁকুনি দিয়ে হাঁটা।

**কাটা বা ক্ষত থাকা:**শিশুর শরীরের কোন অংশ কাটা বা ক্ষতযুক্ত থাকা।

**ওঠা-বসা ও শারীরিক সমন্বয়ে সমস্যা:**শিশু বসতে, উঠতে বা সোজা হয়ে দাঁড়াতে কোন অসুবিধা হওয়া। একটি সোজা মোটা দাঁগের ওপর দিয়েহাঁটতে দিলে শিশুটি ভারসাম্যপূর্ণভাবে হাঁটতে না পারা বা তার শারীরিক সমন্বয়হীনতা থাকা।

**কাঁপুনি হওয়া:** শিশুর শরীরে বিভিন্ন সময় কাঁপুনি হওয়া।

**কাজ করতে অসুবিধা হওয়া:**দৈনন্দিন নিজের পরিচর্যা করতে (যেমন- গোসল করতে, কাপড় পরতে, পরিষ্কার হতে) শিশুর কোন অসুবিধা হওয়া। দেড়/দুই কেজি পানিভর্তি একটি জগ চোখ বরাবর ওঠাতে শিশুর কষ্ট হওয়া।

– **শারীরিক প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর চাহিদা**

শারীরিক প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রে শিখন শেখানো কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর দিক থেকে নিম্নোক্ত ধরনের চাহিদা অনুভূত হয়-

- হাঁটাচলার ক্ষেত্রে শিক্ষক বা সহপাঠীদের সহায়তা পাওয়া।
- শ্রেণিকক্ষে বসার জন্য উপযুক্ত আসনব্যবস্থা।
- বিদ্যালয়ে হুইলচেয়ার থাকা এবং বিদ্যালয়ে উঁচু-নিচু জায়গায় ওঠানামার জন্য র‍্যাম্প থাকা।
- হুইলচেয়ার যাওয়া আসার জন্য বিদ্যালয়ের করিডোর এবং শ্রেণিকক্ষের বেঞ্চ বা চেয়ারের সারির মধ্যে পর্যাপ্ত জায়গা থাকা। দরজাতেও যথেষ্ট জায়গা থাকা।
- বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষের মেঝে বেশি পিচ্ছিল না হয়ে খসখসে হওয়া, যা শিক্ষার্থীর চলাফেরার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।
- শ্রেণিকক্ষের বোর্ড ও অন্যান্য উপকরণ এমন উচ্চতায় ও অবস্থায় থাকা যেন তা শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ব্যবহার উপযোগী হয়।
- টয়লেট এমন উচ্চতা ও অবস্থায় থাকা যেন তা শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যবহার উপযোগী হয়।

- **বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা**

এ ধরনের প্রতিবন্ধিতা শিশুর সব ধরনের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। এর ফলে শিশুর বুদ্ধি, ভাষাজ্ঞান, নিজের প্রতি খেয়াল এবং শিক্ষাবিষয়ক দক্ষতা অর্জন ও উন্নয়ন ধীর গতিতে হয়। এশিশুরা মানসিকভাবে অসুস্থ নয়। 'মানসিক অসুস্থতা' পরিভাষাটি তখনই ব্যবহৃত হয় যখন কোনো ব্যক্তি অসুস্থতায় ভোগে যার ফলে আচার-আচরণ, আবেগ, ব্যবহার অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। যথার্থ চিকিৎসা হলে এ ধরনের অসুস্থতা ভালো হয়ে যায়। সাধারণত শিশুরা বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা জন্মেগতভাবে নিয়ে আসে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে শিশু স্কুলে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের অসুবিধা চিহ্নিত হয় না। যদিও খুব ছোটবেলা থেকেই বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার বেশ কিছু লক্ষণ তাদের মধ্যে প্রকাশ পায়। কোনো কোনো শিশুর খুব গুরুতর ধরনের প্রতিবন্ধিতা থাকে এবং সেই সাথে যোগ হয় মৃগীরোগ, দৃষ্টি ও শ্রবণ সমস্যা। এদেরকে সাধারণত গুরুতর বা বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত শিশু বলা হয়। অবশ্য বহু শিশু মৃদু বা মধ্যম মাত্রার প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়। এদের প্রতিবন্ধিতার পেছনে অনেক সময় কোন শারীরিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

– **বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার লক্ষণ**

বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার লক্ষণকে ছয়টি ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে। যদি কোন শিশুর মাঝে এই লক্ষণগুলো দেখা যায় তবে মনে করা হয় যে শিশুটি বুদ্ধির দিক থেকে পিছিয়ে আছে। শিশুর পড়া ও লেখা এবং অঙ্ক কষার দক্ষতা অর্জনে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে।

তবে বয়স এখানে একটি মূখ্য বিষয়। সঠিক মাপকাঠি হলো বয়স, শিশুটি তার বয়সোপযোগী প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে কিনা তা দেখতে হবে। কিন্তু এই মাপকাঠি সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। কারণ শিশু থেকে শিশুর বিকাশে অনেক পার্থক্য রয়েছে। অনেক শিশু স্বাভাবিক বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও ধীর গতিতে বেড়ে ওঠে। বঞ্চনার কারণে শিশুরা ধীর গতিতে বেড়ে উঠতে পারে। বহু ভাষাভাষী সমাজে বাস করেও শিশুর ভাষা দক্ষতা অর্জন বিঘ্নিত হতে পারে। কেননা এ ধরনের সমাজে শিশুকে একই সঙ্গে অনেক ভাষা শিখতে হয়।

- **কথা বলা**
  - আঠারো মাস বয়সের শিশু 'মা' বা এ ধরনের কোন শব্দ উচ্চারণ করতে না পারা।
  - শিশুর দুই বছর বয়সের মধ্যে পরিচিত কোন বস্তু বা মানুষের নাম না বলতে পারা।
  - তিন বছর বয়সের মধ্যে ছোট কোনো গান বা ছড়া আবৃত্তি করতে না পারা।
  - চার বছর বয়সের মধ্যে ছোট ছোট বাক্য বলতে না পারা।
  - পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে পরিবারের বাইরের লোককে তা বুঝতে না পারা।
  - সমবয়সী অন্য শিশুদের থেকে অন্যভাবে কথা বলা।
- **ভাষা বোঝা**
  - এক বছর বয়সের মধ্যে তার নাম ধরে কেউ ডাকলে তাতে সাড়া না দেওয়া।
  - তিন বছর বয়সের মধ্যে তার মুখের বিভিন্ন অংশের নাম বলতে না পারা।
  - তিন বছর বয়সের মধ্যে ছোট কোন গল্প শুনে তা বুঝতে না পারা।
  - চার বছর বয়সের মধ্যে সহজ কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারা।
  - পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে শ্রেণিকক্ষের নির্দেশাবলি অনুসরণ করতে না পারা।
  - সমবয়সী অন্যান্য শিশুদের তুলনায় আপনি কী বলছেন তা বুঝতে অসুবিধা হওয়া।
- **খেলাধুলা**
  - এক বছর বয়সের মধ্যে হাত পা নাড়াচাড়া করে খেলার আনন্দ উপভোগ না করা।
  - দুই বছর বয়সের মধ্যে ছোটখাট জিনিস যেমন- চা চামচ বা পট নিয়ে খেলা না করা।
  - চার বছর বয়সের মধ্যে অন্য শিশুদের সঙ্গে বিভিন্ন খেলায় যোগ না দেওয়া। যেমন কোন জিনিস ছুঁড়ে দিলে তা ধরা বা লুকোচুরি ইত্যাদি খেলা।
  - একই বয়সের অন্যান্য শিশুদের মত খেলাধুলা না করা।
- **আচরণ**
  - দশমাস বয়সের মধ্যে কারো সাহায্য ছাড়া বসতে না পারা।
  - দুই বছর বয়সের মধ্যে হাঁটতে না পারা।
  - চার বছর বয়সের মধ্যে স্বল্প সময়ের জন্য এক পায়ে ভর দিতে না পারা।
  - পেশী সঞ্চালনের সমন্বয় দুর্বল হওয়া। সমবয়সী অন্যান্য শিশুদের মত চলাফেরা করতে না পারা।

- কোন বিষয়ে শিশুর মনোযোগ স্বল্প সময় থাকা।
- শিশু খুব আগ্রাসী ও অতিমাত্রায় চঞ্চল হওয়া।
- শিশু আগ্রহহীন ও উদাসীন হলে।

○ **পড়া-লেখা**

- পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে বা স্কুলে এক বছর কাটানোর পরও শিশুর বিভিন্ন আকৃতি যেমন বৃত্ত বা চতুর্ভুজ দেখে আঁকতে কষ্ট হয়।
- জিগ-স ও ফর্ম বোর্ড তৈরি করতে অসুবিধা হয়।
- কিছু ইংরেজি সংখ্যা যেমন ৩, ৬ এবং ৯ এর মধ্যে পার্থক্য ধরতে না পারা।
- বর্ণ ও শব্দসমূহ ধারাবাহিকভাবে সাজাতে পারে না।

– **বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর চাহিদা**

বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রে শিখন শেখানো কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর দিক থেকে নিম্নোক্ত ধরনের চাহিদা অনুভূত হয়-

○ পড়ালেখা দেওয়া নেওয়ার জন্য বেশি চাপ না দেওয়া।
○ সহজ ভাষায় শিক্ষকের নির্দেশনা পাওয়া।
○ মৌখিক নির্দেশনার পরিবর্তে কী করতে হবে সে সম্পর্কে হাতে-কলমে করে দেখানোর মাধ্যমে নির্দেশনা পাওয়া।
○ বিমূর্ত বিষয় নয়, বরং বাস্তব সমস্যাভিত্তিক কাজের মাধ্যমে শেখার সুযোগ পাওয়া। এক্ষেত্রে শেখার সুযোগের কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে হবে।
○ বড় কাজ নয়, বরং ছোট ছোট ধাপে কাজ করার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে একটি বড় কাজ সম্পন্ন করার বা শেখার সুযোগ পাওয়া।
○ কাজে সফলতার ক্ষেত্রে প্রশংসা পাওয়া।
○ বেশি বেশি অনুশীলনের সুযোগ পাওয়া।
○ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা পাওয়া।

- **শিখন প্রতিবন্ধিতা**

শিখন প্রতিবিন্ধতার ক্ষেত্রে শিশুর সবকিছু স্বাভাবিক থাকা সত্ত্বেও শিখতে সমস্যা হয়। দেখা যায় শিক্ষার্থী একই শব্দ বারবার পড়ে বা লিখে, শব্দ বা প্রতীক উলটা করে লিখে, প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না ইত্যাদি নানা ধরনের সমস্যা হয় যা তার শেখার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে। অনেকের কাছে মনে হতে পারে এটা শিক্ষার্থীর অমনোযোগিতা বা ইচ্ছাকৃত ভুল। কিন্তু আদতে তা নয়। শিক্ষার্থী অনিচ্ছাকৃতভাবে এবং অবচেতনেই এ ধরনের ভুল করে।

– **শিখন প্রতিবন্ধিতার লক্ষণ**

নিম্নোক্ত লক্ষণ দেখে শিশুর শিখন প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা যেতে পারে-

**শব্দ বাদ দিয়ে, যুক্ত করে বা বারবার পড়া:** পড়ার সময়ে শিশু কোন শব্দ বা অংশ বাদ দিয়ে বা যোগ করে পড়ে। অথবা একই শব্দ বারবার পড়ে বা বিকল্প শব্দ ব্যবহার করে পড়ে।

**সমবয়সীদের তুলনায় অনগ্রসর:**দুরন্তপনা বা অতি চঞ্চলতার কারণে শিশুর তার সমবয়সীদের মত কাজ করতে না পারা। যেমন-সহপাঠীদের মত শিশুর সংখ্যা গণনা করতে না পারা বা শিশুর লেখা বিসদৃশ, অপটু বা ধীরগতি হওয়া।

**অপ্রাসঙ্গিক কাজে মনোযোগ:**বাসা বা বিদ্যালয়ে সহজে অপ্রাসঙ্গিক কাজে মনোযোগী হয়ে পড়া।

**শব্দ বা সংখ্যা উলটা করে পড়া বা লেখা:**পড়া বা লেখায় কোন অক্ষর, প্রতীকের বা সংখ্যাকে বিপরীতমুখী বা ঘুরিয়ে ব্যবহার করা (যেমন- b কে d, saw কে was, 6 কে 9, ১৩ কে ৩১ ইত্যাদি)।

**লিখতে অসুবিধা হওয়া:**বারবার নির্দেশনা দেয়া সত্ত্বেও লেখার সময় শিশু বানান ভুল করে। দৃষ্টিসম্পন্ন হয়েও শিশুর বই বা ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা সঠিকভাবে লিখতে অসুবিধা হয়। আবার দুই বর্ণ বা শব্দের মধ্যের ব্যবধান (খুব কাছে বা দূরে) লেখার সময়ে শিশুর অসংলগ্নতা থাকা।

**পড়তে ও তা বুঝতে সমস্যা হওয়া:** পড়ার সময় শিশু ভুল করে। আবার পঠিত বিষয় বলার সময় শিশুর অসুবিধা হয় এবং পড়া বুঝতে পেরেছে মনে হলেও প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না।

**শব্দ বা বাক্য বুঝতে সমস্যা হওয়া:**মুখে বলা বাক্য, প্রশ্ন, নির্দেশনা বুঝতে শিশুর ভুল হয়। এছাড়াদ্রুত বলা বাক্য শিশুর বুঝতে অসুবিধা হয় এবংউচ্চারিত শব্দের মধ্যে পার্থক্য করতে শিশুর অসুবিধা হয়।

**কথা বলতে সমস্যা হওয়া:**কথা বলার সময় ঠিক শব্দ বেছে নিতে শিশুর অনেক সময় লাগা। ছোট বা অসম্পূর্ণ বা অসংগঠিত বাক্য শিশু ব্যবহার করে।

– **শিখন প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর চাহিদা**

শিখন প্রতিবন্ধিতার ক্ষেত্রে শিখন শেখানো কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর দিক থেকে নিম্নোক্ত ধরনের চাহিদা অনুভূত হয়-

- পড়ালেখা দেওয়া-নেওয়ার জন্য বেশি চাপ না দেওয়া।
- পাঠের অধিক বোঝার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি।
- সহজ ভাষায় শিক্ষকের নির্দেশনা পাওয়া।
- মৌখিক নির্দেশনার পরিবর্তে কী করতে হবে সে সম্পর্কে হাতে-কলমে করে দেখানোর মাধ্যমে নির্দেশনা পাওয়া।
- বিমূর্ত বিষয় নয়, বরং বাস্তব সমস্যাভিত্তিক কাজের মাধ্যমে শেখার সুযোগ পাওয়া। এক্ষেত্রে শেখার সুযোগের কাজটি হাতে-কলমে করার মাধ্যমে হবে।
- বড় কাজ নয়, বরং ছোট ছোট ধাপে কাজ করার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে একটি বড় কাজ সম্পন্ন করার বা শেখার সুযোগ পাওয়া।
- মৌখিক নির্দেশনার পাশাপশি খুব সহজ ছবি ও শিক্ষা উপকরণের সাহায্যে নির্দেশনা পাওয়া।
- পড়া ও লেখার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও সহপাঠীদের সহায়তা পাওয়া।
- কাজের সফলতার ক্ষেত্রে প্রশংসা পাওয়া।
- বেশি বেশি এবং ঘন ঘন অনুশীলনের সুযোগ পাওয়া। একই বিষয়ের একাধিকবার অনুশীলন।
- কজের জন্য অন্যদের তুলনায় অধিক সময় পাওয়া।
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা পাওয়া।

- **অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু**

অটিজম অন্য এক ধরনের প্রতিবন্ধিতা। অটিজমে সমস্যাগ্রস্ত শিশুকে বলা হয় অটিস্টিক শিশু। এ ধরনের সমস্যার সঠিক কারণ যেমন চিহ্নিত নয়, তেমনি এর সুনির্দিষ্ট চিকিৎসাও এখনো গড়ে ওঠেনি। এ ধরনের সমস্যাগ্রস্ত শিশুর যোগাযোগ ক্ষমতার বিকাশ ব্যহত হয়। শিশু অন্যদের সামনে সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং নিজের তৈরি একটি জগতে বাস করে। কারো কারো ক্ষেত্রে এটি অতিমাত্রায় দেখা যায়, আবার কাউকে বেশ স্বাভাবিক মনে হয়।

– **অটিজম-এর লক্ষণ**

নিম্নোক্ত লক্ষণ দেখেঅটিস্টিক শিশু চিহ্নিত করা যেতে পারে-

**যোগাযোগে পিছিয়ে পড়াঃ**সমবয়সীদের তুলনায় শিশুর যোগাযোগে পিছিয়ে পড়া। যেমন- অসম্পূর্ণ বা অসংগঠিত বাক্য বলা বা শিশু চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে কথা বলে না বা আধখোলা চোখে কথা বলে।

**তাকাতে বা দেখাতে সমস্যা হওয়াঃ** শিশু কারও সাথে কথা বলার সময় সরাসরি চোখের দিকে না তাকিয়ে নিচের দিকে বা অন্য দিকে তাকিয়ে কথা বলে। একইভাবে শিশু আঙ্গুল দিয়ে কিছু দেখাতে পারে না।

**খেলাধুলায় সমস্যা হওয়াঃ**শিশু খেলনা দিয়ে সবসময় ঠিকভাবে খেলে নাএবংঅন্য শিশুদের সাথে খেলতে অনীহা প্রকাশ করে।

**পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ করাঃ**শিশু একই ধরনের আচরণ বা অঙ্গভঙ্গি বারবার করে। কোন কোন শব্দের প্রতি শিশু অধিক সংবেদনশীল। অর্থহীন কথা বলে বা এসব কথার প্রতিধ্বনি করে।

**শ্রেণিকার্যে অমনোযোগিতাঃ**শিশু অতিচঞ্চল বা ক্লাসে অমনোযোগী থাকে। ক্লাসের নিয়ম মেনে চলে না বা নিয়ম মেনে চলতে পারে না। দলগত কার্যক্রম যেমন- ছড়া, গান বা খেলাধুলায় অংশগ্রহণে শিশু অনীহা প্রকাশ করে।

**আচরণে সমস্যা থাকাঃ** শিশুর আচরণে সমস্যা থাকাবা আচরণের অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকাশ। যেমন- বারবার যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, খামচি দেওয়া, কাউকে আঘাত করা, অন্যের জিনিস নেওয়া ইত্যাদি।

**বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিভাবান হওয়াঃ**শিশু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অতি প্রতিভাবান। যেমন- মুখস্থ করা, ছবি দেখে মনে রাখতে পারা, ছবি আঁকা, কম্পিউটার দক্ষতা ইত্যাদি।

– **অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষার্থীর চাহিদা**

অটিজমের ক্ষেত্রে শিখন শেখানো কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর দিক থেকে নিম্নোক্ত ধরনের চাহিদা অনুভূত হয়-

- ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শেখার সুযোগ পাওয়া।
- ভালো ও সঠিক আচরণের জন্য প্রশংসা পাওয়া।
- অর্জন উপযোগী দক্ষতাসমূহকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে শেখার সুযোগ পাওয়া।
- দক্ষতার প্রতিটি অংশ পরিপূর্ণভাবে আয়ত্তে না আসা পর্যন্ত বারবার চর্চার সুযোগ পাওয়া।
- প্রয়োজনে প্রোম্প্ট করে দেওয়া।

- সহজ এবং পছন্দের ছবি বা শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে নির্দেশনা পাওয়ার ও বোঝার সুযোগ পাওয়া।
- শিক্ষক ও সহপাঠীদের কাছ থেকে পড়া-লেখা ও কাজের ক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়া।
- হাতে-কলমে কাজ করে শেখার সুযোগ পাওয়া।

- **শিক্ষার্থীদের আচরণগত ভিন্নতা**

শ্রেণি ব্যবস্থাপনা পাঠে আমরা শিক্ষার্থীদের আচরণগত ভিন্নতার কথা আলোচনা করেছিলাম। বলা হয়েছিল যে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আচরণ দুই ধরনের সহযোগিতামূলক আচরণ ও অসহযোগিতামূলক আচরণ। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের কাজে যেকোন ধরনের অসহযোগিতামূলক আচরণই সমস্যামূলক আচরণ। শ্রেণিকক্ষে কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা তাদের আচরণের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানোর কাজে সমস্যা তৈরি করে। সমস্যামূলক আচরণ যারা করে তাদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। না হলে তা শ্রেণি ব্যবস্থাপনা এবং ফলশ্রুতিতে শিখন শেখানো কার্যক্রম ব্যহত হয়।

- **শিক্ষার্থীদের জেন্ডার ভিন্নতা**

শিক্ষার্থীদের জেন্ডার ভিন্নতার কারণে বিদ্যালয়ে তাদের অংশগ্রহণ ও শিখনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা হয়। যেমন মেয়েদের প্রতি শিক্ষক বা সহপাঠীছেলেদের কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের গালিগালাজ ও অশালীন মন্তব্য, অশালীন আকার-ইঙ্গিত ও যৌন নিপীড়ন ইত্যাদি বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ ও শিখন শেখানোর কাজে অংশগ্রহণে বাধা তৈরি করে। একইভাবে শ্রেণিকক্ষেও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের অধিক অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া ও পক্ষপাত করার ফলে মেয়েরা শিখন শেখানো কার্যক্রমে অংশগ্রহণে পিছিয়ে পড়ে। একইভাবে স্বাস্থ্যসম্মত এবং আলাদা টয়লেট ব্যবস্থা, বিশ্রাম বা অবসর কাটানোর জন্য আলাদা কমনরুমের ব্যবস্থা না থাকলেও তা শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে শিখনে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। তাই শিক্ষার্থীদের জেন্ডার ভিন্নতা বিবেচনা করে তাদের জন্য সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

– **শিক্ষার্থীর চাহিদা**

জেন্ডার ভিন্নতা থেকে বিদ্যালয়ে বা শ্রেণিকক্ষে যেসব সমস্যা তৈরি হয় তার বিপরীতে শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত চাহিদা থাকে-

- বিদ্যালয়ে ও শ্রেণিকক্ষে জেন্ডার বৈষম্যহীন ও জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবেশ থাকা।
- শ্রেণিকক্ষে ও শ্রেণিকক্ষের বাইরের বিভিন্ন কাজে ছেলে-মেয়ে সমান অধিকার ও সমান সুযোগ থাকা।
- ছেলে ও মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবস্থা থাকা এবং বিশ্রাম বা অবসর সময়ের জন্য কমনরুম বা আলদা ব্যবস্থা থাকা।
- বিদ্যালয়ে এবং এর বাইরে যৌন নিপীড়ন এবং অশালীন ইঙ্গিতমূলক আচরণমুক্ত পরিবেশ থাকা।

- **শিক্ষার্থীদের ভাষাগত ভিন্নতা**

শিক্ষার্থীদের ভাষাগত ভিন্নতা শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিখনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। বিদ্যালয়ের শিখন শেখানোর কাজে ব্যবহৃত ভাষা যদি শিক্ষার্থীদের

মাতৃভাষা থেকে ভিন্ন হয় তবে এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। আমাদের দেশে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী যেমন- চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ইত্যাদি নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়।

– **শিক্ষার্থীর চাহিদা**

শিশুদের ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে তাদের চাহিদা হলো বিদ্যালয়ে শিখন শেখানো কাজে মাতৃভাষার ব্যবহার। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। পরিবারে এবং দৈনন্দিন কার্যক্রমের সর্বত্র মাতৃভাষা ব্যবহারের ফলে শিখন শেখানো কার্যক্রম মাতৃভাষায় পরিচালনা করা না হলে ছোট শিক্ষার্থীরা তা বুঝতে পারে না। তবে আমাদের মত দেশে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের শিখন শেখানোর ক্ষেত্রে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (Mother tongue based Multilingual Education) একটি কৌশল হতে পারে। যেখানে মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে শিশুদের শিক্ষা শুরু হয় এবং পরবর্তী কালে ক্রমে তারা অন্যান্য ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে। তবে কৌশল যাই হোক না কেন শিশু প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমেই তার শিক্ষা পাওয়ার অধিকার রাখে এবং যতদিন সে অন্য ভাষায় দক্ষতা অর্জন না করবে ততদিন তাকে মাতৃভাষাতেই শিক্ষা দিতে হবে।

- **শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতি, রীতিনীতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থাগত ভিন্নতা**

শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতিগত ভিন্নতা, রীতিনীতি ও আচার-আচরণগত ভিন্নতার কারণে তাদের মধ্যে বৈষম্য তৈরি হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থাগত বৈষম্য ও সামাজিক মর্যাদাগত ভিন্নতা ইত্যাদিও শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক বৈষম্য তৈরি করে, যা শিক্ষার্থীদের শিখন শেখানোর কাজে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেন শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতিগত বা আর্থ-সামাজিক অবস্থাগত ভিন্নতাসত্ত্বেও শ্রেণিকক্ষে কোন ধরনের বৈষম্য তৈরি করা না হয়।

– **শিক্ষার্থীর চাহিদা**

আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ভিন্নতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের চাহিদা হলো কোন ধরনের বৈষম্য না করে সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখা ও সমান সুযোগ প্রদান করা। কাউকে কোন ধরনের হেয় না করা বা কারো প্রতি কোন ধরনের পক্ষপাতমূলক আচরণ না করা। এছাড়া আর্থ-সামাজিক কারণে কোন শিক্ষার্থী যদি পিছিয়ে পড়ে যেমন- বাসায় পড়া দেখিয়ে দেয়ার কেউ নেই এরূপ ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় কিছুটা বাড়তি সহায়তা পাওয়াও তার চাহিদার মধ্যে পড়ে। শিক্ষক ক্লাসের সময় বা ক্লাসের সময়ের আগে পরে শিক্ষার্থীদের এ ধরনের বাড়তি সহায়তা দিতে পারেন।

## শ্রেণিকক্ষেযোগাযোগ

আমরা প্রতিক্ষণ একে অপরের সাথে যোগাযোগ করি। যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা আমদের চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি অন্যদের সাথে বিনিময় করি। প্রাত্যহিক জীবনের বাইরে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও যোগাযোগ কৌশল একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগকারীর ভূমিকায় থাকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। ফলে শ্রেণিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগাযোগ ঠিকভাবে সম্পন্ন হলে দুর্বল কৌশলও সফল হয় আবার যোগাযোগ ঠিকমত না হলে উপযোগী কৌশলও ব্যর্থ হতে পারে। যোগাযোগ কৌশলের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয় হচ্ছে প্রশ্নকরণ। প্রশ্নের ধরন ও উপস্থাপন কৌশলের ওপর নির্ভর করে এর প্রতিক্রিয়া কেমন হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দুটিকে নিয়ে চলতি অধিবেশন

সাজানো হয়েছে, যেখানে শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ, এর উদ্দেশ্য, ধরন, কৌশল, বাধাসমূহ, কার্যকর যোগাযোগের জন্য করণীয়, প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য, প্রশ্নের ধরন, প্রশ্নকরণ কৌশল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হবে।

### যোগাযোগ কী?

যোগাযোগ একটি প্রক্রিয়া  যার মাধ্যমে আমরা একে অন্যের সাথে আমাদের অনুভূতি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও তথ্য ভাগাভাগি করি। আমাদের অনুভূতি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও তথ্য একে অন্যের সাথে কেবল বিনিময় ঘটলেই যোগাযোগ ঘটে না। একটি উদাহরণ কল্পনা করা যাক, আপনার সহকর্মী আপনাকে দূর থেকে ডাক দিয়ে বললো যে, আগামীকাল বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আপনি মনে করলেন সহকর্মী আপনাকে সালাম দিয়েছে; আপনি মাথা নেড়ে সালামের উত্তর দিলেন। সহকর্মী আপনার মাথা নাড়ানো দেখে বুঝলেন যে আপনি খবরটি বুঝতে পেরেছেন। এখানে কি যোগাযোগ হলো? আসলে এখানে যোগাযোগ হয়নি। যোগাযোগ তখনই ঘটে যখন একজনেরদেওয়া তথ্য অন্যজন বুঝতে পারে এবং সেই অনুযায়ী সে জবাব দিতে পারে।

### যোগাযোগ কীভাবে ঘটে?

যোগাযোগের জন্য অন্তত দুটি পক্ষ দরকার হয়। আমরা সাধারণভাবে মনে করি ভাষার (বলা ও লেখা) মাধ্যমেই যোগাযোগ ঘটে। আসলে আমরা যেমন টেক্সট বা শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করে যোগাযোগ করি তেমনি প্রতীক, চিহ্ন ও অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করেও যোগাযোগ করি। নিচের উদাহরণগুলো বিবেচনা করি:

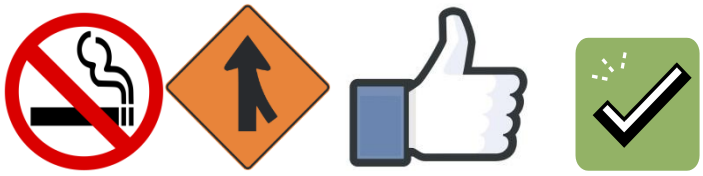

চিত্র ২.১: যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন সংকেত

উপরের প্রতীকগুলো দিয়ে কি যোগাযোগ সম্ভব? আপনি হঠাৎ দেখলেন ট্রেন লাইন বিযুক্ত অথচ একটি ট্রেন আসছে। আপনি কী করবেন? চিৎকার করে ট্রেন থামাবেন না লাল কাপড় উড়িয়ে থামতে বলবেন? নিশ্চয়ই লাল কাপড় উড়িয়ে থামানোর চেষ্টা করবেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যোগাযোগের অনেক ধরনের উপায় রয়েছে। এসব উপায় আমরা শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করি।

### শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ কৌশল

শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ বলতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সকল ধরনের যোগাযোগকে বোঝায়। শিক্ষকের উপস্থাপনা, শিক্ষার্থীর প্রতি তার নির্দেশনা, শিক্ষকের প্রশ্ন-শিক্ষার্থীর উত্তর, শিক্ষার্থীর প্রশ্ন-শিক্ষকের উত্তর, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আলোচনা, শিক্ষার্থীদের দলগত আলোচনা, বোর্ডে ও পোস্টারে লেখা, আঁকা ও নির্দেশনা এগুলো সবই শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগের মধ্যে পড়ে।

শিক্ষক যখন শিখন-শেখানো কার্যক্রমের পদ্ধতি নির্ধারণ করেন তখন সচেতন বা অবচেতনভাবে তিনি পদ্ধতিটি কার্যকর করার জন্য যোগাযোগ কৌশলও ঠিক করেন। পরিবর্তিত অবস্থা, নিত্য-নতুন জ্ঞান, আচার-আচরণ ইত্যাদির সাথে সঙ্গতি রাখার জন্য নানা ধরনের কৌশল প্রয়োজন হয়; যা শ্রেণিকক্ষের যোগাযোগকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এই কৌশলসমূহ হতে পারে-

১. **দৃষ্টিনির্ভর যোগাযোগ কৌশলঃ** যেখানে শিখনশেখানোর কৌশল হিসেবে দৃষ্টিশক্তিকে ব্যবহার করা হয়, যেমন- বিভিন্ন প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার, ছবি, মডেল ইত্যাদি ব্যবহার করে যোগাযোগ করা হয়।

২. **কথন-শ্রবণ নির্ভর যোগাযোগ কৌশলঃ** মূলত পরস্পরের আলোচনা, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ইত্যাদি বিনিময় ও শোনার মাধ্যমে এ ধরনের যোগাযোগ ঘটে।

৩. **পঠন-লিখন নির্ভর যোগাযোগ কৌশলঃ** কোন নির্দেশনা লেখা বা পাঠের মাধ্যমে এ ধরনের যোগাযোগ ঘটে। বোর্ড, খাতা বা বইয়ে লিখে এবং তা পাঠের মাধ্যমে এ ধরনের যোগাযোগ সংঘটিত হয়।

৪. **অনুভূতি-স্পর্শনির্ভর যোগাযোগ কৌশলঃ** কোন কিছুর প্রতিকৃতি তৈরি করা, হাতের কাজ করা, কিংবা হাতে-কলমে কোন কিছু করা এই ধরনের কৌশলের অন্তর্ভুক্ত।

উপরিউক্ত ৪ ধরনের যোগাযোগ কৌশলসহ এর বাইরে যোগাযোগের অন্য যেসব উপায় আছে তার ভিত্তিতে শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ কৌশল প্রধানত ২ ধরনের- ক) বাচনিক যোগাযোগ ও খ) অবাচনিক যোগাযোগ কৌশল।

### ক) শ্রেণিকক্ষে বাচনিক যোগাযোগ কৌশল

যেখানে মৌখিকভাবে বা ভাষা ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ করা হয় তাকে বাচনিক যোগাযোগ বলা হয়। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্ন করা, বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা দেয়া, প্রশংসা করা সবই বাচনিক যোগাযোগের উদাহরণ। শ্রেণিকক্ষের অধিকাংশ যোগাযোগই ঘটে বাচনিক দক্ষতার প্রয়োগ করে। বিভিন্ন ধরনের শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল, যেমন- বক্তৃতা পদ্ধতি, আলোচনা পদ্ধতি, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ইত্যাদি ঘটে বাচনিক যোগাযোগ কৌশল ব্যবহার করে। উল্লিখিত পদ্ধতি ও কৌশলসমূহ এ অধ্যায়ের পরবর্তী অধিবেশনসমূহে আলোচিত হয়েছে বিধায় এখানে আমরা তা আলোচনা করছি না।

### খ) শ্রেণিকক্ষে অবাচনিক যোগাযোগ কৌশল

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক মুখে কী বলছেন শুধু তাই গুরুত্বপূর্ণ নয়, কীভাবে তা উপস্থাপন করা হচ্ছে সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। মূলত মৌখিক যোগাযোগ বাদে আকার-ইঙ্গিত, মুখভঙ্গি বা অন্য কোন উপায়ে শিক্ষার্থীদের যে বার্তা শিক্ষক দেন তাই অভাষিক যোগাযোগ কৌশল। এগুলো হতে পারে-

- শিক্ষকের মুখের ভাব (Facial Expression)
- বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গি ও দেহভঙ্গিমা (Gesture and posture)
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের চলাফেরা করা (Movement)
- শিক্ষার্থীদের কাছাকাছি যাওয়া (Proximity)
- শিক্ষার্থীদের সাথে দৃষ্টি বিনিময় (Eye contact) ইত্যাদি।

- **শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাধা বা চ্যালেঞ্জসমুহ**

শ্রেণিকক্ষে সফল যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়সমুহ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেঃ

**১. অপরিকল্পিত বা অগোছালো কথা:** আপনি যদি খুব সুন্দরভাবে কথা বলতে দক্ষ হয়েও থাকেন তাহলেও আপনার পরিকল্পনার অভাব যোগাযোগকে কঠিন করে দিতে পারে। পরিকল্পনার অভাবে আপনি হয়তো ভুলেই গেলেন একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে, অথবা অনেক কথার ভিড়ে আপনার মূল কথা হারিয়েগেল।

**২. আঞ্চলিক ভাষা:** আপনি যদি বাংলাদেশের কোনো আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন, তাহলে আপনার ক্লাসের অন্য অঞ্চলের শিক্ষার্থী আপনার কথা নাও বুঝতে পারে। আবার আপনি যদি কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলের শ্রেণিকক্ষে একদম প্রমিত ভাষায় কথা বলেন তাহলেও শিক্ষার্থীরা আপনার কথা বুঝতে নাও পারে।

**৩. শব্দভাণ্ডারে প্রয়োজনীয় শব্দের অভাব:** অনেক সময় অল্পবয়সের শিক্ষার্থীরা তাদের মাতৃভাষারও অনেক শব্দের অর্থ জানেনা, সেক্ষেত্রে যোগাযোগে সমস্যা হয়।

**৪. ভৌত পরিবেশ:** এটি যোগাযোগের ক্ষেত্রে বড় একটি প্রতিবন্ধকতা। আপনার শ্রেণিকক্ষের পাশে যদি বাজারের কোলাহল থাকে বা মাইকের গান, বক্তৃতা বা অন্য কোনো শব্দ আসে তাহলে আপনি ও শিক্ষার্থীরা ক্লাসে মনোযোগ দিতে পারবেন না; আপনার বক্তব্য শুনতেও কষ্ট হবে। আবার শ্রেণিকক্ষ যদি অনেক বড় হয় তবে পেছন থেকে শিক্ষার্থীরা আপনার কথা শুনতে পারবে না বোর্ডে লেখা পড়তে পারবে না। কখনো কখনো বোর্ডটি এমনভাবে স্থাপন করা হয় যার কিছু অংশ টেবিলের আড়ালে পড়ে যায়।

**৫. আবেগিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা:** যোগাযোগের ক্ষেত্রে দু'পক্ষেরই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা দরকার। ঘণ্টা পড়ার পরবেশিরভাগ সময়ই শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কথা অনুসরণ বা বোঝার জন্য প্রস্তুত থাকে না। আবার শিক্ষার্থীরা খেলার মাঠ থেকে শ্রেণিকক্ষে ফেরার সাথে সাথেই শ্রেণির কাজের জন্য প্রস্তুত থাকে না। কখনো কখনো শিক্ষকও কোনো কারণে শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগের জন্য প্রস্তুত থাকেন না।

**৬. সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বা ভিন্নতা:** ধরুন আপনি চট্রগ্রামের মানুষ কিন্তু আপনি পড়াচ্ছেন ফরিদপুরের কোন শ্রেণিকক্ষে। আপনি খুব উৎসাহের সাথে মেজবানের উদাহরণ দিলেন। এক্ষেত্রে সম্ভাবনা বেশি আপনার শিক্ষার্থীরা মেজবান বিষয়টা বুঝতেই পারেনি।

**৭. দর্শন বা শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা:** আপনার শ্রেণিতে দর্শন বা শ্রবণ প্রতিবন্ধী কোন শিক্ষার্থী থাকলে আপনি তাদের সাথে সহজেই যোগাযোগ করতে পারবেন না।

**৮. শিক্ষকের মুদ্রাদোষজনিত আচরণ:** কোন কোন শিক্ষকের কিছু মুদ্রাদোষ থাকে, যেমন- চুলের গোছা পাকানো, মুখের সামনে হাত রেখে, নিজ হাত বা পা ঘষা, হাত কচলানো বা আঙুল মটকানো, অনাগ্রহীমূলক ভাবভঙ্গি ইত্যাদি। এ ধরনের আচরণের কারণে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ পাঠের বিষয়বস্তু থেকে স্থানান্তরিত হয়ে শিক্ষকের দিকে চলে যায়। ফলে শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগ বাধাগ্রস্ত হয়।

- **শ্রেণিকক্ষে কার্যকর যোগাযোগে নিশ্চিতকরণে শিক্ষকের করণীয়**

কার্যকরী যোগাযোগের জন্য যোগাযোগের বাধাসমুহ দূর করা দরকার। এজন্য আপনি নিচের পরামর্শগুলো বিবেচনা করলে উপকৃত হবেন।

**১. পরিকল্পনা:** পুরো শ্রেণি কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পনা করুন। এজন্য পূর্ণাঙ্গ পাঠ পরিকল্পনা করলে ভাল হয়। সময়ের অভাবে পূর্ণাঙ্গ পাঠ পরিকল্পনা না করতে পারলেও পরিকল্পনাটির সংক্ষিপ্ত নোট নিন।

**২. মনোযোগ আকর্ষণঃ** শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখুন সবসময়। শ্রেণির শুরুতে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করুন পাঠ সংশ্লিষ্ট কোন বাস্তব ঘটনা বলে।

**৩. সক্রিয়তাঃ** শ্রেণিতে সক্রিয় থাকুন, পরিপূর্ণ মনোযোগ রাখুন। তবে খেয়াল রাখবেন আপনার সক্রিয়তা যেন শিক্ষার্থীদের নিষ্ক্রিয় না করে দেয়। শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখার জন্যই আপনাকে সক্রিয় ও সতর্ক থাকতে হবে।

**৪. ভৌত পরিবেশঃ** শ্রেণিকক্ষের ভৌত পরিবেশ শিখন বান্ধব করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকলে তা দূর করুন। যেমন বোর্ডের সামনে উঁচু টেবিল থাকলে তা সরিয়ে নিচু টেবিল রাখুন।

**৫. শিক্ষার্থীদের সাথে নৈকট্যঃ** শিক্ষার্থীদের কাছাকাছি অবস্থান যোগাযোগকে সহজ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে ঘুরে ঘুরে কথা বলুন। এতে তারা মনোযোগী হবে। তবে সতর্ক থাকুন যাতে আপনি আবার একদম শিক্ষার্থীদের উপর ঝুঁকে না পড়েন। এতে আবার শিক্ষার্থী অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে পারে।

**৬. চোখে চোখে যোগাযোগ** (Eye contact)ঃ শিক্ষার্থীদের সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলুন। প্রয়োজনে চোখে চোখে যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করুন।

**৭.সহজ ভাষাঃ** শিক্ষার্থীরা বোঝে এমন ভাষা ব্যবহার করুন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রমিত ভাষায় কথা বলাই ভাল। তবে প্রত্যন্ত এলাকায় আপনাকে আঞ্চলিক ভাষাও ব্যবহার করতে হতে পারে। কঠিন শব্দ বা দীর্ঘ বাক্য পরিহার করে সহজ শব্দ ও ছোট বাক্যে বক্তব্য প্রকাশ করুন।

**৮. সুস্পষ্ট নির্দেশনাঃ** প্রতিটি কাজের পরিষ্কার নির্দেশনা দিন। যেমন কাজটি কী, কীভাবে করতে হবে, কী কী করতে হবে ইত্যাদি। নির্দেশনা প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তি করুন।

**৯. কণ্ঠস্বরের প্রয়োজনমাফিক ব্যবহারঃ** পরিষ্কার স্বরে কথা বলুন যাতে সকলে শুনতে পায়। তবে আপনার কণ্ঠস্বর হবে কোমল ও আন্তরিক। কখনো কখনো আপনি জোর দিয়ে কথা বলবেন, তবে কখনো আগ্রাসী কণ্ঠে কথা বলবেন না। খুব দ্রুত বা খুব ধীরে কথা না বলে যথাযথ গতিতে কথা বলুন। আবার সবসময় একই গতিতে ও একইভাবে কথা বললে শিক্ষার্থীরা বিরক্ত হতে পারে। তাই প্রয়োজন অনুসারে কণ্ঠস্বরে আবেগ এনে, জোর বাড়িয়ে বা কমিয়ে বিষয় উপস্থাপন করুন। যেমন, দুঃখের কোন ঘটনায় কণ্ঠে দুঃখের আবহ আনুন; আবার মজার কোন কিছু মজা করেই উপস্থাপন করুন।

**১০. অঙ্গভঙ্গিঃ** কথা ও লেখার সাথে অঙ্গভঙ্গিও গুরুত্বপূর্ণ। আপনার চলাচল, হাত পা নাড়ানো, মুখের এক্সপ্রেশন বা প্রকাশভঙ্গি বক্তব্যের ভাবার্থ অনুযায়ী হওয়া দরকার। ধরুন আপনি পড়াচ্ছেন - একটি রাসায়নিক কারখানার বর্জ্য পাশের খালের পানিকে দুর্গন্ধময় ও কালো করে ফেলেছে। আপনি কি হাসি হাসি মুখে এটি বলবেন না নাক-মুখ ও ভ্রু-কুঁচকে এটিকে অস্বস্তিকর হিসেবে তুলে ধরবেন?

**১১.শিক্ষার্থীদের প্রতিবন্ধিতা বিবেচনাঃ** দৃষ্টি বা শ্রবণ প্রতিবন্ধী কোন শিক্ষার্থী থাকলে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। যেমনঃ তাদের কাছে গিয়ে বলা এবং উপকরণ থাকলে তাদের কাছে নিয়ে দেখানো।

**১২.শিক্ষার্থীদের কথা শোনাঃ** কেবল নিজে না বলে শিক্ষার্থীদের বলতে দিন। তাদের কথা মন দিয়ে শুনুন। মনে রাখবেন কার্যকর যোগাযোগ সবসময়ই দ্বিমুখী।

**১৩.গুরুত্বপূর্ণ টার্মের ওপর জোর দেয়াঃ** গুরুত্বপূর্ণ ধারণা/টার্ম পুনরায় বলুন বা জোর দিয়ে বলুন। এ ধরনের টার্ম লেখার সময় নিচে দাগ দিয়ে বা ভিন্ন কালিতে লিখুন। এতে শিক্ষার্থীরা ঐ ধারণাটির প্রতি মনোযোগ বাড়াবে।

**১৪.আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টিঃ** শ্রেণিকক্ষে আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করুন। শিক্ষার্থীদের সাথে পাঠ্য বিষয় নিয়ে মজা করুন। যেমন- মজার গল্প বলা, প্রাসঙ্গিক কৌতুক বলা, মজার কোন অভিজ্ঞতা বলা ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেও তাদের মজার অভিজ্ঞতা শুনতে পারেন। তবে খেয়াল রাখুন আপনি আবার মজার বিষয়ে পরিণত না হন।

- **প্রশ্নকরণ কৌশল**

শ্রেণিকক্ষে যোগাযোগের একটা বড় উপায় হলো প্রশ্ন করা। প্রশ্ন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাবনার উদয়, জানার আগ্রহ সৃষ্টি এবং বিষয়বস্তু উপস্থাপনের পটভূমি তৈরি হয়। এর মাধ্যমে শিখনশেখানো কাজকে এগিয়ে নেয়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জটিল চিন্তন দক্ষতা ও অনুসন্ধানী মানসিকতা বাড়াতে ব্যবহার করা যায়। কাজেই প্রশ্ন শিখন শেখানো কাজে মূল ভূমিকা পালন করতে পারে।

– **প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য**

শ্রেণিকক্ষে আমরা বিভিন্ন উদ্দেশ্য প্রশ্ন করি। যেসব উদ্দেশ্যে শ্রেণিকক্ষে প্রশ্ন করা হয় তা হলো:

**১. মনোযোগ সৃষ্টিঃ** আলোচ্য বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে, শিখন-শেখানো কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে প্রশ্ন করা হয়।

**২. জটিল চিন্তন দক্ষতা বাড়াতেঃ** শিক্ষক ঠিকমতো প্রশ্ন করলে শিক্ষার্থীরা কোন একটি বিষয় সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক চিন্তা করতে ও অনুসন্ধান করতে আগ্রহী হয়। এক পর্যায়ে শ্রেণিকক্ষের বাইরেও একইভাবে চিন্তা ও অনুসন্ধান করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে শিক্ষার্থী নিজে নিজে কোন বিষয় সম্পর্কে শিখতে শিখে যায়।

**৩. পূর্বজ্ঞান যাচাইঃ** কোন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান অর্থাৎ কী জানে, কতটুকু জানে তা যাচাই করার জন্য প্রশ্ন করা হয়।

**৪. শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচাইঃ** শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ফলে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি ও এর মাত্রা যাচাই করতে প্রশ্ন করা হয়।

**৫. শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাঃ** কোন শিক্ষার্থীকে বা শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে মনোযোগ আকর্ষণ করার মাধ্যমে শ্রেণি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশ্ন করা একটি ভালো কৌশল।

– **কখন কী উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়?**

**১.ক্লাশের শুরুতে**

- শিক্ষার্থীকে শিখন-শেখানো কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে
- বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই করতে
- বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর এ পর্যন্ত অর্জিত যাচাই করতে

**২.পাঠ চলাকালীন**

- পরবর্তী বিষয়ে যাওয়ার আগে পূর্ববর্তী বিষয়ে শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কে নিশ্চিত হতে।
- শিক্ষার্থীরা কাজের নির্দেশনা বুঝতে পেরেছে কিনা তা নিশ্চিত হতে
- শিক্ষার্থীর শিখনকে গাইড করতে
- শিক্ষার্থীর মতামতকে পরিষ্কার ও শক্তিশালী করতে

**৩. পাঠের শেষাংশে**

- পাঠের শিখন অভিজ্ঞতার সংশ্লেষ ও সার-সংক্ষেপ করতে
- শিক্ষার্থীর শিখনকে মূল্যায়ন করতে ও স্বীকৃতি দিতে
- শিক্ষার্থীর শিখনকে স্বীকৃতি দিতে ও তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে
- পাঠের শিখনকে বিস্তৃত পাঠ্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করতে
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর আত্ম-মূল্যায়নকে সহায়তা করতে

– **প্রশ্নের ধরনসমুহ**

শ্রেণিকক্ষে প্রশ্নকে নানাভাবে শ্রেণি বিভক্ত করা যায়। যেমন-

**ক. বিশ্লেষণমূলকঃ** এর দ্বারা কোন ধারণা, প্রতীক বা টার্ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীর অনুধাবন যাচাই করা যায়। যেমনঃ পানিচক্র কী?

**খ. পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যভিত্তিকঃ** এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা পর্যবেক্ষণকৃত প্রমাণের ওপর নির্ভর করে। যেমনঃ এক টুকরো বরফকে রোদে রেখে দিলে বরফের তামপাত্রা বাড়বে কি?

**গ. মূল্যবোধ সম্পর্কিতঃ** এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীর মূল্যবোধের ওপর নির্ভর করে। শিক্ষার্থী তার মূল্যবোধ-এর ওপর ভিত্তি করে কোন কিছুর প্রশংসা করে বা সমালোচনা করে বা মূল্য আরোপ করে। যেমনঃ শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করা হয়যে, কীটনাশক পরিবেশ দূষণ করে, অতএব এটি কি বন্ধ করা উচিত?

প্রশ্নসমূহকে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রের ট্যাক্সোনোমির ভিত্তিতেও শ্রেণিবিভাগ করা যায়। অর্থাৎ জ্ঞানমূলক, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সংশ্লেষণ। শ্রেণিকক্ষে এবং পরীক্ষায় প্রশ্ন করার সময় এ ট্যাক্সোনোমি অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

– **শ্রেণিকক্ষে প্রশ্ন করার পরিকল্পনা**

শ্রেণিকক্ষে কী ধরনের প্রশ্ন করবেন, প্রশ্নের গঠন কী হবে তা আগে থেকে ভালভাবে পরিকল্পনা করে নিন। পাঠ পরিকল্পনায় কিছু ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন লিখে নেওয়া ভাল কারণ এই প্রশ্নগুলো আপনার পাঠকে অংশগ্রহণমূলক করা নিশ্চিত করবে। প্রশ্ন করার পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে পারেন-

১. আগে থেকেই আপনার পাঠের বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু মূল প্রশ্ন প্রস্তুত করে রাখুন।

২.প্রশ্নগুলোর মধ্যে উচ্চতর দক্ষতা ও নিম্নস্তরের দক্ষতা উভয় ধরনের প্রশ্নই রাখুন।

৩.পাঠকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রশ্নগুলো এমনভাবে সাজান যাতে তার ধারাবাহিকতা শিক্ষার্থীদের কাছে যৌক্তিক মনে হয়।

৪. প্রশ্নগুলোর ভাষা ও গঠন সহজ, পরিষ্কারবোধ্য ও শিক্ষার্থীদের উপযোগী হবে।

– **শ্রেণিকক্ষে প্রশ্ন করা (বাস্তবায়ন)**

নিচের ক্রম অনুসরণ করেশ্রেণিকক্ষে প্রশ্ন করাযেতে পারে।

চিত্র ২.২: শ্রেণিকক্ষে প্রশ্ন করার ক্রম

**১. প্রশ্ন করুন:** শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করুন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এবং দ্রুত। কতটা দ্রুত তা নির্ভর করবে বিষয় ও প্রশ্নের ধরনের ওপর। কোন তথ্য জানতে চাইলে তা অতি সংক্ষেপে ও দ্রুত করা যায় কিন্তু বিশ্লেষণধর্মী উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন হলে তত দ্রুত প্রশ্ন করা যাবে না।

**২. অপেক্ষাধীন সময়:** প্রশ্ন করার পর কিছুটা সময় (৩-৪ সেকেন্ড হলে সবচেয়ে কার্যকরী হয়) অপেক্ষা করুন উত্তর দেওয়ার শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট করার আগে। এই সময়ে কোনো শিক্ষার্থী উত্তর দিতে চাইলেও তাকে থামিয়ে দিন। এই সময়ে সকল শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর খুঁজবে।

**৩. শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট করুন:** একজন শিক্ষার্থীকে নির্দেশ করে তাকে উত্তর দিতে বলুন। প্রশ্নটির ভাষা পরিবর্তন করে পুনরায় করতে হলে এ পর্যায়ে করতে পারেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, শিক্ষক নির্দিষ্ট কয়েকজনকেই প্রশ্ন করেন। এটি পরিহার করে সকল শিক্ষার্থীকে পালাক্রমে প্রশ্ন করতে হবে।

**৪. শিক্ষার্থীর জবাব:** এ পর্যায়ে নির্দিষ্ট শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর দেবে। শিক্ষার্থীর উত্তর মন দিয়ে শুনুন। একেবারে অপ্রাসঙ্গিক না হলে তাকে উত্তর সমাপ্ত করার সুযোগ দিন।

**৫. অপেক্ষাধীন সময়:** আপনি কোন প্রতিক্রিয়া বা জবাব দেওয়ার আগে কয়েক সেকেন্ড সময় নিন।

**৬. জবাব, প্রতিক্রিয়া ও দিকপরিবর্তন:** এ পর্যায়ে আপনার প্রতিক্রিয়া বা জবাব দেবার পালা। তবে আপনার উচিত শিক্ষার্থীর উত্তর গ্রহণ করা এবং এটি শিক্ষার্থী সহায়কভাবে করা। আপনি সাময়িকভাবে শিক্ষার্থীর উত্তরকে বিবেচনা না করে পরবর্তীতে অন্য প্রশ্নের উত্তরের সাথে পাঠ পরিচালনার সময় সাড়া/ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিতে পারেন। অধিকতর ব্যাখ্যা, স্পষ্টীকরণ বা বিশ্লেষণের জন্য নতুন কোনো প্রোবিং প্রশ্ন করতে পারেন। আবার উত্তরের কিছু অংশের জন্য শিক্ষার্থীকে প্রশংসা করতে পারেন এবং বাকি অংশ পুনঃবিবেচনা করার জন্য বলতে পারেন। মূলকথা হলো শিক্ষার্থীর উত্তরের পর শিক্ষকের প্রতিক্রিয়া ভীতি জাগানিয়া হবে না; হবে বন্ধুসুলভ ও শিক্ষার্থী সহায়ক।

নির্দিষ্ট শিক্ষার্থী উত্তর দিতে না পারলে অন্যদের সুযোগ দিতে পারেন উত্তর দেবার। আবার একজন শিক্ষার্থী সঠিক জবাব দিতে পারলেও অন্য এক শিক্ষার্থীকে একই প্রশ্ন করতে পারেন। কখনো কখনো শিক্ষার্থী বুঝে জবাব দিয়েছে কি না তা বোঝার জন্য আপনি না বোঝার ভান করে শিক্ষার্থীকে নতুনভাবে নতুন ভাষা ব্যবহার করে উত্তর দিতে বলতে পারেন।

আলোচ্য অধিবেশনে আমরা শ্রেণিকক্ষের যোগাযোগ কৌশল নিয়ে আলোচনা করলাম এবং তার অংশ হিসেবে প্রশ্নকরণের বিভিন্ন উপায়গুলো আলোচনা করলাম। শিক্ষার্থীর সাথে যোগাযোগ ভালো না হলে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি সঠিকভাবে জানা যায় না। তাই প্রশ্ন করার সময় অধিবেশনে আলোচ্য কৌশলগুলো অনুসরণ করা উচিত।

- **ছোট ও বড় শ্রেণিকক্ষে শ্রেণি পরিচালনা কৌশল**

প্রিয় শিক্ষার্থী আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শ্রেণিকক্ষে সবক্ষেত্রে সমান সংখ্যক শিক্ষার্থী নেই। কোথাও বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী, আবার কোথাও কম সংখ্যক শিক্ষার্থী। এই দুই ধরনের শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার জন্য কী একই ধরনের কৌশল ব্যবহার হবে?

কম ও বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য শ্রেণি পরিচালনা কৌশল এক হবে না। শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম থাকলে তাদেরকে শিখন শেখানোর কাজে অনেক বেশি যুক্ত করার সুযোগ থাকে। শিক্ষক একসাথে তাদের সবাইকে নির্দেশনা দিতে পারেন। তাই তাদের জন্য সেভাবে পরিচালনা কৌশল ঠিক করতে হবে। পক্ষান্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি থাকলে সবাইকে একসাথে দেখাশোনা করা এবং নির্দেশনা কঠিন। তাই তাদের শ্রেণি পরিচালনা কৌশল এমন হওয়া প্রয়োজন যেন সকলকে কার্যকরভাবে সক্রিয় রাখা যায়।

- **বড় শ্রেণিকক্ষে শ্রেণি পরিচালনা কৌশল**

সারা বাংলাদেশের দিকে তাকালে দেখা যায় যে এখানে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর তুলনায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম। এর ফলে প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়েই শ্রেণিকক্ষগুলোতে শিশু সংখ্যা গড়ে ৫০ থেকে ৬০ জন বা এরও বেশি। শ্রেণিতে শিশু সংখ্যা ৪০-এর অধিক হলেই আমরা ঐ ধরনের শ্রেণিকে অধিক শিশুসংবলিত শ্রেণি বলে থাকি। একজন শিক্ষকের পক্ষে অধিকসংখ্যক শিশু সংবলিত শ্রেণিতে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য। তাই এ ধরনের অধিক শিশু সংবলিত শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় শিক্ষককে বিশেষ দক্ষতা

ও বিভিন্ন ধরনের কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। এই অধিবেশনে অধিক শিশুসংবলিত শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় যে ধরনের দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করা প্রয়োজন, সে ধরনের কিছু দক্ষতা ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কৌশলগুলো হলো-

**বসার ব্যবস্থা:** শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থা এমনভাবে করুন যেন শিক্ষার্থীরা সবাই আপনাকে দেখতে ও শুনতে পায়। আসন বিন্যাস এমন হবে শিক্ষক যেন শিক্ষার্থীদের কাছাকাছি যেতে পারেন এবং তাদের কাজকর্ম তদারক করতে পারেন। নিচে কিছু নমুনা দেয়া হলো। আপনার প্রয়োজনের নিরিখে এর যেকোনটি বা এ ধরনের সহায়ক আসন বিন্যাস করে নিতে পারেন।

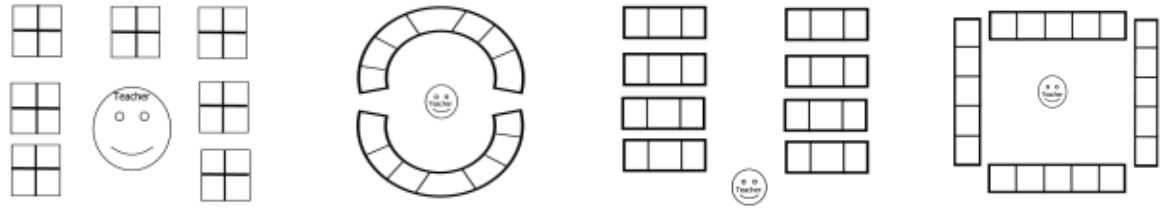


চিত্র ২.৩: শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর আসন ব্যবস্থা (নমুনা)

**শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন প্রান্তে চলাচল করা:** শিক্ষক শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনার সময় শ্রেণিকক্ষের সামনের দিকে অর্থাৎ লেখার বোর্ডের কাছাকাছি না থেকে ডানে-বাঁয়ে ও পেছনের দিকে চলাচল করবেন। অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষার্থীদের কাছাকাছি যাবেন।

**সকল শিশুর প্রতি নজর রাখা:** শিক্ষক সকল শিশুর প্রতি সমানভাবে লক্ষ রাখবেন অর্থাৎ শিশুদের সাথে 'আই কন্ট্যাক্ট' রাখার চেষ্টা করবেন। দলগত কাজ করানোর সময় ঘুরে ঘুরে প্রতি দলের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

**দলগত কাজ করানো:**শিক্ষক পারগ ও শিখন সমস্যাসম্পন্ন শিশুদের সমন্বয়ে পাঁচ-ছয়টি দল গঠন করবেন। শ্রেণিতে শিশুরা এই দল অনুযায়ী একসাথে বসবে এবং প্রতি সপ্তাহে পর্যায়ক্রমে বসার জায়গা পরিবর্তন করবে। শিক্ষক দলের নাম শিশু উপযোগী করার জন্য নদী/ফুল/ফল/রং ইত্যাদির নামে দলের নামকরণ করবেন। এভাবে দলগতভাবে শিশুরা বসলে শিক্ষক খুব সহজেই শিশুদের দলগত কাজ করাতে পারবেন। যেমন- সামনের বেঞ্চে যারা বসে আছে, তারা ঘুরে পেছনের বেঞ্চের শিশুদের মুখোমুখি হয়ে বসবে এবং দলগত কাজে অংশগ্রহণ করবে। শিক্ষক প্রত্যেক দলকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় এর কাজ দেবেন এবং ঘুরে ঘুরে প্রতি দলের কাজ দেখবেন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন। নির্দিষ্ট সময় পরে দলগত কাজের বিষয় পরিবর্তন করে দেবেন। তবে এক পিরিয়ডে একবারের বেশি পরিবর্তন করবেন না।

**সকলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা ও নির্বাচিত উত্তর গ্রহণ:**শিক্ষক শ্রেণিতে যখন কোনো প্রশ্ন করবেন তখন প্রশ্নটি শ্রেণিতে উপস্থিত সকল শিশুর উদ্দেশ্যে করবেন। শিশুদের মধ্যে যারা উত্তরটি পারবে তারা হাত উঁচু করবে। শিক্ষক যেদিকে থাকবেন তার বিপরীত দিক থেকে যে সকল শিশু হাত উঁচু করেছে তাদের মধ্যে থেকে একজনকে (এমন একজন শিশুর কাছ থেকে উত্তর নিতে হবে, যার উত্তর যেন সকল শিশু শুনতে পায়) উত্তর দিতে বলবেন। এরপর শিক্ষক তার অবস্থান পরিবর্তন করবেন এবং একই পদ্ধতি অনুসরণ করে অন্য একজন শিশুকে উত্তর দিতে বলবেন। এভাবে কয়েকজন শিশুর কাছ থেকে উত্তর শোনার পর, যারা হাত উঁচু করেনি তাদের কাছ থেকে উত্তর শুনবেন। তবে উত্তরটি পেছনের দিকের/সারির শিশুদের দিতে উৎসাহিত করবেন।

শিক্ষক একজন একজন করে উত্তর দেয়াকে উৎসাহিত করবেন, সকল শিশুর একসাথে উত্তর দেয়াকে নিরুৎসাহিত করবেন।

**শিশুদের দিয়ে খাতা মূল্যায়ন:**শ্রেণিকক্ষে শিশুদের বাড়ির কাজ শিশুদের দিয়েই মূল্যায়ন করানো যেতে পারে। যেমন- বাড়ির কাজ শিক্ষকের কাছে জমা দেয়ার পর শিক্ষক একজনের খাতা অন্যজনকে দেবেন এবং মূল্যায়ন করতে বলবেন।এক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে শিক্ষক শেষের দিকে সঠিক উত্তর বোর্ডে লিখে দিতে পারেন।

**শ্রেণিনেতাদের সহায়তা গ্রহণ:** শ্রেণিতে কয়েকজন শ্রেণিনেতা ঠিক করবেন এবং শ্রেণিনেতাদের শ্রেণির বিভিন্ন জায়গায় বসতে উৎসাহিত করবেন। শিখন শেখানো কাজ পরিচালনার সময় শিক্ষক এই সকল শ্রেণিনেতাদের সহায়তা নেবেন। এর ফলে শিক্ষক অধিক শিশুসংবলিত শ্রেণি ব্যবস্থাপনা সহজেই করতে পারবেন। তবে প্রতি মাসে নতুন শ্রেণিনেতা নির্বাচন করতে হবে। এই কাজের জন্য শিশুদের একটি নামের তালিকা শিক্ষকের কাছে থাকা বাঞ্ছনীয়। এমনকি শ্রেণিতে একটি নামের তালিকা টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে।

**শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যাওয়া:**পাঠের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাঝেমধ্যে শিশুদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে শ্রেণিনেতাদের কাজে লাগানো যেতে পারে। যেমন- তৃতীয় শ্রেণির আমার বাংলা বইয়ের ৪৫ পৃষ্ঠায় 'কলাবতীর হাটে' গল্পটি পড়ানোর জন্য শিক্ষক শিশুদের কাছাকাছি কোনো বাজারে/হাটে নিয়ে যেতে পারেন।

**শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে শ্রেণিকক্ষের ভেতরে ও বাইরে রাখা:**শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় দল ভাগ করে কয়েক দলকে শ্রেণিকক্ষে এবং কয়েক দলকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে কাজ করানো যেতে পারে (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক)। এ ক্ষেত্রে শ্রেণিনেতাদের কাজে লাগানো যেতে পারে। যেমন- দ্বিতীয় শ্রেণির ইংরেজি ক্লাসে শিক্ষার্থীদের *This* এবং *That*-এর ব্যবহার শেখানোর জন্য শ্রেণিনেতাসহ দুই দল শিশুকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে কাজ করার জন্য বলতে হবে এবং দুই দল শিশুকে শ্রেণিকক্ষের ভেতরে কাজ করতে বলতে হবে। তাদের মাঝে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করার জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে কোন দল This এবং That দিয়ে বেশি বাক্য তৈরি করতে পারে। যে দল বেশি নির্ভুল বাক্য তৈরি করতে পারবে তারা জয়ী হবে।

**একাধিক উপকরণ ব্যবহার করা:**অধিক শিশুসংবলিত শ্রেণিতে একই রকম একাধিক উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন, যেমন- একটি গ্লোবেরস্থলে পাঁচটি গ্লোব।

### – ছোট শ্রেণিকক্ষে শ্রেণি পরিচালনার কৌশল

বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকলেও কিছু বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক কম। আবার বড় শ্রেণিকক্ষেও কখনো কখনো শিক্ষার্থী উপস্থিতি কম থাকে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থী সংখ্যা ২০ এর কম হলেই তাকে কম সংখ্যক শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষ বলা যায়। এ ধরনের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী কম থাকায় শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ বেশি থাকে। শিক্ষক সবার কাছে যেতে এবং তাদের কথা শুনতে পারে। প্রত্যেককে আলাদা করে মূল্যায়ন করতে পারে। ফলে শ্রেণি পরিচালনা কৌশল অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী সংবলিতশ্রেণিকক্ষ থেকে ভিন্ন হয়। এ ধরনের শ্রেণিকক্ষে শ্রেণি পরিচালনার কৌশল কী হতে পারে তা নিচে আলোচনা করা হলো।

**বসার ব্যবস্থা:** ছোট শ্রেণির ক্ষেত্রে সুবিধা হচ্ছে শিক্ষক যেখানেই বসেন শিক্ষার্থীরা সহজেই তাকে দেখতে বা শুনতে পায়। তবে শিক্ষার্থীরা যেন সহজে শিক্ষককে শুনতে ও দেখতে পায় সেজন্য উপযোগী আসন বিন্যাস করতে হবে। চিত্র ২.৩ এ কিছু নমুনা আসন বিন্যাস দেয়া হলো। আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী এর যেকোনটি বা এ ধরনের সহায়ক আসন বিন্যাস করে নিতে পারেন।

**সকলের প্রতি সমান মনোযোগ প্রদান:** শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী কম থাকার সুবিধা হচ্ছে শিক্ষকের পক্ষে সকলের দিকে মনোযোগ দেয়া সম্ভব হয়। সুতরাং শিক্ষককে সকলের দিকে সমান মনোযোগী হতে হবে। একই সাথে তাদের সাথে চোখে চোখে যোগাযোগ বা আই কন্ট্যাক্ট রাখতে হবে।

**শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ সংযুক্তি/অনুশীলন:** শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদেরকে প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন কাজে যুক্ত করুন। তাদেরকে বোর্ডে ডাকুন, বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা দিতে বলুন এবং অনুশীলন করে দেখাতে বলুন। অল্প শিক্ষার্থী থাকায় তাদেরকে সহজেই বিভিন্ন কাজে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করা যায়।

**শিক্ষার্থীদের দিয়ে কাজ তদারক করা:** শিক্ষার্থীরা যখন কাজ করবে তখন তাদের কাছে যান এবং ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখুন। তাদের কোন সমস্যা হচ্ছে কিনা জানতে চান এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তা দিন।

**উপকরণ ধরতে ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে দেয়া:** যখন কোন উপকরণ দেখাবেন বা কোন দক্ষতা/কৌশল উপস্থাপন করবেন তখন উপকরণসমূহ শিক্ষার্থীদের নেড়েচেড়ে দেখার এবং উপকরণ/কৌশল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ দিন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরেও নিয়ে যেতে পারেন। যেমন- আলোছায়ার খেলা বা উদ্ভিদ সম্পর্কে পাঠদান করতে গিয়ে তাদেরকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে আলোছায়াযুক্ত স্থান কিংবা উদ্ভিদের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দিতে পারেন। একইভাবে মেলা, হাট-বাজার, বিভিন্ন উৎসব ইত্যাদি সম্পর্কে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিশুদের এসব কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ দিন। অল্প শিক্ষার্থী হওয়ায় খুব সহজেই আপনি ম্যানেজ করে এসব কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে পারেন।

**চিন্তা ও আলোচনা করতে দেয়া:** শ্রেণিকক্ষে যখন কোন বিষয় উপস্থাপন করবেন তখন সেসব বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও আলোচনা করার সুযোগ দিন। আপনিও শিক্ষার্থীদের সাথে এসব আলোচনায় অংশগ্রহণ করুন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আপনার মতামত দিন।

**সরাসরি প্রশ্ন করা এবং ফিডব্যাক প্রদান:** শিশুদের পূর্বজ্ঞান যাচাই কিংবা পাঠদানকালীন গাঠনিক মূল্যায়নের জন্য তাদেরকে সরাসরি প্রশ্ন করুন। এক্ষেত্রে সবার জন্য প্রশ্ন ছুড়ে দিতে পারেন আবার নির্দিষ্ট করে কোন শিক্ষার্থীর প্রতিও প্রশ্ন করতে পারেন। বিশেষ করে যেসকল শিক্ষার্থী নিজ থেকে উত্তর দেয়া না বা একটু পিছিয়ে পড়া তাদের সরাসরি প্রশ্ন করুন। প্রশ্নের উত্তর না পারলে বা সঠিক না হলে প্রথমে অন্য শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে তা দেয়ার চেষ্টা করুন। তারা না পারলে আপনিই প্রয়োজনমত ফিডব্যাক দিন। শিক্ষার্থীদের নিয়মিতভাবে যাচাই করুন এবং একবার যারা বাদ যাবে তাদের পরবর্তী সময়ে যাচাই করুন।

উপরে উল্লিখিত নির্দিষ্ট কৌশলের বাইরে আরো কিছু কৌশল আছে যা বড়-ছোট নির্বিশেষ সকল শ্রেণিকক্ষেই ব্যবহৃত হতে পারে। এ সকল কৌশল শ্রেণিকক্ষের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনাকে সহজ করে। কৌশলগুলো হলো-

**শ্রেণিকক্ষে অনুসরণীয় চার্ট স্থাপন:** শ্রেণিতে শিশুদের অনুসরণীয় একটি চার্ট তৈরি করে শিখন শেখানো কাজ পরিচালনার শুরুতেই চার্টটি দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়া এবং চার্টের বিষয়ে শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এটি শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে (নমুনা সংযোজন করা হলো)।

চিত্র ২.৪: শিশুদের অনুসরণীয় চার্ট (নমুনা)

| অনুসরণীয় চার্ট | |
|---|---|
| ১। শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনব।<br>২। দলে কাজের সময় সবার মতামত শুনব। অন্যের মতের সাথে একমত না হলে ভদ্রভাবে যুক্তি দিয়ে তার মত খণ্ডন করব।<br>৩। দলে সক্রিয় অংশগ্রহণ করব।<br>৪। কিছু বলার আগে হাত তুলব।<br>৫। সবার সাথে ভালো ব্যবহার করব এবং সদ্ভাব বজায় রাখব।<br>৬। আমার খাতায় আমার কথা বা চিন্তা নিজেই লিখব। | ৭। সবাই একসাথে কথা বলব না, একজন বলার পর অন্যজন বলব।<br>৮। সবাইকে দলের কাজ উপস্থাপন করার এবং অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেব।<br>৯। শান্তি বজায় রাখব, যাতে সবাই সবার কথা শুনতে পায়।<br>১০। দলের কাজ পরিচালনায় একে অন্যকে সহযোগিতা করব। |

**শিশুদের মাধ্যমে এক অন্যের সমস্যার সমাধান:**নিরাময়মূলক কাজের সময় পারগ শিশুদের দিয়ে শিখন সমস্যাসম্পন্ন শিশুদের নিরাময়ের ব্যবস্থা নিতে পারেন। যেমন- প্রশ্নের উত্তর লেখার পর শিখন সমস্যাসম্পন্ন শিশুদের খাতা পারগ শিশুদের দিয়ে মূল্যায়ন করানো।

**বসার জায়গা পরিবর্তন:**মাঝে মাঝে শ্রেণিতে শিশুদের বসার জায়গা পরিবর্তন করানো, যেমন- সামনে যারা বসেছে তাদের পেছনে এবং পেছনের শিশুদের সামনে বসার সুযোগ দেয়া। তবে এই কাজটি মাসে এক/দুইবার করা যেতে পারে।

শ্রেণিকক্ষের আকৃতি বড় বা ছোট যাই হোক শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখন শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়নই শ্রেণি কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষকের কাছে শ্রেণি পরিচালনার মূখ্য উদ্দেশ্যও সেটি। ফলে উপরিউক্ত কৌশলসমূহের বিষয়ে অনমনীয় হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের ধরন, শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ইত্যাদির কারণে এর কোনটি হয়তো অধিক কার্যকর, আবার কোনটি কম কার্যকর হতে পারে। সেক্ষেত্রে শিক্ষক তার পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করে উপযুক্ত কৌশল ব্যবহার করবেন এটাই কাম্য।

## প্রাথমিক শিক্ষায় শিখন শেখানোপদ্ধতি

আপনি কি কখনো খেয়াল করেছেন যে আপনাদের মধ্যেই কেউ কেউ আছেন যারা খুব চমৎকার করে পড়ান? তাদের ক্লাসে শিক্ষার্থীরা খুব মনোযোগী হয় এবং যে বিষয় পড়ানো হয় তা সহজেই শিখে ফেলে। তারা পাঠের বিভিন্ন কাজে শিক্ষার্থীদের যুক্ত করেন, প্রতিটি কাজ ঠিকভাবে এবং ঠিক সময়ে শিক্ষার্থীদের দিয়েই করিয়ে নেন। আবার কোনো কোনো শ্রেণিকক্ষে দেখবেন এর উল্টোটা।শিক্ষক গৎবাঁধাভাবে পড়িয়ে যান,শিক্ষার্থীদের শিখন শেখানো কাজে যুক্ত করেন না। শিক্ষক বলেন, শিক্ষার্থীরা তা হয়তো শোনে কিন্তু পাঠে মনোযোগী হয় না। ফলে শিক্ষার্থীদের শিখনও কার্যকরী হয় না।

ভাবুন তো,উপরে বর্ণিত দুই শিক্ষকের শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে পার্থক্যের কারণ কী?

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে পার্থক্যের কারণ হলো তাঁদের শিখন শেখানো কার্যক্রমের পার্থক্য। তাঁরা শ্রেণি কার্যক্রমেযে ধরনের পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করেছেন তার ভিন্নতা। শিখন শেখানো কার্যক্রমের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে শিক্ষক কী পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করছেন, কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন তার ওপর। শিখন শেখানোর পদ্ধতি ও কৌশল যথাযথ না হলে পাঠের উদ্দেশ্য অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়। অধ্যায়েরএ অংশে  আমরা শিখন শেখানো কার্যক্রমে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করবো।

কোনো কাজ করার জন্য আমরা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া বা উপায় অনুসরণ করি যেখানে কে, কী কাজ, কীভাবে করবে তা নির্ধারণ করে থাকি। কাজ করার জন্য যেনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া বা উপায় অনুসরণ করা হয় তাইপদ্ধতি। শিখন শেখানো একটি উদ্দেশ্যমূলক কাজ যা কে শিখবে, কীভাবে শিখবে, তাতে কার ভূমিকা কী হবে ইত্যাদি নির্ধারণ করে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ধারাবাহিক যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকেই শিখন শেখানোর পদ্ধতি বলা হয় (লতিফ, ২০০৭)।

শিখন শেখানো কার্যক্রমের তিনটি প্রধান উপাদান হচ্ছে-শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শেখার বিষয়বস্তু। শিখন শেখানো পদ্ধতির কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থী ও তার শেখার বিষয়ের মধ্যে যোগাযোগ তৈরির মাধ্যমে শিখনফল অর্জনের চেষ্টা করা। অর্থাৎ শিক্ষক নির্দিষ্ট পদ্ধতির ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও শেখার বিষয়বস্তুর মধ্যে যোগাযোগ ঘটান (মালেক ও অন্যান্য, ২০০৯)।

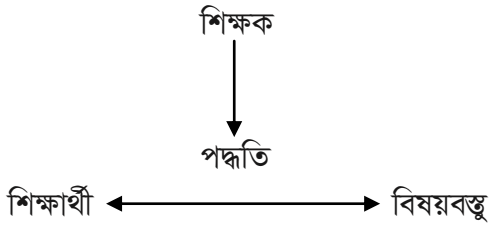


পূর্বের অধ্যায়ে আপনারা শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে জেনেছেন। শিক্ষকের শিখন শেখানো পদ্ধতি নির্ভর করে তিনি কোন শিখন তত্ত্বকে গ্রহণ করেন তার ওপর। প্রাচীনকাল থেকে বেশিরভাগ শিক্ষক মনে করতেন শিক্ষার্থীর শিখনে শিক্ষকের ভূমিকাই মূখ্য, শিক্ষার্থীর ভূমিকা গৌণ। এ ধরনের চিন্তার পেছনে কাজ করতো শিখনের আচরণবাদী তত্ত্ব যার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের আচরণের পরিবর্তন ঘটানো। এ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী

বিষয়টি বুঝতে পারছে কিনা বা কীভাবে শিখছে তা বিবেচনাকরা হতো না। শিক্ষক যা শেখাতেন, যেভাবে শেখাতেন তা-ই শিক্ষার্থীদের শিখতে হতো অনেকটা বাধ্য হয়ে। শিক্ষকের ভূমিকাই প্রধান হওয়ায় এ ধরনের পদ্ধতিসমূহকে শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতিও বলা হয়।

তবে সময়ের সাথে এক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে শিখনেশিক্ষার্থীর ভূমিকাই মুখ্য বিবেচনা করা হয়।এখানে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তারমাধ্যমে তাকে শিখতে সাহায্য করা। এ ধরনেরশিখন শেখানোপদ্ধতি গঠনবাদ, সামাজিক-সাস্কৃতিক তত্ত্ব, অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন ইত্যাদি শিখন তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত। এ তত্ত্ব অনুসারে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান, বয়স, অভিজ্ঞতা, রুচি, আগ্রহ ও পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষক উপযুক্ত শিখন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করবেন যেন শিক্ষার্থীরাতা নিজের মত করে গঠন ও পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে শিখতে পারে। শিক্ষার্থীদের ভূমিকা মুখ্য হওয়ায় এ ধরনের পদ্ধতিকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি বলা হয়।

শিখন তত্ত্বের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিখন শেখানোর পদ্ধতির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পরিবর্তন এসেছে। নিচের চিত্রে শিখন তত্ত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন পদ্ধতি দেখানো হলো-

**আচরণবাদী/শিক্ষককেন্দ্রিক** ⟷ **গঠনবাদী/শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক**

| বক্তৃতা | প্রদর্শন | আলোচনা | সমস্যা সমাধান | প্রজেক্ট | ভূমিকাভিনয় | উপস্থাপন | সিমুলেশন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

চিত্র ২.৪: শিখন তত্ত্বে শিখন শেখানো পদ্ধতির অন্তর্ভুক্তি

উপরের চিত্র অনুসারে বক্তৃতা বা উপস্থাপন পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি মাত্রায় শিক্ষককেন্দ্রিক বা আচরণবাদী তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত পদ্ধতি। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ খুবই কম। ক্রমে চিত্রের যত ডানদিকে যাওয়া হবে পদ্ধতিগুলোর ক্ষেত্রে ক্রমে শিক্ষককেন্দ্রিকতা কমবে এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিকতা বাড়বে। এভাবে ভূমিকাভিনয় বা সিমুলেশনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিকতা বা আচরণবাদী তত্ত্বের প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। তবে সাধারণভাবে চিত্রের বামদিকের ৩টি পদ্ধতি শিক্ষককেন্দ্রিক এবং ডানদিকের ৩টি পদ্ধতি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত।

### বক্তৃতা পদ্ধতি

শিখন শেখানোর কাজে একটি বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় পদ্ধতি হলো বক্তৃতা পদ্ধতি। এটি এক ধরনের মৌখিক উপস্থাপনা। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সামনে বর্ণনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এটি শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি। সাধারণত শিক্ষক যা বলেন শিক্ষার্থীরা নীরবে ও মনোযোগ সহকারে তা শোনে এবং ক্ষেত্র বিশেষে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো খাতায় লিখে নেয়। এই পদ্ধতিতে শিখন শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ কম থাকে।

- **বক্তৃতা পদ্ধতির ভিত্তি**

বক্তৃতা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে আচরণবাদ। আচরণবাদ অনুযায়ী শিক্ষার্থীর শেখার জন্য উদ্দীপকের দরকার হয় এবং শিক্ষক তার বর্ণনা, গল্প, উদাহরণ কিংবা আকর্ষণীয় উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে শুনে, প্রয়োজনীয় বিষয়ের নোট করে বা শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের

মাধ্যমে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর (উদ্দীপকের) প্রতি প্রতি সাড়া দেয়। শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, স্বশিখন প্রক্রিয়া ও সক্রিয় অংশগ্রহণকে এতে বিবেচনা করা হয় না। শিক্ষকের উপস্থাপিত বিষয় লিখে প্রকাশ করতে পারলে বা মুখে বর্ণনা করতে পারলেই বিষয়টি শিক্ষার্থী শিখেছে (আচরণের পরিবর্তন ঘটেছে) বলে ধরে নেয়া হয়।

– **বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধা**

শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি না হলেও বক্তৃতা পদ্ধতির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। যে কারণে সবচেয়ে প্রাচীন পদ্ধতি হলেও এটি এখনো বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় পদ্ধতি। এর সুবিধাগুলো হলো:

**সময় সাশ্রয়:** এই পদ্ধতিতে শিক্ষক অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বেশি বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করতে ও বিষয় সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট করতে পারেন। তাছাড়া সংক্ষিপ্ত নোটিশেই শিক্ষক শ্রেণি কার্যক্রমের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন।

**নতুন বিষয় উপস্থাপন:** নতুন বিষয় উপস্থাপনে বক্তৃতা খুবই কার্যকরী পদ্ধতি। বক্তৃতার সাথে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ থাকে। ফলে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে আরও সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ করতে এই পদ্ধতি সহায়ক।

**বড় শ্রেণিকক্ষের উপযোগী:** বড় শ্রেণিকক্ষে অনেক শিক্ষার্থী থাকে বলে সেখানে অন্য পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু বক্তৃতা পদ্ধতিতে সবাইকে একত্রে একই নির্দেশনা দেয়া ও পাঠ পরিচালনা সহজ হয়।

**বর্ণনামূলক পাঠের উপযোগী:** বর্ণনামূলক পাঠ যেখানে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার সুযোগ কম সে ধরনের পাঠের জন্য বক্তৃতা পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী। এর মাধ্যমে খুব সহজেই পাঠের মূল বিষয় শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা যায়।

**উপকরণ না থাকলে:** উপকরণ না থাকলেও এ ধরনের পাঠ পরিচালনা সম্ভব। শিক্ষক বিভিন্ন গল্প, বর্ণনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তার কণ্ঠস্বরের ওঠানামা ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করে তুলতে পারেন।

– **বক্তৃতা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা**

সুবিধার পাশাপাশি বক্তৃতা পদ্ধতির বেশ কিছু অসুবিধা রয়েছে। এর অসুবিধাগুলো হলো:

**সক্রিয়তার অভাব:** এ পদ্ধতিতে শিক্ষক সক্রিয় এবং শিক্ষার্থী অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীরব শ্রোতা হিসেবে থাকে। সক্রিয়তার মাধ্যমে শিখন না ঘটায় শিক্ষার্থীর শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয় না, তেমনি তাদের সৃজনশীলতা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ কমে যায়। অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও মতামত প্রকাশের প্রবণতা তৈরি হয় না, বরং তাদের মধ্যে শুধু শিক্ষক বলবেন এই ধারণা তৈরি হয়।

**চাহিদা ও সামর্থ্য উপেক্ষিত:** এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদা, প্রবণতা, সামর্থ্য ইত্যাদি পার্থক্যের ওপর গুরুত্ব দেয়া সম্ভব হয় না। শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার অভাবে তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা উপেক্ষিত থাকে। ফলে পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীরা আগ্রহ হারায় এবং কার্যকর শিখন ব্যহত হয়।

**উপযোগিতার অভাবঃ** তাত্ত্বিক বা বর্ণনামূলক বিষয় বাদে অন্য বিষয়ের ক্ষেত্রে, বিশেষত যেখানে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা ও হাতে-কলমে অনুশীলনের মাধ্যমে শেখা দরকার সেখানে এ পদ্ধতির কার্যকারিতা অনেক কম। এছাড়া এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া কম ঘটে বলে তাদের সামাজিক বিকাশ ব্যহত হয়।

*বক্তৃতা পদ্ধতিকে কার্যকরী করে তোলার উপায়*

বক্তৃতা পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপনের বেশ কিছু অসুবিধা রয়েছে। তবে কিছু কৌশল অবলম্বন করে এ পদ্ধতিকে শ্রেণিকক্ষে কার্যকর করে তোলা যায়। কৌশলগুলো নিম্নরূপ:

**পরিকল্পনাঃ** বক্তৃতা পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থানের জন্য আগেই একটা পরিকল্পনা করতে হবে। শিক্ষক কতক্ষণ আলোচনা করবেন, কখন কোন বিষয়টি বলা হবে, এতে কী ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হবে, শিক্ষার্থীদের কীভাবে কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, তাদের কী প্রশ্ন করা হবে ইত্যাদি সামগ্রিক বিষয় পরিকল্পনায় থাকতে হবে।

**শিখনফল সম্পর্কে ধারণা দেয়াঃ** বক্তৃতার শুরুতেই পাঠে কী কী বিষয় আলোচিত হবে এবং তার শিখনফল কী হবে শিক্ষার্থীদের তার ধারণা দিতে হবে।

**পথ নির্দেশঃ** বক্তব্যের মাঝে যখন একটা অংশের আলোচনা শেষ হবে তখন একটু থেমে এতক্ষণ কী কী বিষয় আলোচিত হলো এবং এরপর আর কী কী বিষয় আলোচিত হবে তা শিক্ষার্থীদের জানাতে হবে। ফলে শিক্ষার্থীরা বক্তব্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে সংযোগ করতে পারবে।

**পুনরালোচনাঃ** বক্তব্যের শেষে পুরো আলোচনার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে পুনরায় শিক্ষার্থীদের সামনে আলোচনা করতে হবে। এটা আলোচনার সারবস্তু বুঝতে এবং মনে রাখতে সহায়তা করবে।

**উপস্থাপনঃ** কথা বলতে হবে সহজ ও  শিক্ষার্থীদের বোধগম্য ভাষা ব্যবহার করে। উচ্চারণ হতে হবে স্পষ্ট। বক্তব্য উপস্থাপনের সময় বাস্তবভিত্তিক দৃষ্টান্ত, অভিজ্ঞতার বর্ণনা, প্রশ্নোত্তর বিনিময়, রসাত্মবোধক আলোচনা ইত্যাদি কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে।

**প্রকাশভঙ্গিঃ** শিক্ষকের প্রকাশভঙ্গি হতে হবে আকর্ষণীয়। বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী কণ্ঠস্বরের ওঠানামা, অঙ্গভঙ্গির ব্যবহার, অভিনয়, বিষয়বস্তুর চিত্রধর্মী বর্ণনা ইত্যাদি কৌশল শিক্ষার্থীর কাছে বিষয়বস্তুকে উপভোগ্য করে তোলে এবং শিক্ষার্থীর শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়।

**চোখের মাধ্যমে যোগাযোগঃ** শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর প্রতি সমান গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকের আন্তরিকতা ও আগ্রহ প্রকাশ করতে হবে। এজন্য সব সময় শিক্ষার্থীদের সাথে চোখের মাধ্যমে যোগাযোগ (eye contact) রাখতে হবে।

**সক্রিয়তাঃ** শিক্ষার্থীদের পাঠে সক্রিয় করতে হবে। এজন্য আলোচনার মাঝেমাঝে বিরতি দিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার সুযোগ দিতে হবে এবং চিন্তা করতে উৎসাহিত করতে হবে।

**সহায়ক উপকরণ ব্যবহারঃ** মৌখিক বক্তব্য বা বর্ণনাকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য ও বিষয়বস্তুর ধারণাকে পরিষ্কার করার জন্য শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবহার এবং বোর্ডের ব্যবহার বাড়াতে হবে। এতে শিক্ষার্থীর মনে একঘেয়েমি, অবসাদ, ক্লান্তি ও অমনোযোগিতার সৃষ্টি হবে না।

**প্রদর্শন পদ্ধতি**

কোনো বস্তু বা ঘটনাকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপনের একটি পদ্ধতি হচ্ছে প্রদর্শন পদ্ধতি। শিক্ষার্থীদের সামনে পাঠের কোনো বিষয়, ঘটনা বা তত্ত্বকে প্রয়োজনীয় উপকরণের সাহায্যে বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য প্রদর্শন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বিষয়টি দেখানোর সাথে সাথে শিক্ষক মৌখিক বিবৃতির মাধ্যমে তা শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেন। এর মূল উদ্দেশ্য হলো পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের বাস্তবভাবে দেখিয়ে তা ভালোভাবে বুঝতে সহায়তা করা।

এই পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যাপক। সকল বয়সের এবং সকল বিষয়ের শিক্ষার্থীর জন্যই প্রদর্শন পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে পারে। তবে সাধারণত বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরি বিষয়ের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ অনেক বেশি। তবে প্রদর্শন পদ্ধতিতে দুটি দিক রয়েছে। যথা: (ক) পদ্ধতিগত দিক (খ) ফলাফলগত দিক। পদ্ধতিগত দিক প্রদর্শনের জন্য শিক্ষক কোন নির্দিষ্ট বিষয় কীভাবে সম্পন্ন করা হয় তার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া দেখান পক্ষান্তরে ফলাফলগত দিকে শিক্ষক কোনো বিষয় বা প্রক্রিয়ার ফলাফল শিক্ষার্থীদের দেখান।

– **প্রদর্শন পদ্ধতির ভিত্তি**

প্রদর্শন পদ্ধতি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি এবং এতে শিখনের আচরণবাদ তত্ত্বের প্রতিফলন দেখা যায়। প্রদর্শনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা এবং হাতে-কলমে কিছু করার সুযোগ নেই। শিক্ষক নির্দিষ্ট ঘটনা বা বিষয়কে প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করেন। শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসেবে তা দেখে এবং শোনে। এখানে শিখনের বিষয়বস্তুই মুখ্য। শিক্ষার্থী বিষয়টি কতটুকু বুঝতে পেরেছে এবং তার শেখার ধরনের সাথে এটি সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা বিবেচ্য নয়। শিক্ষক যেভাবে দেখিয়েছেন এবং বলেছেন তা মুখে বর্ণনা করতে বা লিখতে পারলেই মনে করা হয় যে শিক্ষার্থী শিখেছে। অর্থাৎ তার আচরণের পরিবর্তন ঘটেছে।

– **প্রদর্শন পদ্ধতির সুবিধা**

প্রদর্শন পদ্ধতি শিক্ষককেন্দ্রিক সনাতন পদ্ধতি হলেও নিম্নোক্ত কারণে এটি শিখন শেখানোর পদ্ধতি হিসেবে এখনো সমাদৃত:

**প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ:** প্রদর্শন পদ্ধতিতে পুরো বিষয় বা ঘটনাতে কী হচ্ছে বা না হচ্ছে তা শিক্ষার্থীদের দেখানোর পাশাপাশি প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করা হয়। ফলে প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা কিছুটা হলেও বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পায় এবং উৎসাহ বোধ করে। এতে শিখন অপেক্ষাকৃত অধিক স্থায়ী হয়।

**দুর্বোধ্য বিষয়কে সহজে উপস্থাপন:** এমন কিছু বিষয় বা ঘটনা যা মৌখিক বিবৃতির মাধ্যমে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়, আবার নিজের চোখে না দেখলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে হাতে-কলমে তা করা সম্ভব নয়। এ ধরনের বিষয়বস্তু উপস্থাপনের ক্ষেত্রে প্রদর্শন পদ্ধতি কার্যকর। যেমন- যন্ত্রের কারিগরি প্রক্রিয়া প্রদর্শন পদ্ধতিতে খুব চমৎকারভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা সম্ভব।

**উপকরণ স্বল্পতা:** হাতে-কলমে কাজ করার জন্য সকল শিক্ষার্থীর জন্য পর্যাপ্ত উপকরণ না থাকলে প্রদর্শন পদ্ধতি একটি উত্তম বিকল্প হতে পারে। এতে শিক্ষক অল্প উপকরণ দিয়ে বিষয়বস্তু সকল শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করতে পারেন। পরবর্তীকালে পর্যাপ্ত উপকরণ থাকলে শিক্ষার্থীরা সকলে প্রক্রিয়াটি অনুশীলন করতে পারে।

– **প্রদর্শন পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা**

প্রদর্শন পদ্ধতির বেশ কিছু অসুবিধা রয়েছে। অসুবিধাগুলো হলো-

**শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার অভাব:** প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষকই সক্রিয় থাকে, শিক্ষার্থী নয়। ফলে সক্রিয়তার অভাবে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও উৎসাহ কমে যায়। তাছাড়া সক্রিয় শিখনের সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হয়। ফলে শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

**সময়স্বল্পতা:** প্রদর্শন পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের প্রস্তুতি ও প্রদর্শনের জন্য বেশ সময়ের দরকার। ফলে শ্রেণি কার্যক্রমের সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে এই পদ্ধতিতে পাঠদান করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না।

**উপকরণের অভাব:** এই পদ্ধতিতে পাঠদানের জন্য প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ দরকার। কিন্তু আমাদের মত দেশে উপকরণের অপ্রাতুলতা কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রদর্শন পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।

**সকল ক্ষেত্রে উপযোগী নয়:** সকল বিষয়ের জন্য প্রদর্শন পদ্ধতি উপযোগী নয়। আবার আমাদের মত দেশে যেখানে শ্রেণিকক্ষের স্বল্প পরিসরে অনেক শিক্ষার্থী সেখানে প্রদর্শন পদ্ধতিতে পাঠদান সম্ভব নয়।

*প্রদর্শন পদ্ধতিকে কার্যকর করে তোলার উপায়*

কিছু অসুবিধা থাকলেও শিখন-শেখানোর জন্য প্রদর্শন একটি কার্যকরী পদ্ধতি। শিশুদের শিক্ষণে অনেক ক্ষেত্রেই প্রদর্শন সহায়ক। কারণ তারা প্রদর্শনের মাধ্যমে অনেক কিছু শিখে থাকে। প্রশিক্ষণেও প্রদর্শন পদ্ধতিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। তবে অসুবিধাসমূহ দূর করে প্রদর্শনকে কার্যকর করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করা দরকার:

**পূর্বপ্রস্তুতি নেয়া:** প্রদর্শনের পূর্বে কক্ষটি যথাযথভাবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দিয়ে কিংবা সরঞ্জাম দিয়ে সাজাতে হবে। শিক্ষার্থীদের কক্ষ সাজানোর কাজে যুক্ত করতে পারেন। এক্ষেত্রে পরীক্ষণ উপকরণ, মডেল, চার্ট ইত্যাদি এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন সকল শিক্ষার্থী দেখতে আরে।

**পূর্বনির্দেশনা প্রদান:** প্রদর্শনের পূর্বে কী প্রদর্শন করা হবে, কী পর্যবেক্ষণ করতে হবে, প্রদর্শনের উদ্দেশ্য, কী কী ধাপে প্রদর্শন কার্যক্রম অগ্রসর হবে, শিক্ষার্থীদের করণীয় কী ইত্যাদি আগেই শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলতে হবে।

**বিষয় সীমিত রাখা:** প্রদর্শনে খুব বেশি বিষয় যুক্ত না করে তা অল্পে সীমিত রাখতে হবে। বিষয়বস্তু অবশ্যই শিক্ষার্থীদের বয়স এবং বোধগম্যতার সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

**বর্ণনা প্রদান:** প্রদর্শনের সময় প্রত্যেকটি ধাপে ধাপে ধারাবিবরণীর মাধ্যমে কাজ এগিয়ে নিতে হবে। কঠিন বিষয়গুলোকে সহজ ভাষায় ব্যাখা করতে হবে। প্রয়োজনে উদাহরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা প্রদর্শনের ধাপগুলো অনুসরণ করছে কিনা তাও লক্ষ রাখতে হবে।

**নির্ভুলতা ও আকর্ষণ:** প্রদর্শন কাজে ব্যবহৃত উপকরণ যেন স্পষ্ট, নির্ভুল ও আকর্ষণীয় হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রদর্শন পরিচালনাকালে হঠাৎ অসুবিধা হতে পারে। যেমন, কোন যন্ত্র কাজ নাও করতে পারে।

**শিক্ষার্থীদের আলোচনায় যুক্ত করা:** প্রদর্শন শেষে শিক্ষার্থীদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে। তারা কী বিষয়ে শিখেছে তা আলোচনায় আনতে হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রশ্ন করার মাধ্যমে তাদের মূল্যায়ন করতে হবে।

**সারাংশ করা:** সবশেষে প্রদর্শন ও আলোচনার সারাংশ করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের সংক্ষেপে তা বুঝিয়ে বলতে হবে।

**আলোচনা পদ্ধতি**

আলোচনা বলতে সাধারণত ছোট বা বড় দলে একে অন্যের সাথে মতবিনিময় করাকে বোঝায়। এর মাধ্যমে বিতর্কিত বা কম মতৈক্য রয়েছে এমন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বা কোন সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে চিন্তা ও ভাবের বিনিময় ঘটে। সাধারণত শ্রেণিকক্ষের কোন একটি বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রমে সকলের মতামত বা আলাপচারিতার প্রয়োজন হলে আলোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এতে শিক্ষক সাধারণত আলোচনার সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ও আলোচনাকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং শিক্ষার্থীরা ঐ বিষয়ে চিন্তা করে, বিশ্লেষণ করে এবং তাদের মতামত প্রদান করে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী শুধু শিক্ষকের সাথেই আলোচনা করে তা নয়, শিক্ষার্থীকে শ্রেণিকক্ষের অন্যান্য শিক্ষার্থীর সাথেও মতামত বিনিময় করতে হয়। ফলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের প্রায় সমান সক্রিয়তা থাকে। তবে শিক্ষক চাইলে সঞ্চালক হিসেবে কোন শিক্ষার্থীকে দায়িত্ব দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাই অধিক থাকে। এই পদ্ধতিতে সকল শিক্ষার্থী প্রশ্ন করার, নিজস্ব ধারণা তৈরির এবং তা অন্যদের সাথে বিনিময় করার জন্য সমান সুযোগ পেয়ে থাকে। শিক্ষক এখানে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিয়ে থাকেন এবং কোনো প্রকার সমালোচনা না করে বরং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাকসহ শিক্ষার্থীদের মতামতগুলো গ্রহণ করে থাকেন।

- **আলোচনা পদ্ধতির ভিত্তি**

আলোচনা পদ্ধতি আচরণবাদ ও গঠনবাদ উভয় তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত। আলোচনার ক্ষেত্রে আগে থেকেই কিছু বিষয় নির্ধারণ করতে হয় যা আলোচনার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করে, যেমন- আলোচনার বিষয়বস্তু। স্কিনারের করণ সাপেক্ষণ তত্ত্ব অনুযায়ী এটি শিখনের (আচরণের) পূর্বগামী উপাদান, যা আলোচনার ক্ষেত্র এবং শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাত্রা নির্ধারণ করে দেয়। বিষয়টি শিক্ষার্থীদের পরিচিত হলে তাদের অধিক মাত্রায় সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে, কিন্তু বিষয়টি কম পরিচিত হলে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ এবং সক্রিয়তার মাত্রা কমে যাবে। আবার সঞ্চালক হিসেবে আলোচনাকে নিয়ন্ত্রণ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। যেমন: আলোচনা যদি নির্দিষ্ট বিষয়ের বাইরে চলে যায় তবে শিক্ষক সেক্ষেত্রে প্রশ্ন বা নির্দেশনার মাধ্যমে আলোচনাকে বিষয়কেন্দ্রিক রাখার চেষ্টা করেন। এটি আচরণবাদী চিন্তারই প্রতিফলন। তবে বিষয় যাই হোক শিক্ষার্থীরা পূর্বজ্ঞান, বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার আলোকে পারস্পরিক আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে, নিজেদের চিন্তা বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের জ্ঞানের গঠন ও পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে নিজস্ব ধারণা তৈরির সুযোগ পান। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের মত করে বিষয়বস্তু বুঝতে পারে। শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ভাষা এবং সামাজিক ও সামষ্টিক কার্যাবলির মাধ্যমে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শিখতে পারে। সেদিক থেকে আলোচনা পদ্ধতিতে শিখনের গঠনবাদ তত্ত্বের প্রতিফলন ঘটে।

– **আলোচনা পদ্ধতির সুবিধা**

আলোচনা পদ্ধতির সুবিধাগুলো হলো-

**বিষয়বস্তু ভালোভাবে আত্মস্থ করতেঃ** কোন একটি বিষয় ভালোভাবে আত্মস্থ করার জন্য আলোচনা খুবই কার্যকর পদ্ধতি। আলোচনার ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা পায় এবং উপলব্ধি গভীর হয়। তাছাড়া এটি পূর্ববর্তী শিখনের ফলাবর্তন হিসেবে কাজ করে।

**সক্রিয় শিখনের উপযোগীঃ** আলোচনা শিক্ষার্থীদের চিন্তা করতে ও নিজস্ব মতামত প্রদানে উৎসাহী করে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা গঠন করতে পারে।

**বিতর্কিত এবং সমস্যাকেন্দ্রিক বিষয় উপযোগীঃ** যেসব বিষয় নিয়ে বিতর্ক বা কম মতৈক্য রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আলোচনার বিকল্প নেই। সমস্যাকেন্দ্রিক বিষয় যার সরল ও সাধারণ কোন উত্তর নেই তেমন বিষয়ের জন্য আলোচনা পদ্ধতি অপরিহার্য। যেমন- 'বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমাধানে করণীয় কী?' এ ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে আলোচনা সর্বোত্তম পদ্ধতি।

**সামাজিক দক্ষতা বিকাশে সহায়কঃ** আলোচনায় অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীদের আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতার বিকাশ ঘটে। পরস্পরের সাথে মেশার ও দলগত কাজ করার, অন্যের মতামত শোনার ও গ্রহণ করার এবং দ্বন্দ্ব বা মতনৈক্য দূর করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আলোচনা সঞ্চালন, দলীয় নেতৃত্ব, দ্বন্দ্ব নিরসন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটে।

– **আলোচনা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা**

আলোচনা পদ্ধতির অসুবিধাগুলো হলো-

**সময়সাপেক্ষঃ** আলোচনায় যেহেতু অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বেশি থাকে এবং বিভিন্ন জন মতামত প্রদান করে, তাই এটি সময়সাপেক্ষ। ফলে সময় স্বল্পতা থাকলে আলোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না।

**সকলের জন্য উপযোগী নয়ঃ** আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক চিন্তার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। না হলে আলোচনা পদ্ধতি ফলপ্রসূ হয় না। তাই যেসব ছোট শিশু এখনো যৌক্তিক চিন্তা করার মত স্তরে পৌছেনি তাদের জন্য এই পদ্ধতি উপযোগী নয়। তাছাড়া আত্মকেন্দ্রিক ও লাজুক শিক্ষার্থীরা অনেক সময় আলোচনায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে। দলের সদস্যরা ঠিকমতো কাজ না করলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা নতুন শিক্ষকদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

**বিষয় বিচ্যুতির সম্ভাবনাঃ** কিছু কিছু শিক্ষার্থী আলোচনাকে প্রভাবিত করে নিজেদের মতামত চাপিয়ে দিতে পারে। আবার কখনো কখনো আলোচনা মূল বিষয় থেকে বিচ্যুত হতে পারে। এক্ষেত্রে সঞ্চালক দক্ষতার সাথে শিক্ষার্থীদের মূল আলোচনায় ধরে রাখতে না পারলে আলোচনা ফলপ্রসূ হয় না।

*আলোচনা পদ্ধতিকে কার্যকর করার উপায়*

যদিও আলোচনা পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা উভয়ই রয়েছে। তবে সঠিক উপায় ও কৌশল অনুসরণ করে আলোচনা পদ্ধতিকে কার্যকর করে তোলা যায়।

**পরিকল্পনা:** আলোচনা শুরুর আগেই কী বিষয়ে আলোচনা হবে, কত সময় ধরে হবে, অংশগ্রহণকারী ও সঞ্চালক কারা থাকবে, কীভাবে আলোচনা পরিচালিত হবে তার একটি সার্বিক পরিকল্পনা করে নিতে হবে। এছাড়া আলোচনা কীভাবে অগ্রসর হবে তারও একটি গাইডলাইন আগে থেকেই ঠিক করে নিতে হবে।

**বসার ব্যবস্থা:** আলোচনার জন্য উপযোগী বসার ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণত বৃত্তাকার বা ইউ (U) আকৃতির আসন ব্যবস্থা আলোচনার জন্য উপযোগী। কারণ এতে প্রত্যেকে প্রত্যককে দেখতে পায় এবং মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ পায়।

**আলোচনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান:** আলোচনা শুরুর আগে আলোচনার বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে হবে। কে আলোচনা পরিচালনা করবে, কীভাবে পরিচালিত হবে, অংশগ্রহণকারীরা কীভাবে সাড়া দিবে, প্রশ্ন থাকলে কীভাবে উত্থাপন করবে ইত্যাদি সম্পর্কে শুরুতেই অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দিতে হবে। তাছাড়া তাদেরকে মানসিকভাবে আলোচনার জন্য প্রস্তুত করতে হবে।

**সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা:** আলোচনা ফলপ্রসূ হয় সকলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। তাই সঞ্চালককে নিজের মতামত না দিয়ে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। কোন শিক্ষার্থী আলোচনায় অংশগ্রহণ না করলে সম্পূরক প্রশ্ন বা প্রণোদনার মাধ্যমে তাকে আলোচনায় সক্রিয় করতে হবে। এটাও লক্ষ রাখতে হবে যে কোনো একজন শিক্ষার্থী যেন অন্যদের ওপর কর্তৃত্ব না করে বা তার মতামত চাপিয়ে না দেয়।

**আলোচনার প্রবাহ ঠিক রাখা:** লক্ষ রাখতে হবে যে আলোচনা যেন আলোচ্য বিষয়ের বাইরে চলে না যায়। এমন হলে সঞ্চালক প্রশ্ন করে বা আলোচনার বিষয় মনে করিয়ে দিয়ে আলোচনাকে বিষয়বস্তুর মধ্যে ধরে রাখবেন। সঞ্চালক আলোচনার শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন। তিনি লক্ষ রাখবেন আলোচনা যেন বিতর্কে পরিণত না হয় এবং একসাথে একাধিকজন কথা না বলে।

**সারসংক্ষেপ করা:** আলোচনার শেষ পর্যায়ে সঞ্চালকের/শিক্ষকের করণীয় হচ্ছে আলোচনার সারসংক্ষেপ বা পাঠের মূলভাব বের করে আনা। শিক্ষক সংক্ষেপে শিক্ষার্থীদের সামনে মূলভাব উপস্থাপন করে আলোচনার সমাপ্তি টানবেন।

যদিও আলোচনা পদ্ধতিতে তুলনামূলকভাবে বেশি সময়ের প্রয়োজন তথাপি যদি শিক্ষক মাঝেমধ্যে এ ধরনের আলোচনার ব্যবস্থা করেন তাহলে শিখন শেখানো কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আসবে। সেইসাথে শিক্ষার্থীরাও একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাবে।

**সমস্যা সমাধান পদ্ধতি**

সমস্যা সমাধান এমন একটি পদ্ধতি যেখানে শিক্ষার্থীদের পাঠ সংশ্লিষ্ট কোন একটি সমস্যা দেয়া হয় এবং শিক্ষার্থীরা নিজেদের চেষ্টায় তা সমাধান করে। এই সমাধান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের যে অভিজ্ঞতা অর্জন হয় তাই তাদের শিখন হিসেবে কাজ করে। এই ধরনের সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন দক্ষতা অনুশীলনের সুযোগ পায়। এর মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের উপযোগী করে তোলা। কারণ দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হই এবং এসব সমস্যা নিজেদেরই সমাধান করতে হয়। এসব সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে আমরা নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হই। সম্ভাব্য সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাই, এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই সে সমস্যা সমাধান করি। আমরা বাস্তব জীবনে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হই, তার সমাধান করতে হলে

শিক্ষার মধ্য দিয়েই চলবে তার প্রস্তুতি পর্ব। সুতরাং শ্রেণিকক্ষের স্বাভাবিক পরিবেশে শিক্ষকনির্ভর না হয়ে শিক্ষার্থীদের নিজেদের চেষ্টায় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এই পদ্ধতির প্রবর্তক জন ডিউই।

কোন একটি বিষয়কে সমস্যার আকারে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত করলে তাদের চিন্তাশক্তি উদ্দীপ্ত হয়। তাদের মনে সমস্যা সমাধানের আগ্রহ জন্মে। নানাভাবে বিষয়টিকে বিচার-বিবেচনা করে কীভাবে এর সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়, কী করে বিষয়টিকে আয়ত্ত করা যায় Problem Solving Method সেই পথের সন্ধান দেয়। সমস্যাকে সমাধান করতে হলে একটি নির্দিষ্ট পথ ধরে এগোতে হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি সমস্যাকে বেছে নিতে হবে। সমস্যাটি এমন হবে, যা শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের চেষ্টায় তার সমাধান করতে পারে ও সমাধানের মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ হবে। শিক্ষার্থীরা চিন্তা করে সমস্যার সমাধান করতে পারলে তাদের স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা বাড়বে। সমস্যা সমাধানের জন্য তৎপর হয়ে তা সমাধানের উপযোগী বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ করবে। সমস্যা সমাধানের উপযোগী সংগৃহীত তথ্য থেকে যে ধারণা হবে, তার মধ্য থেকে একটি ধারণাকে সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়রূপে গ্রহণ করবে। সমস্যা সমাধানের বিষয়টি চিন্তার জগতে সাধিত হলেও তার যেন একটা বাস্তব মূল্য থাকে। প্রয়োজন হলে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যেন তার উপযোগিতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

– **সমস্যা সমাধান পদ্ধতির ভিত্তি**

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে গঠনবাদ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যক্তির শিখন ঘটে গঠন ও পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে নিজের মত করে। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তু বা পাঠের চেয়ে ব্যক্তির চিন্তা প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থী যদি তার কাছে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা তৈরি করতে পারে এবং নিজের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে তবেই শিখন ঘটেছে বলে মনে করা হয়। আর এজন্য শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত করা প্রয়োজন। তাদেরকে এমন কাজের সাথে যুক্ত করতে হবে যাতে মন ও দেহ উভয়ই সক্রিয় হয়। সমস্যা সমাধান পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে সেই সুযোগটিই প্রদান করে।

জন ডিউই-এর মতে, সমস্যা সমাধানের পাঁচটি ধাপ আছে। এগুলো হলো-

**১. সক্রিয়তা-** সমস্যাটিতে শিক্ষার্থীর জন্য অভিজ্ঞতা অর্জনের মত অবস্থা থাকতে হবে, যাতে তার আগ্রহ থাকবে এবং কাজটি করার জন্য তাকে সক্রিয় করবে।

**২. সমস্যা-** সমস্যার সৃষ্টি হয় কাজের সুষ্ঠু সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি থেকে। সুতরাং এতে বাধা বা প্রতিবন্ধকতা থাকবে যা দূর করার চেষ্টা করবে শিক্ষার্থী।

**৩. তথ্য সংগ্রহ-** সমস্যাটি সমাধানের জন্য নানা সম্ভাব্য উপায়ের কথা চিন্তা করা হয়। সমস্যা সমাধানের এ স্তরকে তথ্য সংগ্রহ বলা যায়।

**৪. প্রকল্পন-** অনেক বিকল্প উপায় থেকে যেটিকে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় সেটিকে বেছে নেয়াকে বলে প্রকল্পন।

**৫. পরীক্ষণ-** সমাধান বেছে নেয়ার পর পরীক্ষা করে দেখতে হবে সমাধানটি কার্যকর কি না। কার্যকর হলে ধারণাটি নির্ভুল। আর যদি নির্ভুল না হয়, তবে অন্য বিকল্প আর একটি সমাধানকে একইভাবে পরীক্ষণ করে নিতে হবে।

– **সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সুবিধা**

সমস্যা সমাধান শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সুবিধা হলো-

**যৌক্তিক চিন্তার বিকাশে সহায়কঃ** সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে সমাধানের নানা উপায় নিয়ে শিক্ষার্থীদের ভাবতে হয়, যা তাদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটায়। এতে তাদের যৌক্তিক বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে। হাতে-কলমে কাজের অভিজ্ঞতা তাদের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিরও বিকাশ ঘটায়।

**আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়কঃ** এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিজে কাজ করার এবং সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা বাড়ে। ফলে শিক্ষার্থীরা আত্মনির্ভরশীল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

**জ্ঞানের মিতব্যয়ী ব্যবহারঃ** এ পদ্ধতি বাস্তব জীবনে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানকে পরিহার করে। কেবল প্রয়োজনীয় জ্ঞানই এক্ষেত্রে অনুশীলন করা হয়। ফলে জ্ঞানের মিতব্যয়ী ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া হাতে-কলমে শেখার ফলে শিখন স্থায়ী হয়।

**উৎসাহদায়কঃ** নিজের মত করে সমস্যা নিয়ে কাজ করার সুযোগ থাকায় এটি শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই উৎসাহদায়ক। সমস্যা সমাধানের জন্য বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের সুযোগ থাকায় শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুকে অধিক বাস্তবভিত্তিক ও ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে।

**সহায়কের ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করেঃ** এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীই সব কাজ করে। শিক্ষক কেবল শিক্ষার্থীকে গাইড করে। ফলে তা সহায়ক হিসেবে শিক্ষকের ভূমিকা পালনে সমর্থ করে।

– **সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা**

সমস্যা সমাধান পদ্ধতি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক হলেও বিদ্যমান ব্যবস্থার কারণে এর বেশ কিছু অসুবিধা দেখা যায়। যথা-

**সবক্ষেত্রে উপযোগী নয়ঃ** আমাদের পাঠ্যসূচি বহুলাংশে তত্ত্বনির্ভর। ফলে পাঠ্যসূচিভুক্ত বিষয়বস্তুর অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে এটি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

**সময়সাপেক্ষঃ** এ পদ্ধতি বাস্তবায়নে শ্রেণিকক্ষে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই খুব বেশি সময় প্রয়োজন। ফলে বিষয়বস্তুর বিশেষ কোন অংশের পেছনেই সময় চলে যায়। সমগ্র পাঠসূচি শেষ করা যায় না।

**সবসময় আগ্রহদায়ক নয়ঃ** এ পদ্ধতিতে যথাযথ সমাধান খুঁজে বের করতে শিক্ষার্থীরা ব্যর্থ হলে শিখনের প্রতি তাদের আগ্রহ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবার অনেক শিক্ষার্থীই নিষ্ক্রিয় শিখন পছন্দ করেন। ফলে সমস্যা সমাধানে তারা আগ্রহী হয় না।

**বাস্তবায়নে সমস্যাঃ** এ পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা সবসময় বজায় রাখা যায় না। আবার প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় এর মূল্যায়ন করা কঠিন।

*সমস্যা সমাধান পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগে করণীয়*

শিক্ষার্থীদের দিয়ে কার্যকরভাবে সমস্যা সমাধান পদ্ধতির বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করা যেতে পারে:

**সমস্যা উপস্থাপন:** যে বিষয়টি সমাধান করতে হবে তা সমস্যার আকারে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে যেন তাদের মধ্যে সেটি সমাধানের আগ্রহ জন্মে। তাছাড়া সমস্যাটি অবশ্যই শিক্ষার্থীদের জন্য চিন্তা উদ্দীপক হতে হবে।

**পথনির্দেশ:** সমস্যাটি সমাধান করার জন্য কীভাবে অগ্রসর হওয়া যায় অর্থাৎ কোন কোন ধাপে অগ্রসর হতে হবে তার একটি পথ নির্দেশ শিক্ষার্থীদের দিতে হবে।

**আগ্রহ ধরে রাখা:** সমস্যাটি সমাধান করতে শিক্ষার্থীরা আগ্রাহী না হলে বা সমাধান খুঁজে পেতে দেরি হলে যেন আগ্রহ হারিয়ে না ফেলে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। শিক্ষার্থীরা হতোদ্যম হলে সাহস ও উৎসাহ দিয়ে তাদের আগ্রহ ধরে রাখতে হবে।

**নিয়মিত আপডেট জানা:** শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধানের জন্য কী কাজ করছে, কতটুকু অগ্রসর হয়েছে, কী কী তথ্য পেয়েছে ইত্যাদি সম্পর্কে আগ্রাহী হয়ে নিয়মিত খোঁজখবর রাখতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা যেমন উৎসাহ পাবে, তেমনি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তা দেয়া যাবে।

**ফলাফল উপস্থাপন:** সমস্যা সমাধানের পর এর প্রক্রিয়া ও ফলাফল অন্যদের সামনে উপস্থাপনের জন্য শিক্ষার্থীদের আহবান জানাতে হবে। এতে করে তার কী অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং কী পেয়েছে তা অন্যরা জানতে পারবে। এছাড়া এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী কী শিখেছে তাও উপস্থাপন করতে বলা হলে স্বচিন্তন ক্ষমতা বাড়বে।

ডিউই-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল কর্মকেন্দ্রিক। শিশুরা কাজ করতে করতে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সেখান থেকে শেখার চেষ্টা করে। আর এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষার্থী যাতে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে নিরুৎসাহিত হয়ে না পড়ে সেদিকে শিক্ষককে লক্ষ রাখতে হবে।

**প্রজেক্ট পদ্ধতি**

প্রজেক্ট হচ্ছে একটি সমস্যামূলক কাজ, যা স্বাভাবিক পরিবেশে সম্পন্ন হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সমস্যামূলক কাজ দেয়া হয় এবং শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের বাইরে স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে সেই সমস্যার সমাধান করে। ডা. কিলপ্যাট্রিক জন ডিউই-এর সমস্যা সমাধান পদ্ধতিকে কিছুটা পরিবর্তন করে প্রজেক্ট পদ্ধতির পরিকল্পনা করেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাস্তব পরিবেশে শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। একটি প্রজেক্ট শিক্ষার্থীরা একটি ছোট দলে বা শ্রেণির সকলে মিলে করতে পারে, আবার কোন শিক্ষার্থী একাও করতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কোন বিষয় আঁকতে দেয়া, কোন বিষয়ের ওপর লিখতে দেয়া, কোন বিষয় পর্যবেক্ষণ ও তার ওপর প্রতিবেদন করা, কোন কিছু তৈরি করতে দেয়া, বাগান করা ইত্যাদি প্রজেক্ট হিসেবে দেয়া যেতে পারে।

– **প্রজেক্ট পদ্ধতির ভিত্তি**

প্রজেক্ট পদ্ধতিতে গঠনবাদ ও কোলবের অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন তত্ত্বের প্রতিফলন দেখা যায়। গঠনবাদ অনুযায়ী কোন একটি কাজে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ধারণা গঠন ও পুনর্গঠন লাভ করে। প্রেক্ষাপটের ওপর ভিত্তি করে বিষয়টির নিজের মত করে একটি ধারণা তৈরি করে। অপরদিকে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন তত্ত্ব অনুসারে অভিজ্ঞতাই শিক্ষার্থীদের কোন বিষয় শেখার সুযোগ করে দেয়। শিক্ষার্থীরা যখন কোন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে তখন তারা এর কারণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে,

যেমন- কেন ঘটলো, কীভাবে ঘটলো ইত্যাদি। এরপর ভাবে তাহলে কীভাবে কাজটি করলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যেতে পারে ও সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা করে। পরবর্তী কালে তাদের সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করে দেখে যে কাঙ্ক্ষিত ফললাভ হয় কিনা। নাহলে প্রয়োজনীয় কারণ খোঁজাপূর্বক পরিকল্পনা সংশোধন করে পুনরায় তা বাস্তবায়ন করে। এভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয় শেখে। প্রজেক্ট পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের এ ধরনের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দিয়ে তাদের শিখনে সহায়তা করে।

একটি প্রজেক্ট বাস্তবায়নের চারটি স্তর রয়েছে। সেই স্তরগুলো হচ্ছে-

১. **শিখনফল নির্ধারণঃ** প্রজেক্টের শুরুতেই এর উদ্দেশ্য বা শিখনফল ঠিক করে নিতে হয়। অর্থাৎ প্রজেক্টটি বাস্তবায়ন করলে কী অর্জিত হবে প্রথমেই তা নির্ধারণ করে নিতে হবে।

২. **পরিকল্পনা প্রণয়নঃ** প্রজেক্টটি কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায়- অর্থাৎ সমস্যার সমাধান কীভাবে হয়। একে বলা হয় পরিকল্পনার স্তর। এই স্তরে কাজটি কীভাবে করা হবে, কয়টি ভাগে ভাগ করা হবে, কে কতটা কাজ করবে, কাজের বিভিন্ন অংশ সম্পাদনের জন্য কীভাবে দল গঠন করা হবে, কাজটি কোথায় হবে, এর জন্য কী কী লাগবে, তা ঠিক করে নেয়া হবে।

৩. **প্রজেক্ট বাস্তবায়নঃ** এরপর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে কাজটি বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য সবাই কাজ করবে। এই স্তরকে বলা যায় বাস্তবায়ন স্তর।

৪. **প্রজেক্ট পর্যালোচনাঃ** কাজটি সম্পাদনের পর আসবে এর বিচারের স্তর। যে কাজটি বা সমস্যাটি সমাধান করা হলো, তা কতটা সফল হয়েছে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজটি শুরু করা হয়েছিল তা সিদ্ধ হয়েছে কি না, ত্রুটি-বিচ্যুতি কী রইল, কী শিক্ষা হলো, সে সম্পর্কে সবাই মিলে আলোচনা করবে, মূল্যায়ন করবে।

প্রজেক্ট নানা ধরনের হতে পারে। যেমন-

**উৎপাদনমূলক প্রজেক্টঃ** বিদ্যালয়ের লাইব্রেরি স্থাপন, বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি প্রকল্প এই শ্রেণির অন্তর্গত।

**উপভোগমূলক প্রজেক্টঃ** বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি, সংগীত ও নাটকের আয়োজন, শিক্ষামূলক ভ্রমণ এই শ্রেণিভুক্ত।

**সমস্যামূলক প্রজেক্টঃ** নিরক্ষরতা দূরীকরণে শিক্ষার্থীরা কীভাবে সাহায্য করতে পারে, পানি দূষণ রোধে ইত্যাদি এই প্রকল্পের শ্রেণিভুক্ত।

**অনুশীলনমূলক প্রজেক্টঃ** কবিতা মুখস্থ করা, বারবার অঙ্ক করা, বার বার টাইপ করা প্রভৃতি এই শ্রেণিভুক্ত।

**একটি প্রজেক্টের উদাহরণ**

**প্রজেক্ট নাম : এসো বাগান করি**

**শিখন ফল :**

১. শিশুরা বাগান করতে পারবে।

২. গাছপালা ও পশুপাখির প্রতি যত্নশীল হবে।

**পরিকল্পনা প্রণয়ন :**

শিশুরা দলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। পরিকল্পনা প্রণয়নে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করবে তাহলো–

- বাগান করার প্রক্রিয়া বিষয়ে শিশুরা পরস্পর আলোচনা করবে।
- শিশুরা কয়েকটি দলে ভাগ হবে।
- প্রতিটি দলের একজন দলনেতা নির্বাচন করবে।
- বাগানের জায়গা নির্বাচন করবে।
- বীজ নির্বাচন, বীজ বপনের স্থান নির্ধারণ, বীজ বপনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে (প্রয়োজনে টবে বীজবপন করাযেতে পারে)
- দলে শিশুদের নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করবে।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্বাচন এবং উপকরণ সংগ্রহের উপায় ও উৎস নির্ধারণ করবে।

**প্রজেক্ট বাস্তবায়ন**

- প্রথমে শিশুরা বাগানের জন্য নির্বাচিত জায়গা পরিষ্কার করবে।
- শিশুরা দলে বীজ বপনের জন্য মাটি প্রস্তুত করবে। বীজ বপন করবে ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি দেবে।
- স্থানটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং সম্ভব হলে বীজ বপনের স্থানটি ঘেরা দেয়া যেতে পারে।
- প্রতিদিন শিশুরা বীজ বপনের স্থান পর্যবেক্ষণ করবে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি দেবে।
- প্রতিদিন পরিবর্তনগুলো পর্যবেক্ষণ করবে।
- অঙ্কুরোদগম হবার পর শিশুরা অঙ্কুর নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। অঙ্কুর থেকে কীভাবে পাতা হয় তাপ্রতিদিন লক্ষ করবে।
- নিয়মিত বাগানে পানি দিবে ও আগাছা পরিষ্কার করবে।
- শিশুরা বীজ বপন থেকে শুরু করে পাতা হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপের ধারাবাহিক চিত্র আঁকবে। দলগতভাবেতাদের কাজ উপস্থাপন করবে।
- ধারাবাহিক পরিবর্তনগুলো নিয়ে আলোচনা করবে।

**প্রজেক্ট পর্যালোচনা**

- কীভাবে বাগানের জায়গা নির্বাচন ও প্রস্তুত করতে হয় শিশুরা তা আলোচনা করবে।
- কীভাবে একটি বীজ থেকে অঙ্কুর হয় সেখান থেকে পাতা হয় তা নিয়ে শিশুরা আলোচনা

করবে।

- উদ্ভিদ আমাদের কী কী উপকারে আসে তা নিয়ে শিশুদের সাথে আলোচনা করুন।
- গাছের যত্ন নিতে শিশুদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- প্রজেক্টটি থেকে শিশুরা নতুন কী কী শিখেছে?
- প্রজেক্টিটি বাস্তবায়ন করতে কোন বিষয়গুলো শিশুদের ভালো লেগেছে ও কোন কাজগুলো তাদের কাছেচ্যালেঞ্জিং মনে হয়েছে?

– **প্রজেক্ট পদ্ধতির সুবিধা**

প্রজেক্ট পুরোপুরি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ-

**সক্রিয় শিখন:** প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে কাজ করার মাধ্যমে শেখে। ফলে তারা দলগতভাবে স্বাভাবিক সামাজিক পরিবেশে সক্রিয়ভাবে একটি সমস্যামূলক কাজের সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায়।

**বিকাশের সহায়ক:** এই পদ্ধতি শিশুর প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। শিশুর স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতা ও সৃজনপ্রতিভার কারণে সে কাজ করতে চায়। ফলে এক্ষেত্রে শিশু নিজের আগ্রহেই কাজ করে। কাজের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বিষয় শেখে, যা শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে তরান্বিত করে। এছাড়া নিজে কাজ করে সমস্যা সমাধানের ফলে শিশু স্বনির্ভর হয়ে ওঠে।

**সামাজিক গুণাবলির বিকাশ:** এই পদ্ধতিতে শিশু অন্যদের সাথে কাজ করতে গিয়ে পরস্পর মেলামেশা, অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অর্জন করে। এছাড়া প্রকল্প রূপায়ণে শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষকের সান্নিধ্যে এসে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও প্রীতিপূর্ণ হয়।

**আনন্দময় শিক্ষা:** এ পদ্ধতিতে কাজের আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশু শিক্ষা লাভ করে। শিখন তাই উৎসাহব্যঞ্জক হয়। আনন্দময় পরিবেশে কাজ করে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়।

**জীবন দক্ষতা অর্জন:** এই পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানমূলক প্রজেক্ট সম্পাদন করে শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এসব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা জীবনের প্রয়োজনীয় নানা দক্ষতা অর্জন করে। ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে তারা ভয় পায় না।

**চিন্তাশক্তির বিকাশ:** সমস্যা সমাধানমূলক বা সৃজনমূলক প্রজেক্ট সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয়। ফলে এর মধ্য দিয়ে তাদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে। এছাড়া শিক্ষার্থীরাই তাদের কাজের মূল্যায়ন করে। এর ফলে নিজেদের কাজে ভালো-মন্দ বুঝতে শিখে ও বিচারশক্তি বৃদ্ধি পায়।

– **প্রজেক্ট পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা**

প্রজেক্ট পদ্ধতির বহুবিধ সুবিধা থাকলেও এর বেশ কিছু অসুবিধা রয়েছে। যথা-

**সবক্ষেত্রে উপযোগী নয়:** আমাদের পাঠ্যসূচি বহুলাংশে তত্ত্বনির্ভর। ফলে পাঠ্যসূচিভুক্ত বিষয়বস্তুর অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে এটি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

**সময়সাপেক্ষ:** এ পদ্ধতি বাস্তবায়নে একটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই অনেক সময় চলে যায়। ফলে পাঠ্যসূচির অন্তর্গত অনেক বিষয়বস্তুর পাঠদান সম্ভব হয় না।

**সবসময় আগ্রহদায়ক নয়:** এ পদ্ধতিতে যথাযথ সমাধান খুঁজে বের করতে শিক্ষার্থীরা ব্যর্থ হলে শিখনের প্রতি তাদের আগ্রহ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবার অনেক শিক্ষার্থীই নিষ্ক্রিয় শিখন পছন্দ করেন। ফলে সমস্যা সমাধানে তারা আগ্রহী হয় না।

**বাস্তবায়নে সমস্যা:** এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। আবার বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক সময়সূচি বা কর্মধারা বজায় রাখা যায় না।

**শিখন বৈষম্য:** এ পদ্ধতিতে সকল শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জনের সমান সুযোগ সৃষ্টি হয় না। কেউ কেউ বেশি সক্রিয় থাকে এবং বেশি শিখনের সুযোগ লাভ করে। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে সক্রিয়তার অভাবে শিখনের সুযোগ কম হয়।

**ভূমিকাভিনয়**

পাঠের কোন বিষয়কে শিক্ষার্থী অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরাই ভূমিকানয় পদ্ধতি। এর মাধ্যমে ইতিহাস, সাহিত্য ও সামাজিক বিষয়বস্ত খুব জীবন্ত করে উপস্থাপন করা যায়। সাধারণত শিক্ষকের নির্দেশনায় বিষয়টির বিভিন্ন ভূমিকায় শিক্ষার্থীরা অভিনয় করে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষার্থীরা নিজেরাও পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে কার কী ভূমিকা, কীভাবে তা ফুটিয়ে তুলবে ইত্যাদি ঠিক করে নিতে পারে। অভিনয় একক বা দলগত যেকোন ধরনের হতে পারে।

শিখনের ক্ষেত্রে এটি খুবই শক্তিশালী একটি পদ্ধতি। যদিও প্রাচীনকাল থেকেই শিখন শেখানোর কাজে ভূমিকাভিনয়ের ব্যবহার ছিল, তবে আধুনিক সময়ে মনোচিকিৎসক Dr. J. L. Moreno তাঁর রোগীদের চিকিৎসা করতে গিয়ে ১৯১০ সালে এই পদ্ধতিটির ব্যবহার শুরু করেন। ভূমিকাভিনয়ে যেহেতু একটি ঘটনাকে কৃত্রিমভাবে অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়, তাই কেউ কেউ একে একে সিমুলেশন পদ্ধতিও বলে।

– **ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির ভিত্তি**

প্রথমত ভূমিকাভিনয় বা চরিত্রাভিনয়কে দুই ভাগে করা যায়। যেমন-

**মহড়াভিত্তিক:** এই প্রক্রিয়ায় বিষয়টি আগে থেকেই জানানো থাকে ও অংশগ্রহণকারীগণ আগে থেকেই প্রস্তুতি নিতে পারে। এরপর অংশগ্রহণকারীগণ পূর্বের প্রস্তুতি অনুযায়ী অভিনয় করতে পারে এবং যে বিষয়ে বার্তা প্রদান করার উদ্দেশ্য থাকে সেই বার্তা প্রদান করা সম্ভব হয়।

**স্বতঃস্ফূর্ত:** এ পদ্ধতিতে উপস্থিতভাবে কোনো বিষয়কে বোঝানোর জন্য তা উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত হয় এবং অংশগ্রহণকারীগণ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বক্তব্য, চরিত্র ইত্যাদি নির্ধারণ করেন। এরপর তারা

স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনয় না করে প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণের মাধ্যমে (অভিনয় নয়) প্রদত্ত বিষয়টিকে ফুটিয়ে তোলেন। পরবর্তী সময়ে অন্য অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে ফিডব্যাক গ্রহণ করে মূল্যায়ন করা হয় ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা হয়।

– **ভূমিকাভিনয়ের সুবিধা**

শিখন শেখানোর উপায় হিসেবে ভূমিকাভিনয় খুবই স্বীকৃত একটি পদ্ধতি। এর সুবিধাগুলো হলো-

**সক্রিয়তা:** এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা শিখন প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। সক্রিয়তার কারণে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু খতিয়ে দেখার এবং ভাবনা-চিন্তার সুযোগ ঘটে। ফলে তারা বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারে ও শিখন দৃঢ় হয়।

**স্বতঃস্ফূর্ততা:** অভিনয়, অনুকরণ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ থাকে। ফলে এ ধরনের কাজে তারা আনন্দ পায় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে। ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি ব্যবহারে পাঠের একঘেয়েমিও দূর হয়।

**সম্পর্ক উন্নয়ন:** অভিনয়ের জন্য আলোচনা, পরিকল্পনা, অনুশীলন ইত্যাদি করতে গিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা পরস্পরের কাছাকাছি আসার সুযোগ তৈরি করে। ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, ভাবমূর্তি, সংবেদনশীলতা ইত্যাদির উন্নয়ন ঘটে, যা শিখন শেখানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা পালন করে।

**বিষয়বস্তুর জীবন্ত উপস্থাপন:** ভূমিকাভিনয় পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীদের অভিনয়ের মাধ্যমে বিমূর্ত বিষয়কেও জীবন্ত করে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। ফলে দর্শকদের কাছে বিষয়বস্তু খুব সহজে বোধগম্য হয়।

**আত্ম-উন্নয়ন:** ভূমিকাভিনয় পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু ভালোভাবে অনুধাবনের পাশাপাশি তাদের আত্মবিশ্বাস ও উপস্থাপন দক্ষতা দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তাদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হয়।

– **ভূমিকাভিনয়ের সীমাবদ্ধতা**

শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তাভিত্তিক ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির কিছু অসুবিধা রয়েছে। এগুলো হলো-

**সময়সাপেক্ষ:** ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির প্রস্তুতি ও উপস্থাপনের জন্য অনেক সময়ের দরকার। ফলে নিয়মিতভাবে এ ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়।

**পারদর্শী নির্দেশকের অভাব:** ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির যথাযথ উপস্থাপনের জন্য উচ্চযোগ্যতাসম্পন্ন ও পারদর্শী নির্দেশকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এমন শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব আছে। সঠিকভাবে নির্দেশনা দেয়া ও উপস্থাপন করা না গেলে শিখনের উদ্দেশ্য ব্যহত হতে পারে, এমনকি বিপরীতধর্মী ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

**সবক্ষেত্রে উপযোগী নয়:** সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি উপযোগী নয়। সাধারণত কলা ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা যায়। আবার আমাদের মত দেশে অধিক শিক্ষার্থীপূর্ণ শ্রেণিকক্ষের স্বল্প পরিসরে এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না।

**ভূমিকাভিনয়কে ফলপ্রসূ করার উপায়**

নিম্নোক্ত কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে ভূমিকাভিনয় পদ্ধতিকে ফলপ্রসূ করে তোলা যায়-

**উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা:**এই পদ্ধতিতে শিখন শেখানো কাজের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের কাছে ভূমিকাভিনয়ের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করা প্রয়োজন। এতে শিক্ষার্থীদের মনে অভিনয় করার উৎসাহ তৈরি হবে এবং বিষয়টি তারা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে গ্রহণ করবে।

**বিষয় নির্বাচন:** ভূমিকাভিনয়ের ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে সকল বিষয় ভূমিকাভিনয়ের জন্য উপযোগী নয়। সুতরাং ভূমিকাভিনয়ের জন্য উপযোগী পাঠ নির্বাচন করতে হবে। আবার পাঠের সাথে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বাদ দিয়ে, সুস্পষ্ট ও পাঠের সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয় ভূমিকাভিনয়ের জন্য বাছাই করতে হবে।

**শিক্ষার্থী নির্বাচন:** অভিনয়ের জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। অনেক সময় কোন শিক্ষার্থী একটি বিশেষ ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং এ ধরনের চাপ মোকাবেলা করে যে শিক্ষার্থী যে যেটি ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবে, সেভাবেই নির্বাচন করতে হবে।

**নির্দেশনা:** অভিনয়ের বিষয়টি বোঝানোর জন্য খোলা কাগজে স্পষ্ট হাতের লেখায় তথ্য উপস্থাপন করা প্রয়োজন। তথ্যের ব্যাখ্যা খুব সংক্ষিপ্ত রাখতে হবে। যেমন- যদি কোন ঘটনায় চারজনকে অভিনয়ের জন্য নির্বাচন করা হয়, তবে চারটি কাগজে যার যার ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। এতে কে কী অভিনয় করে দেখাবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য ও নির্দেশনা থাকবে।

**নিয়ন্ত্রণ:** ভূমিকাভিনয়ের সময় পরিস্থিতি যাতে ভিন্ন দিকে মোড় না নেয়, কিংবা বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। প্রয়োজনবোধে এরূপ পরিস্থিতিতে শিক্ষক নিজ কৌশলে নিয়ন্ত্রণ করবেন। তিনি কোন প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে গঠনমূলকভাবে বিষয়টি বুঝিয়ে দিবেন।

**পর্যালোচনা:** ভূমিকাভিনয় শেষে শিক্ষার্থীদের নিয়ে আলোচনা করে বের করতে হবে যে এর মাধ্যমে কী কী বিষয় জানা গেল। শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে তার সারাংশ শিক্ষক সবাইকে বুঝিয়ে বলবেন।

শিখন-শেখানোর জন্য এই পদ্ধতি খুবই কার্যকর এবং অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণে উপযোগী যদি প্রকৃত ভূমিকা চিত্রণ করা যায়, তবে অংশগ্রহণকারীগণ অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করে সহজভাবে শিখতে চেষ্টা করে। অনেকেই অভিনয় করতে কৌতূহল বোধ করে। কিন্তু যদি অভিনয় ও বার্তা যথার্থ না হয় তাহলে উদ্দেশ্য ব্যহত হতে পারে। এ জন্য যারা অংশগ্রহণ করে তাদের অভিনয়ের ওপরও শিখন কার্যক্রম নির্ভর করে। দক্ষতা ও মনোভাব পরিবর্তনের জন্য ভূমিকাভিনয় কার্যকরী পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এই পদ্ধতি শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের শিখন-শেখানোর জন্য অধিক উপযোগী।

– **শিখন শেখানোর কাজে ব্যবহৃত কৌশল**

শিখন শেখানো কৌশল মূলত পদ্ধতিরই অংশ। বিশেষ কোনো পদ্ধতির প্রয়োগ-যোগ্যতা বাড়াতে এবং সেটাকে আরো বেশি ফলপ্রসূ করে তুলতে সহায়ক হিসেবে নানা কৌশল ব্যবহার করা হয়। যেমন- বক্তৃতা পদ্ধতির একঘেয়েমি দূর করতে ও শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা বাড়াতে প্রশ্ন-উত্তর প্রক্রিয়াকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আবার আলোচনা পদ্ধতিতে ব্রেইন স্টর্মিংকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সাধারণত কোন একটা পাঠের ক্ষেত্রে মূল যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় সেটাই পদ্ধতি। আর ঐ পদ্ধতির সহায়ক হিসেবে অন্য এক বা একাধিক যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় তা কৌশল। সুতরাং কৌশল পদ্ধতির অধীনে ব্যবহৃত হয়। কোন একটি পদ্ধতি যদি আরেকটি পদ্ধতির সহায়ক ব্যবহৃত হয় তাহলে ঐ সহায়ক পদ্ধতিটি তখন কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয় (মালেক ও অন্যান্য, ২০০৯)।

## অন্যান্য পদ্ধতিসমূহ

### প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি

পাঠ উপস্থাপনে একটি বহুল ব্যবহৃত কৌশল। প্রায় সব পদ্ধতির সাথেই প্রশ্ন-উত্তর কৌশলের ব্যবহার করে শিখন শেখানো কার্যক্রমকে আরো বেশি ফলপ্রসূ করে তোলা যায়। এই পদ্ধতিতে পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয় এবং শিক্ষার্থীরা তার উত্তর দিতে চেষ্টা করে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা যেমন চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ হয়, তেমনি তাদের পাঠগত অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীর উত্তরের ভিত্তিতে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করতে এবং বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে পারে। তবে এ পদ্ধতির সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে প্রশ্ন করার দক্ষতা ও কৌশলের ওপর।

### পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণের ফলে শিখন অভিজ্ঞতা স্থায়ী ও পরিপক্ব হয়। এক্ষেত্রে পাঠ সংশ্লিষ্ট যেসব বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণযোগ্য তা শিক্ষার্থীদের দিয়ে পর্যবেক্ষণ করানো হয়। যেমন- শিশুদের আলো ও ছায়া সম্পর্কে ধারণা দিতে রোদ ও ছায়াময় জায়গায় নিয়ে গিয়ে তাদেরকে দিয়ে তা পর্যবেক্ষণ করানো যায়। এ ধরনের কৌশলের ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব হয়। তবে এ কৌশল অবলম্বনের ক্ষেত্রে কী পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং তার উদ্দেশ্য কী সে সম্পর্কে আগেই শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে অবহিত করতে হবে।

### অ্যাসাইনমেন্ট

অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে শিক্ষার্থীদের পাঠ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ দেয়া। যেমন, পাঠের কোন অংশ আগে থেকেই বাসায় পড়া, পাঠের ওপর নোট তৈরি করা, পাঠ সংশ্লিষ্ট কোন একটি ছবি এঁকে আনা। এর ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠ সম্পর্কে গভীরভাবে জানার ও স্বশিখনের সুযোগ লাভ করে। অ্যাসাইনমেন্ট একক বা দলগতভাবে দেয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কী করবে, কীভাবে করবে তা আগে থেকেই সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিতে হবে।

### বিতর্ক

বিতর্ক হলো পাঠসংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দুটি দলের আলোচনা। এই আলোচনায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি দল বিষয়টির পক্ষে এবং অপরটি বিষয়টির বিপক্ষে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করে। প্রত্যেক দলে ৩/৪ জন করে সদস্য এবং একজন দলনেতা থাকেন। এক্ষেত্রে একজন সঞ্চালক থাকেন যিনি বিতর্ক পরিচালনা করেন। বাকিরা দর্শক হিসেবে থাকে। বিতর্কের জন্য অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয় এবং চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ, ভাবনা-চিন্তা ও আলোচনার মধ্য দিয়ে বিষয় সম্পর্কে আলোচক ও দর্শকদের একটি সামগ্রিক ধারণা তৈরি হয়। বিতর্ককে প্রায় সকল পাঠের ক্ষেত্রে অন্য কোন পদ্ধতির সহায়ক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বিশেষ করে সামাজিক বিজ্ঞান, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে এটি কৌশল হিসেবে খুবই কার্যকর।

### পিয়ার টিউটরিং (Peer Tutoring)

এ ধরনের পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেরা তাদের সঙ্গীদলের (Peer Group) মধ্যে পরস্পর আলোচনা ও কাজ করার মাধ্যমে শেখে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ অগ্রসর শিক্ষার্থী, কেউ একটু পিছিয়ে পড়া। এক্ষেত্রে অগ্রসর শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে পারে। এছাড়া তাদের বিভিন্ন জনের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন ধরনের। সেসব অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ পেলে সকলেই সমৃদ্ধ হয়। সঙ্গীদলে শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণ খুবই কম। শিক্ষার্থীরাও কোথাও ঠেকে গেলে শিক্ষক তাদের সহায়তা করে মাত্র।

**জোড়া ও দলগত শিখন**

পাঠে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে জোড়া ও দলগত শিখন একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। জোড়া শিখনের ক্ষেত্রে দু'জন শিক্ষার্থীকে একটি কাজ দেয়া হয় এবং তারা যৌথ প্রচেষ্টায় পড়া, লেখা বা আলোচনার মাধ্যমে তার সমাধান করে। দলগত শিখনের ক্ষেত্রে ৪/৫ জন শিক্ষার্থীর একেকটি দলে একেকটি কাজ দেয়া হয় এবং তারা দলগত প্রচেষ্টায় তা সম্পন্ন করে। এ ধরনের জোড়া ও দলগত কাজের ফলে শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক আদান-প্রদান ও আলোচনার মাধ্যমে কোন বিষয়ে শিখতে পারে এবং তাদের মধ্যকার জড়তা কেটে সবাই মিলে কাজ করার মানসিকতা তৈরি হয়।

**ব্রেইন স্টর্মিং**

ব্রেইন স্টর্মিং বলতে কোন বিষয় নিয়ে ভাবার বা চিন্তা করার জন্য এক ধরনের উদ্দীপনা তৈরি করাকে বোঝায়। সাধারণত পাঠ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সামনে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে তা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবতে বলা হয়। পরে তাদের চিন্তার ফল বলে বা লিখে প্রকাশের সুযোগ দেয়া হয়। ব্রেইন স্টর্মিং দলগতভাবেও দেয়া যায়। এক্ষেত্রে পাঠের সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি কয়েকটি ছোট ছোট সমস্যায় বিন্যাস করে প্রতিটি দলকে আলাদা আলাদা সমস্যা নিয়ে ভাবতে দিতে হয়। এভাবে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ হয় ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে। পরবর্তীতে বিভিন্ন দলের ভাবনাগুলো বোর্ডে, খাতায় বা পোস্টার পেপারে লিখে দলগত উপস্থাপন করতে পারে। এর ফলে ঐ বিষয় সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা তৈরি হয়। আবার শিক্ষার্থীরা পাঠে অত্যন্ত সক্রিয় ও তৎপর থাকে।

**মাইন্ড ম্যাপিং**

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির কৌশল হিসেবে মাইন্ড ম্যাপিং কৌশলকে ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার সুযোগ থাকে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নির্দেশনা মত পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি ধারণা কাঠামো তৈরি করবে এবং শিখন লাভ করবে। যেমন- গ্রুপের বিষয়ের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দিবেন। পরে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে গল্পের কিছু তাৎপর্যমন্ডিত শব্দ নির্বাচন করে বোর্ডে লিখতে দিতে পারেন। আবার ঐ শব্দগুলোর আলোকে সারাংশ লিখতে পারেন। বোর্ডে লিখিত ঐ শব্দের আলোকে শিক্ষার্থীদের ধারণা জাগাতে গল্পটি সম্পর্কে একটি কাঠামো তৈরী করবে। শব্দগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যখন গল্পের বিষয়বস্তু নির্মাণ করবে তখন তাদের পূর্ববর্তী ধারণার মধ্যে সুস্পষ্টতা আসবে এবং শিখন অর্থপূর্ণ হবে। এই কৌশল শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল করে তোলে এবং তাদেরকে শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে সহায়তা করে। শ্রেণিতে পাঠদানের প্রয়োগযোগ্য কৌশলের মধ্যে এই কৌশলটি খুবই কার্যকর। এর মাধ্যমে

শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে সক্রিয়ভাবে চিন্তাভাবনা করার সুযোগ পায়। এই কৌশলের প্রয়োগে শিক্ষক এমন কোনো চিত্র বা ছবির অংশবিশেষ শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে পারেন যা দেখে শিক্ষার্থীরা এই চিত্র বা ছবি সম্পূর্ণকরণ করার চেষ্টা করতে পারেন। তবে এসব শব্দ, চিত্র, ছবি ইত্যাদি পাঠসংশ্লিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

**মডেলিং**

শ্রেণিকক্ষে পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণ বা বিভিন্ন পোশাক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারে। শিক্ষক এখানে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারেন। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ সহজে বোধগম্য হয়। কোন বিষয়বস্তুকে বাস্তবের অবিকল প্রতিচ্ছবি হিসেবে মডেলিংয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। যেমন, তৃতীয় শ্রেণির English for Today বইয়ে Teachering as an occupation সম্পর্কে একটি টেক্সট পড়ানোর সময় শিক্ষক নিজেকে মডেল হিসেবে শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপস্থাপন করতে পারেন।

**পোস্ট বক্স**

এটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক অত্যন্ত কার্যকরী একটি কৌশল। শিক্ষক বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্টকোন সমস্যা সমগ্র শ্রেণির নিকট উপস্থাপন করেন। এরপর শিক্ষার্থীরা এর উত্তর লিখে নির্দিষ্ট বক্সে ফেলবে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তরগুলো আলাদা আলাদা পোস্টবক্সে ফেলতে হয়। যেমন- ১নং প্রশ্নের উত্তর লিখিত কার্ডটি ১নং বাক্সে ২নং প্রশ্নের উত্তর লিখিত কার্ড ২নং বাক্সে ফেলতে হবে। এভাবে বিভিন্ন নম্বর দেওয়া বক্সে উত্তর ফেলবে এবং পরে সবকয়টি উত্তর একসাথে করে উপস্থাপন করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণিতে পাঠদানের সময় এই কৌশল প্রয়োগ করে কার্যকরী শিখনফল অর্জন করানো যায়।

## জিগস(Jigsaw)

শিক্ষক এই পদ্ধতিতে একটি বিষয়কে কয়েক ভাগে ভাগ করে একেক ভাগের দায়িত্ব একেকটি দলের ওপর দেন। দলীয় কাজের মাধ্যমে প্রতিটি অংশের ওপর কাজ সম্পন্ন করা হয়। এরপর দল ভেঙে প্রতিটি দল থেকে একজন করে সদস্য নিয়ে নতুন দল গঠন করা হয়। এই নতুন দলের প্রত্যেক সদস্য তার আগের দলে কী কাজ হয়েছে সে সম্পর্কে দলের অন্যদের অবহিত করে ও এরপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। এভাবে আলোচনার মাধ্যমে সামগ্রিক বিষয়টি সম্পর্কে প্রত্যেকের একটি ধারণা তৈরি হয়। এই কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে পাঠকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করে প্রতিটি খণ্ডিত কাজের পারস্পরিক সংযোগ সাধনের সুযোগ সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করেন।

**ধাঁধা**

এই কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সহজেই আকৃষ্ট ও কৌতূহলী হয়। এক্ষেত্রে পাঠের সংশ্লিষ্ট বিষয় দিয়ে কতকগুলো ধাঁধা তৈরি করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের তা সমাধান করতে বলা হয়। এই ধাঁধা প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তাশীল করে তোলা হয় এবং তাদের পারস্পরিক আলোচনা ও কাজের মাধ্যমে এর সমাধান করা হয়। এর ফলে শ্রেণিকক্ষে পাঠ গ্রহণে তাদের একঘেয়েমিভাব দূর হয় এবং পাঠে সক্রিয় থাকে।

**গল্পবলা**

শ্রেণি শিক্ষক বিষয় সংশ্লিষ্ট গল্প বলে পাঠের একঘেয়েমি দূর করতে পারেন। তবে নিচের শ্রেণির শিক্ষার্থীরা গল্প শুনতে বেশি ভালোবাসে এবং সেখানে কৌশলটি বেশি কার্যকর হয়। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরের

শিক্ষার্থীরা গল্প শুনতে বেশি আগ্রহী থাকে। কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা থিম ঠিক করে দিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে কল্পনা করে উপস্থিত গল্প বলার অভ্যাস করানো যায়।

**উদাহরণের সাহায্যে পাঠদান**

শিখনকে স্থায়ী করার আর একটি কৌশল হলো উদাহরণের সাহায্যে পাঠদান। পাঠদানের মাঝে মাঝে বিষয়বস্তুর সাথে সংযোগ সাধন করে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীরা পাঠে আগ্রহী হয়। এছাড়া উদাহরণ দিলে বিষয়বস্তু বোঝা শিক্ষার্থীদের পক্ষে সহজ হয়। তারা পাঠকে উদাহরণের সাথে সম্পর্কিত করে তাদের ধারণা গঠন করতে পারে। তবে উদাহরণ অবশ্যই প্রাসঙ্গিক ও সুস্পষ্ট অর্থবোধক হতে হবে।

**প্যানেল আলোচনা**

প্যানেল আলোচনা হলো আলোচনা পদ্ধতির প্রয়োগের একটি কার্যকরী কৌশল। প্যানেলে একজন নেতা নির্বাচন করতে হয়। নির্ধারিত বিষয়বস্তুটি প্যানেলে সদস্যবৃন্দ পরস্পর আলোচনা করেন। পাঠের বিষয়বস্তু প্যানেলে আলোচনা করে এবং আলোচিত বিষয়ে প্যানেল সদস্যবৃন্দ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে। প্যানেলে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কোন বিষয়ে উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়।

**মার্কেট প্লেস**

এই কৌশলে বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন দলে ভাগ করে দেয়া হয়। প্রতিটি দল তাদের বিষয় নিয়ে কাজ করার পর সেটি পোস্টারে/কার্ডে/চিত্রিতভাবে আকর্ষণীয় করে দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়। এরপর সকল দল ঘুরে ঘুরে তা দেখে ও আলোচনা করে নিজেদের ধারণা সুস্পষ্ট করে তোলে। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি খুবই অনুপ্রেরণামূলক ও সৃজনশীল কাজ। সাধারণত দলগত কাজ উপস্থাপনায় এটির প্রয়োগ করা হয়। এতে প্রতিযোগিতামূলক ভাব বিরাজ করে। সবাই সক্রিয় থাকে ও একঘেয়েমি দুর হয়।

শিখন শেখানোর কাজে কখনোই কোন বিশেষ পদ্ধতি এককভাবে সফল হতে পারে না বরং বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের সমন্বিত প্রয়োগের ফলেই শিখন শেখানো কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে।

## শিখন শেখানো পদ্ধতি নির্বাচন ও প্রয়োগে শিশুর ভিন্নতা

আমরা পূর্বের পাঠে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের কথা আলোচনা করেছি। আলোচনায় এসব পদ্ধতির ভিত্তির কথা বলেছি। আরও বলেছি যে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কোন ধরনের পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করবেন তা নির্ভর করে শিক্ষক কোন ধরনের দর্শন ও মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন তার ওপর। শুধু শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি নয়, পাঠের বিষয়বস্তুর ধরন, শ্রেণিকক্ষের আকৃতি, শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি ইত্যাদিও শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচনের নির্ধারক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এসবের বাইরেও যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো শিক্ষার্থীদের ভিন্নতা। বলা যায় শিখন শেখানো পদ্ধতি নির্বাচনে এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। কারণ শিখন শেখানো কার্যক্রম মূলত শিক্ষার্থীকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। সুতরাং তার স্বতন্ত্র চাহিদা সবার আগে বিবেচনা করা দরকার।

**পদ্ধতি নির্বাচনে ভিন্নতা বিবেচনা**

শিক্ষার্থীদের ভিন্নতা চিহ্নিতকরণ ও ভিন্নতা অনুযায়ী চাহিদা নিরূপণ পাঠে আমরা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের ভিন্নতার কথা বলেছিলাম। এগুলো হলো-

- শিক্ষার্থীদের শেখার ধরনগত ভিন্নতা
- শিক্ষার্থীদের পারগতার স্তরগত ভিন্নতা
- শিক্ষার্থীদের প্রতিবন্ধিতার কারণে সৃষ্ট ভিন্নতা
- শিক্ষার্থীদের আচরণগত ভিন্নতা
- শিক্ষার্থীদের জেন্ডার ভিন্নতা
- শিক্ষার্থীদের ভাষাগত ভিন্নতা
- শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতি, রীতিনীতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থাগত ভিন্নতা

শিক্ষার্থীদের শিখন শেখানো কার্যক্রমের পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে এসব ভিন্নতাকে বিবেচনা করা এবং সে অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করা প্রয়োজন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে শিক্ষার্থী দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হলে প্রদর্শন বা ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি তার ক্ষেত্রে মোটেই কার্যকর কোন পদ্ধতি নয়। কারণ এই দুই ক্ষেত্রেই দৃষ্টিশক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বক্তৃতা বা আলোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হলে শিক্ষার্থী তাতে সহজেই অংশগ্রহণ করতে পারে এবং বুঝতে পারে। কিন্তু শ্রবণ প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে এর বিপরীত ক্রম দেখা যায়। যেমন সে বক্তৃতা ও আলোচনা শুনতে পাবে না। কিন্তু প্রদর্শন বা ভূমিকাভিনয় করলে শিক্ষার্থী দেখে দেখে বিষয়টি বুঝে ফেলতে পারবে। একইভাবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, শিখন প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুর ক্ষেত্রে বক্তৃতা বা আলোচনা পদ্ধতির চেয়ে প্রদর্শন পদ্ধতি, ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি ও প্রজেক্ট পদ্ধতি অধিক কার্যকর। কারণ এ ধরনের শিশুর পক্ষে বক্তৃতা বা আলোচনা অনুসরণ এবং তাতে অংশগ্রহণ কষ্টসাধ্য। এর চেয়ে কোন বিষয় কীভাবে ঘটে বা কোন কাজ কীভাবে করতে হয় তা দেখলে তারা ভালো বুঝতে পারে। আবার নিজেরা অংশগ্রহণ ও হাতে-কলমে কাজ করার মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের মধ্য দিয়ে শিখতে তারা পছন্দ করে এবং শিখতে সমর্থ হয়।

একইভাবে আচরণগত সমস্যা রয়েছে যে শিশুর তার জন্যও বক্তৃতা বা প্রদর্শন পদ্ধতি কার্যকর নয়। কারণ বক্তৃতা/প্রদর্শনের অবসরে নিষ্ক্রিয় থাকলেই এ ধরনের শিক্ষার্থীরা অন্যদের বিরক্ত করার ও নানাবিধ সমস্যামূলক আচরণ করার সুযোগ পাবে। এ ধরনের শিক্ষার্থীদের আলোচনা বা কাজে সক্রিয় রাখা প্রয়োজন। এ কারণে তাদের জন্য আলোচনামূলক পদ্ধতি, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি বা প্রকল্প পদ্ধতি উপযোগী।

অন্যদিকে ভাষাগত ভিন্নতা, লিঙ্গগত ভিন্নতা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থাগত ভিন্নতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বক্তৃতা পদ্ধতির পরিবর্তে আলোচনামূলক পদ্ধতি অধিক কার্যকর। কারণ বক্তৃতায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ কম। ফলে পারস্পরিক মেলামেশা ও ভাব-বিনিময়ের সুযোগও কমে যায়, যা এসব ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য কমাতে সহায়তা করে না। পক্ষান্তরে আলোচনায় সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থী পরস্পর দলে, প্যানেলে বা এককভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। পরস্পরকে জানার ও পরস্পরের কাছে আসার সুযোগ পায়। ফলে একীভূত শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণ হয়। এছাড়া ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি ও প্রকল্প পদ্ধতিও এ ধরনের ভিন্নতার ক্ষেত্রে কার্যকর। কেননা এসব পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এবং পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে শেখার সুযোগ ঘটে।

শিক্ষার্থীদের পারগতার স্তরগত ভিন্নতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ভিন্ন ভিন্ন শিখন স্তর অনুযায়ী সহায়তা দেয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের স্তর অনুযায়ী সক্রিয় শিখনের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সমস্যা সমাধান বা প্রকল্প পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের জন্য এ ধরনের সুযোগ তৈরি হয়। একইভাবে আলোচনা পদ্ধতিও বিশেষ করে জোড়ায় বা দলে আলোচনার মাধ্যমে অগ্রসর শিক্ষার্থীরা অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান করতে পারে।

শিক্ষার্থীদের শেখার ধরনগত ভিন্নতার ক্ষেত্রে কোন একক পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর নয়। কেননা একেকজন শিক্ষার্থী একেক ধরনের পদ্ধতি বা কৌশলে ভালো শেখা। ফলে একই সাথে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। প্রকৃতপক্ষে যেহেতু শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থী থাকে (ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভিন্ন মেধা/পারগতা, ভিন্ন প্রতিবন্ধকতা, ভিন্ন শেখার ধরন), ফলে কোন একক পদ্ধতি শিখন শেখানো কার্যক্রমের জন্য উপযোগী নয়। বরং বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির সমন্বয় করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে যেন সকল ধরনের শিক্ষার্থীর চাহিদার প্রতি সাড়া দেয়া যায় এবং তারা যেন বিষয়বস্তু সহজে বুঝতে পারে।

### শিক্ষার্থীদের ভিন্নতা অনুসারে শিখন শেখানো পদ্ধতির প্রয়োগ

শিক্ষার্থীদের ভিন্নতা অনুসারে পদ্ধতি নির্বাচনের পাশাপাশি ভিন্নতার ধরন অনুযায়ী কিছু ভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে তাদের চাহিদার প্রতি সাড়া দেয়া এবং বিষয়বস্তুকে তাদের কাছে বোধগম্য ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা যায়। নিচে শিক্ষার্থীদের ভিন্নতা অনুযায়ী কোন ক্ষেত্রে কী কৌশল প্রয়োগ করা যায় তার বর্ণনা দেয়া হলো।

### শিক্ষার্থীদের প্রতিবন্ধিতার কারণে সৃষ্ট ভিন্নতা

বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতার কারণে শিক্ষার্থীদের শিখন শেখানো কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা তৈরি হয় তা উত্তরণে সাধারণ শিখন শেখানো পদ্ধতির পাশাপাশি কিছু বিশেষ কৌশল অনুসরণ করা প্রয়োজন হয়। এ ধরনের কৌশল নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধকতা উত্তরণে বিকল্প/সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়। 'একীভূত শিক্ষা' অংশে প্রতিবন্ধী শিশুরা সাধারণ শিশুদের সাথে একই শ্রেণিতে কীভাবে শিখতে পারে তার কৌশলগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রতিবন্ধিতার ধরন নির্বিশেষে কিছু সাধারণ কৌশল দেয়া হলো যা সকল ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রেই কার্যকর।

- **সামনের সারিতে বসানো:** বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের সামনের সারিতে অন্য শিশুদের সাথে বসাতে হবে। শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে শ্রেণিকক্ষে অতিচঞ্চল বা দুরন্ত সহপাঠী যেন তার সাথে না বসে বা অন্য শিশুরা যেন তাকে বিরক্ত করতে না পারে। আবার একাধিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে বা পাশাপাশি না বসিয়ে শ্রেণিকক্ষে সাধারণ সহপাঠীদের সঙ্গে মিলেমিশে বসাতে হবে।
- **মেধাবী বা সক্রিয় শিক্ষার্থীকে পাশে বসানো:** বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে মেধাবী বা সক্রিয়ভাবে সহায়তা করতে উদ্যোগী সহপাঠীর পাশে বসাতে বা তার সঙ্গে জুটি বেঁধে দিতে হবে। এর পাশাপাশি তাদের পাশে স্বউদ্যোগী বা আগ্রহী বন্ধুকেও বিবেচনা করা যেতে পারে। শ্রেণিকক্ষের বাইরে এসব সহপাঠীদের মাধ্যমে জানানোর বা বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

- **সামনে থেকে সহজে বুঝিয়ে বলা:** প্রতিবন্ধী শিশুর সঙ্গে কথা বলার সময় সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে তার সাথে সরাসরি কথা বলুন। সরল, সহজবোধ্য ও সাবলীল ভাষায় পাঠদান করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কথার যথাসম্ভব পুনরাবৃত্তি করতে হবে যাতে এসকল শিশুর বুঝতে কোন সমস্যা না হয়। কথা বলার সময় জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়ে বেশি সময় দিয়ে প্রয়োজনে বারবার বুঝিয়ে দিতে হবে।
- **পর্যাপ্ত আলো-বাতাস থাকা:** শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত আলো ও বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এছাড়া বোর্ড, উপকরণ এবং পাঠ্যবই ব্যবহারের সময় যেন তাতে পর্যাপ্ত আলো থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- **সহজ আকর্ষণীয় পাঠদান:** এ ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠদান কার্যক্রম অবশ্যই আকর্ষণীয় ও বিষয় সহজে অনুধাবনযোগ্য হতে হবে। এজন্য বিভিন্ন ধরনের সহায়ক উপকরণ ও মাধ্যম (যেমন: বর্ণনা, প্রদর্শন ইত্যাদি) ব্যবহার করা প্রয়োজন। তবে লক্ষ রাখতে হবে যেন শ্রেণিকক্ষে বেশি গোলমাল বা অতিরিক্ত শব্দ সৃষ্টি না হয়।
- **পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণ দিয়ে শ্রেণিকক্ষ সাজানো:** শ্রেণি সজ্জিতকরণের আওতায় শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি, সংকেত বা অন্যান্য উপকরণ লাগিয়ে রাখা যেতে পারে। প্রতিদিনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আলাদা আলাদা কাগজে বা বোর্ডে তৈরি করে পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে দেখানো যেতে পারে। শিক্ষা উপকরণের ক্ষেত্রে ছবি/চিত্র/অঙ্কন এ জাতীয় উপকরণ ব্যবহারের যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে।
- **অভিভাভবকদের সাথে নিয়মিত যোগোযোগ রাখা:** প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর অভিভাবক বা পরিবারের সদস্যদেরকে তার লেখাপড়ার অগ্রগতি বা অবনতি সম্পর্কে নিয়মিত অবহিত করার মধ্য দিয়ে তাকে শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা।

### শেখার ধরনগত/বুদ্ধিমত্তাগত ভিন্নতা

গার্ডনার বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমত্তা অনুসারে কার্যক্রম পরিচালনা কৌশল ব্যবহার করলে তারা ক্রমান্বয়ে আত্মবিশ্বাসী এবং আত্মনির্ভরশীল হয়। অন্যদিকে এই তত্ত্বটি শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা তত্ত্বকেও সমৃদ্ধ করে।

ছকে আট ধরনের বুদ্ধিমত্তার ধারণা ও প্রত্যেকটি বুদ্ধিমত্তার জন্য শ্রেণিকক্ষে কী কৌশল ও পরিকল্পনা প্রয়োগ করা যায় তা দেয়া হলো:

সারণি ২.৫: বুদ্ধিমত্তা অনুসারে শ্রেণি পরিকল্পনা

| বুদ্ধিমত্তা | শ্রেণি পরিকল্পনা |
|---|---|

| | |
|---|---|
| ১.মৌখিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বুদ্ধিমত্তা | – বিভিন্ন ধরনের পড়ার উপকরণ, যেমন– বইপত্র, ম্যাগাজিন, সংবাদপত্র ইত্যাদি নিয়ে একটি বুক কর্নার শ্রেণিকক্ষে স্থাপন করা। মৌখিকভাবে ভাব প্রকাশে শিশুকে উৎসাহিত করা।<br>– একটি শ্রবণ কর্নার প্রতিষ্ঠা করা।<br>– লেখার বিভিন্ন উপকরণসহ একটি লিখন কর্নার স্থাপন করা।<br>– শিশুকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করানোর জন্য প্রশ্ন করার কৌশল ব্যবহার করা।<br>– গল্প বলা, গল্প শোনা, বর্ণনা, বক্তৃতা ইত্যাদি কৌশল ব্যবহার করা।<br>– চার্ট তৈরি ও প্রদর্শন করা। |
| ২.যৌক্তিক-গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা | – একটি গণিত কেন্দ্র স্থাপন করা। তাতে নানা ধরনের ব্লক, বিভিন্ন আকৃতির, রঙের, আদলের গঠনবিন্যাসের বস্তু রাখা।<br>– শিক্ষা পরিমাপমূলক কাজে সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা করা।<br>– পরিমাপ ও হিসাব-নিকাশ কাজে সম্পৃক্ত করার জন্য মানচিত্র, গ্রাফপেপার, কম্পাস, থার্মোমিটার এবং সহজলভ্য অন্যান্য মূর্ত বস্তু রাখা।<br>– সময় সম্পর্কিত বিভিন্ন বস্তু, যেমন– ক্যালেন্ডার, ঘড়ি, টাইমার ইত্যাদি রাখা।<br>– তথ্য বর্ণনা করার সামর্থ্য বাড়ানোর জন্য চার্ট ব্যবহার করা।<br>– অঙ্কের খেলা ও বিভিন্ন রকম ধাঁধা ও সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শেখানোর ব্যবস্থা করা।<br>– যুক্তি প্রদান, শ্রেণিকরণ, মিলকরণ, পর্যায়ক্রমে সাজানো ইত্যাদি কৌশল ব্যবহার করা। |
| ৩.অনুভূতি ও শারীরিক গতিমূলক বুদ্ধিমত্তা | – সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করার বিভিন্ন ধরনের বস্তু, যেমন–ব্লক, পাজল, কাদামাটি, অঙ্কনের বস্তু ইত্যাদি রাখা।<br>– বাস্তব নানা ধরনের অভিজ্ঞতা বা হাতে-কলমে কাজের সুযোগ অন্তর্ভুক্ত করা।<br>– কাঠের শিল্প, হস্তশিল্প ইত্যাদি দক্ষতামূলক জিনিসপত্র রাখা।<br>– অভিনয় এবং চলাফেরা বা শারীরিক নড়াচড়ামূলক কাজ দেয়া।<br>– নাচের ব্যবস্থা রাখা।<br>– বাইরের অভিজ্ঞতা অর্জনমূলক পরিকল্পনা করা।<br>– ভূমিকা অভিনয় ও খেলাধুলার মাধ্যমে শেখার সুযোগ রাখা। |
| ৪.দৃষ্টি ও স্থানসংক্রান্ত বুদ্ধিমত্তা | – আর্ট কর্নার প্রতিষ্ঠা করা ও শিশুদের অঙ্কনের নানা ব্যবহার করার সুযোগ প্রদান।<br>– ভাবের বহিঃপ্রকাশের জন্য গ্রাফের সাহায্যে কোনো কিছু উপস্থাপন করার জন্য তাকে উৎসাহিত করা।<br>– তথ্য প্রদানের জন্য দেয়াল ও বুলেটিন বোর্ড ব্যবহর করা।<br>– ছবি, পোস্টার ইত্যাদি ব্যবহার করা এবং তথ্য বর্ণনার জন্য বিচিত্র রং, আকৃতি, ছবি ইত্যাদি ব্যবহার করা। |

| | |
|---|---|
| ৫. ছন্দ ও সংগীতমূলক বুদ্ধিমত্তা | – বিষয় হিসেবে সংগীতকে অন্তর্ভূক্ত করা।<br>– গান গাওয়া ও নাচের অভিজ্ঞতা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা।<br>– সংগীতবিষয়ক উদ্ভাবনে উৎসাহিত করা।<br>– প্রতিদিন পাঠের সাথে সম্পর্কিত সংগীত ও সুর ব্যবহার করা।<br>– ছন্দ ও ছড়ার মাধ্যমে পাঠের ব্যবস্থা করা। |
| ৬. আন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা | – সহযোগিতামূলক শিখন কার্যক্রম ব্যবহার করা।<br>– পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শিখনমূলক প্রকল্পের পরিকল্পনা করা।<br>– জোড়ায় এবং দলে কাজ করার সুযোগ দেয়া।<br>– মাঝেমাঝেই দলীয় আলোচনা ও অংশগ্রহণমূলক উদ্যোগ নেয়া।<br>– নেতৃত্বের স্বীকৃতি দেয়া।<br>– শ্রেণিকক্ষের নিয়ম নির্দেশনা স্পষ্ট করে জানানো। |
| ৭. অন্তঃব্যক্তিক বুদ্ধিমত্তা | – প্রত্যেকের অভিব্যক্তি প্রকাশকে (শিল্প, জার্নালে লেখা) উৎসাহিত করা।<br>– প্রতিফলনমূলক/অনুচিন্তনের জন্য সময় দেয়া।<br>– একা একা কাজ করার সুযোগ দেয়া।<br>– 'নির্জন এলাকা' এবং 'ব্যক্তিগত এলাকা' প্রতিষ্ঠা করা।<br>– শিশুদের বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা ও নির্বাচনে নিয়োজিত করা। |
| ৮. প্রকৃতিবিষয়ক বুদ্ধিমত্তা | – শ্রেণিকক্ষে ভীতিকর নয় এমন কিছু জীবন্ত প্রাণী রাখা, অ্যাকুরিয়ামে একটি ভালো সংগ্রহ থাকতে পারে।<br>– বছরব্যাপী (ভেতরে ও বাইরে) বাগান করার অভিজ্ঞতা দানের পরিকল্পনা করা।<br>– মাঝেমাঝেই প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া।<br>– ফিল্ড ট্রিপ ও প্রকৃতির মাঝে হাঁটার পরিকল্পনা তৈরি করা। |

বহুমুখী শিখন শেখানো পদ্ধতি শিশুর সব ধরনের সম্ভাবনাকে ব্যবহার করে তাকে বিষয়বস্তু জানতে (Knowing), কাজ করতে (Doing), চিন্তা করতে (Thinking), এবং এগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন(Linking) করতে সহায়তা করে। এর ফলে তার অনুধাবন ক্ষমতা (Understanding) সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। শিশু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করাটাই যথেষ্ট নয়। তাকে উপলব্ধি করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন এর সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত ফলাফল শিখন শেখানো কৌশলে প্রয়োগ করা। শিক্ষক যদি বাস্তবে তা প্রয়োগ কওে (Application) শিশুর আচরণে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে পারেন তবেই তার শিখন নিশ্চিত হয়েছে বলা যাবে।

**পারগতার স্তরগত ভিন্নতা**

আলাদা আলাদা স্তরে অবস্থিত শিক্ষার্থীদের একত্রে শেখানোর জন্য স্তরভিত্তিক শিখন কৌশল ব্যবহার করা হয়। এই কৌশলে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অবস্থিত শিক্ষার্থীদের শিখন মাত্রা বা কে কোন স্তরে অবস্থান করছে তা নির্ণয়ের জন্য একটি বেসলাইন সার্ভে করা হয়। এটি কোন নির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিচালিত একটি জরিপ যার মাধ্যমে যাচাই করে দেখা হয় যে শিক্ষার্থীদের কার শেখার মাত্রা কীরূপ এবং কে কোথায় অবস্থান করছে। এরপর শিখনের স্তর অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের চাহিদাগুলো জেনে একই শ্রেণিতে কোন প্রকার দলে ভাগ না করেঅভিন্ন শিখন পরিকল্পনার মধ্যে তাদের শিখন চাহিদাসমূহ পূরণ করা হয়। শিশুদের শিখন

স্তর/পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী পাঠদান করা হলে শিশুরা তাদের নিজের পাঠগত অবস্থান থেকে শেখার সুযোগ পায় এবং শিখনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। কাজেই শ্রেণিকক্ষে প্রতিটি শিশুকে তার শিখন স্তর অনুযায়ী পাঠদান করা দরকার।

শিশুদের শিখন স্তর/পাঠগত অবস্থান অনুযায়ী পাঠদান করা হলে শিশুরা তাদের স্ব স্ব পাঠগত অবস্থান থেকে শেখার সুযোগ পায় এবং শিখনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। কাজেই শ্রেণিকক্ষে প্রতিটি শিশুকে তার শিখন স্তর অনুযায়ী পাঠদান করতে হবে। শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান নির্ণয়ের জন্য শিক্ষাবর্ষ বা শিক্ষা কার্যক্রমের শুরুতে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে জরিপ বা মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তাই বেসলাইন মূল্যায়ন। এ জন্য উপযুক্ত বেসলাইন মূল্যায়ন টুলস ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শিখন স্তর/পাঠগত অবস্থান নির্ধারণ করতে হয়। এ কাজটি শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর প্রথম দিকেই সম্পন্ন করতে হয়।

– **পারগতার স্তর নির্ণয়/বেসলাইন মূল্যায়ন টুলস তৈরি**

শিক্ষার্থীদের পারগতার স্তর নির্ণয়ের জন্য টুলস তৈরি করতে হয়, যা বেসলাইন মূল্যায়ন টুলস নামেও পরিচিত। বেসলাইন টুলস শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে অর্থাৎ নির্দিষ্ট শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের যেসব যোগ্যতা অর্জন করার কথা সেগুলো শিক্ষার্থী অর্জন করতে পেরেছে কিনা এবং পারলে কতটুকু পেরেছে তা নির্ণয় করার জন্য তৈরি করতে হয়। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিত্তিক। এই যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে আবশ্যকীয় শিখনক্রম। আবশ্যকীয় শিখনক্রম থেকে প্রতি শ্রেণির জন্য শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করেই বিষয়ভিত্তিক আলাদা বেসলাইন মূল্যায়ন টুলস তৈরি করতে হয়। প্রতিটি বিষয়ে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের উপযোগী প্রশ্নোত্তর বলতে, লিখতে, পড়তে অথবা গণনা করতে ও সমস্যা সমাধান করতে দিয়ে প্রতিটি শিশুর শিখন স্তর নির্ধারণ করা যায়। শিশুদের পারগতার স্তর নির্ণয় করতে প্রতিটি শিশুর জন্য বিষয় ও শ্রেণিভিত্তিক আলাদা শিখন স্তর নির্ধারণ করতে হয়। শিক্ষক নিজে তার শ্রেণিকক্ষের জন্য বিষয়ভিত্তিক আলাদা আলাদা টুলস্ তৈরি করে নিবেন এবং সে অনুযায়ী ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের পারগতার স্তর নির্ণয় করবেন।

– **বেসলাইন মূল্যায়ন টুলস ব্যবহারের নির্দেশাবলি**

টুলস তৈরির পর তা নিম্নোক্ত নির্দেশাবলি অনুসরণ করে ব্যবহার করতে হবে-

- প্রতিটি শিশুর সাথে আলাদাভাবে বসে টুলস্ ব্যবহার করে বেসলাইন মূল্যায়ন করতে হবে।
- শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে প্রশ্ন করে প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।
- বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে মূল্যায়ন করতে হবে।
- প্রশ্নের ভাষা সহজ ও শিশুদের উপযোগী হতে হবে।
- প্রতিটি আইটেমের ওপর প্রশ্ন করতে হবে।
- উত্তর সঠিক হলে (√) চিহ্ন এবং ভুল হলে (×) চিহ্ন দিন।
- যখন কোন শিক্ষার্থীকে এককভাবে মূল্যায়ন করা হবে তখন অন্য শিক্ষার্থীদের সিলেবাসভিত্তিক কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখতে হবে।
- ক্লাসের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ছক অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে হবে।

- মূল্যায়নকৃত তথ্য/ফলাফল পর্যালোচনা করে পাঠগত অবস্থান জানবেন ও তা যথাযথভাবে ছকে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- সকল শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন শেষে মূল্যায়নের সার-সংক্ষেপ তৈরি করতে হবে।

এভাবে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন ছক ও সহায়ক টুলস্ ব্যবহার করে বেসলাইন মূল্যায়নের কাজ করা হয়। মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠগত স্তর চিহ্নিত হলে তা অভিন্ন পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়।

বেসলাইন টুলস্ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের কে কোথায় অবস্থান করছে তা জানা যাবে। ফলে তাদের সুনির্দিষ্ট চাহিদাও জানা যাবে। এই চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদেরকে পাঠদান করতে হবে।

জরিপকৃত শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান নির্ণয়ের জন্য নিম্নরূপ ছক ব্যবহার করা হয়। এই ছকের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করে কোন শিশু কোন স্তরে অবস্থান করছে তা চিহ্নিত করা হয়। তাদের জন্য পরবর্তী শিখন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক পাঠগত অবস্থান নির্ণয় করা হয় এবং ছকও বিষয়ভিত্তিক হয়ে থাকে। এখানে প্রথম শ্রেণির বাংলার একটি নমুনা ছক দেখানো হলো–

– **শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক পাঠগত অবস্থান নির্ণয় ছক**

বিষয়: বাংলা শ্রেণি: বিদ্যালয়ের নাম:

| ভর্তিকৃত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা | যাচাইকৃত/ জরিপকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা | সাবলীলভাবে পড়তে পারে | শিক্ষকের আংশিক সাহায্যে পড়তে পারে | শিক্ষকের সম্পূর্ণ সাহায্যে পড়তে পারে | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

– **বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান নির্ণয়**

এই ছকগুলো ব্যবহার করে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক পাঠগত অবস্থান নির্ণয় করতে হবে। আপনাদেরকে প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে চারটি করে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে আপনারা নির্ধারিত ছক অনুযায়ী বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের পাঠগত অবস্থান নির্ণয় করবেন। নিম্নের ছকে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা বিষয়ের বিদ্যালয়ভিত্তিক নমুনা ছক দেয়া হলো। অনুরূপভাবে গণিত, ইংরেজি, প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের ছক তৈরি করে পূরণ করতে হবে।

বিদ্যালয়ের নাম: বিষয়: বাংলা

| শ্রেণি | শাখা | মোট শিক্ষার্থী | মূল্যায়ন কৃত শিক্ষার্থী | প্রথম শ্রেণির সাবলীল পাঠক | দ্বিতীয় শ্রেণির সাবলীল পাঠক | তৃতীয় শ্রেণির সাবলীল পাঠক | চতুর্থ শ্রেণির সাবলীল পাঠক | বর্ণ চিনে পড়তে পারে | বর্ণ চিনে পড়তে পারে না |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রথম | ক | | | | | | | | |
| | খ | | | | | | | | |
| | গ | | | | | | | | |
| দ্বিতীয় | ক | | | | | | | | |
| | খ | | | | | | | | |
| | গ | | | | | | | | |
| তৃতীয় | ক | | | | | | | | |
| | খ | | | | | | | | |
| | গ | | | | | | | | |

– **শিখনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য নির্ধারণ ও করণীয়**

বেসলাইন সার্ভে করে দেখা যায় যে একই শ্রেণিতে বিভিন্ন শিখন চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী রয়েছে। যেহেতু তাদের চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন, তাই শ্রেণিতে পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদার ভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে কাজ দিলে শিক্ষার্থীরা সহজে শিখবে।তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, দল গঠনের সময় শিক্ষার্থীদেরকে যেন তাদের পারগতা বা অপারগতার স্তরের ওপর ভিত্তি করে বিভক্ত না করা হয়। বরং একই দলে বিভিন্ন পারগতার শিক্ষার্থী থাকা বাঞ্ছনীয়। এতে শ্রেণিতে একীভূত শিক্ষার দর্শন সহজে প্রয়োগ করা যায় এবং শিশুদের শিখন ভালো হয়। তবে বিভিন্ন পারগতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের স্তরভিত্তিক উপযোগী শিখনফলসমূহ মনে রেখে শিক্ষক একই সাথে সকল শিশুর শিখনফল অর্জনের কৌশল প্রয়োগ করবেন যেখানে কোন শিশু তার সহপাঠীকে কোনভাবেই অপারগ হিসাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে না।

## শিক্ষোপকরণ তৈরি ও ব্যবহার

আপনি কোন একটা আলোচনা সভায় গেছেন। সেখানে প্রাচীন রোমের ইতিহাস বলা হচ্ছে। বক্তা একের পর এক ঘটনা বলে যাচ্ছেন আর উপস্থিত দর্শকরা তা শুনছেন। আপনি আরেকদিন একই ধরনের আরেকটা আলোচনা সভায় গেলেন যেখানে প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস বলা হচ্ছে। এখানে গ্রীসের ইতিহাস বলার সাথে সাথে সে সময়ের বিভিন্ন ছবি, ব্যবহৃতসামগ্রী, ভিডিও ইত্যাদি দেখানো হচ্ছে। এখন এই দুইটা আলোচনা সভার কোনটা আপনার কাছে বেশি আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য হবে এবং বেশিদিন মনে থাকবে?

কোন বিষয় বর্ণনার পাশাপশি এর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ছবি, শব্দ বা ভিডিও ইত্যাদি দেখানো হলে সে বিষয় বোঝা সহজ হয় এবং বেশিক্ষণ মনে থাকে। কারণ আমরা যখন কোন বিষয় পড়ি বা শুনি তখন আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের একটা মাত্র ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার হয়। কিন্তু যখন এর সাথে বিভিন্ন ধরনের ছবি, শব্দ বা ভিডিও যোগ করা হয় তখন একাধিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার হয়। ফলে সে বিষয়টি সহজে বোঝা যায় এবং মনে রাখাও সহজ হয়। যেমন- শিশুকে যদি আম দেখিয়ে আম চিনতে শেখানো হয় তাহলে আম সম্পর্কে তার জ্ঞান পরিপূর্ণ হবে না। প্রকৃতপক্ষে আমটি স্পর্শ করার প্রয়োজন আছে, তার গন্ধ জানার প্রয়োজন আছে, স্বাদ গ্রহণ করারও প্রয়োজন রয়েছে। এভাবে যদি আমটিকে চোখ, হাত, ত্বক, নাক, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আনা যায় তবেই আমটি সম্পর্কে তার পূর্ণ জ্ঞান হবে। অতএব শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানের জন্য একই সঙ্গে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগাতে পারলে শিখন সার্থক হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষোপকরণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষোপকরণ থাকলেই যে তা সকল শিক্ষার্থীর শিখনে সহায়ক হবে এমন নাও হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী রয়েছে এমন শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রমে একটা পোস্টার ব্যবহার করা হয়, তবে তা অন্য শিক্ষার্থীদের শিখনের জন্য সহায়ক হলেও ঐ শিক্ষার্থীর জন্য সহায়ক নয়। তাই শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ভিন্নতা ও চাহিদাকে বিবেচনা করা দরকার। এ পাঠে শিক্ষোপকরণ কী, এর প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষোপকরণের ধরন এবং শিক্ষার্থীদের ভিন্নতা ও চাহিদা অনুসারে শিক্ষোপকরণ তৈরি, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

**শিক্ষা উপকরণ কী?**

যেসব বস্তু বা কৌশল ব্যবহার করলে শিখনের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, শিক্ষার্থীদের জন্য বুঝতে সহায়ক হয়, শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে কার্যকর করে তোলা যায় তাই শিক্ষা উপকরণ বা শিক্ষা সহায়ক উপকরণ। যেমন- পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য ম্যাপ বা গ্লোব ব্যবহার করা, আদিবাসীদের সংস্কৃতি সম্পর্কে পড়াতে তাদের পোশাক, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের ছবি ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের জন্য বোঝা সহজ হয় এবং অনেকটা মূর্ত হয়ে ওঠে।

**বিভিন্ন ধরনের শিক্ষোপকরণ**

বহু প্রকার উপকরণ শিখন শেখানো কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন- শিক্ষক উদ্ভিদ সম্পর্কে ধারণা দিতে চাইলে বাস্তব উপকরণ হিসেবে লতাপাতা, ফুল, ফল ও নানা ধরনের উদ্ভিদ ব্যবহার করেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কল্পনা করে কিছু বুঝতে হয় না। তবে কোনো কোনো পাঠে বাস্তবের অভাব পূরণের জন্য চিত্র, ছবি, চার্ট, নকশা, মানচিত্র, মডেল ইত্যাদি বিকল্প বস্তু ব্যবহার করা হয়। যেখানে এ ধরনের উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করা হয়, সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে কিছুটা কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়।

শিখন শেখানো কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণকে সাধারণভাবে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

**ক) শ্রবণযোগ্য উপকরণঃ** যেসব উপকরণ শিখনের বিষয়বস্তুকে শ্রবণযোগ্য করে তোলে অর্থাৎ আমরা আমাদের কান দিয়ে শুনতে পাই। যেমন- রেডিও, টেপ রেকর্ডার, অডিও ক্যাসেট, সিডি প্লেয়ার, মাইক্রোফোন ইত্যাদি।

**খ) দর্শনযোগ্য উপকরণঃ** যেসব উপকরণ শিখনের বিষয়বস্তুকে দর্শনগ্রাহ্য করে তোলে অর্থাৎ আমাদের চোখ দিয়ে দেখতে পাই। যেমন- পোস্টার, ছবি, চার্ট, গ্লোব, বিভিন্ন মডেল, ম্যাপ, ম্যাগাজিন ,জার্নাল, বিভিন্ন প্রকার বোর্ড, পাঠ্যপুস্তক, পত্র-পত্রিকা, স্লাইড প্রজেক্টর, ওভারহেড প্রজেক্টর ইত্যাদি।

**গ) শ্রবণ-দর্শনযোগ্য উপকরণঃ** যেসব উপকরণ শিখনের বিষয়বস্তুকে একইসাথে শ্রবণ ও দর্শনগ্রাহ্য করে তোলে অর্থাৎ চোখ ও কানের ব্যবহার করে আমরাবুঝতে পারি। যেমন- টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, ডিভিডি, মনিটর, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।

## শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজনীয়তা

- **বিষয়বস্তু সহজ ও বোধগম্য করেঃ** শিখন শেখানো কাজে উপকরণের ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পারে এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট হয়।
- **বিষয়বস্তুকে মূর্ত করেঃ** উপকরণ ব্যবহার করলে শ্রবণ-দর্শন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের ফলে সুস্পষ্ট ও মূর্ত হয়ে ওঠে। ফলে শিখনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার মাত্রা প্রসারিত হয় এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা লাভে সহায়ক হয়।
- **শিখন দীর্ঘস্থায়ী করেঃ** উপকরণ ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীরা দেখে ও শুনে শেখার সুযোগ পায়। এতে মুখস্থ করার প্রবণতা কমে আসে এবং বিষয়বস্তু বুঝে আয়ত্ত করে। ফলে শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- **চিন্তা ও মননশক্তির বিকাশঃ** শিক্ষা উপকরণ শিক্ষার্থীদের ভাবনাকে উদ্দীপ্ত করে। এটি তাদের পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি দক্ষতার বিকাশ ঘটায়।
- **পাঠে আগ্রহ সৃষ্টিঃ** শিক্ষা উপকরণ শ্রেণিকক্ষের একঘেয়েমিভাব দূর করে পাঠকে আকর্ষণীয় করে তোলে এবং শিক্ষা কার্যক্রমে গতিশীলতা নিয়ে আসে। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীর মনে সঞ্চার করে উদ্যম ও অনুপ্রেরণা, যা তাকে পাঠের প্রতি আগ্রহী করে তোলে।
- **পাঠ উপস্থাপনের সময় ও শ্রম লাঘবঃ** বলা হয় একটি চমৎকার ছবি হাজার পৃষ্ঠার বর্ণনার চেয়ে অধিক কার্যকর। ফলে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করলে শিক্ষক খুব কম সময়ে ও কম পরিশ্রমে পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের মনে গেঁথে দিতে পারেন এবং শিক্ষার্থীর আচরণে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়ন করতে পারেন।

## শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন

শিক্ষা উপকরণ শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করে। তবে এজন্য সঠিক উপকরণ নির্বাচন করা দরকার। যেমন- পূর্বের উদাহরণে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য পোস্টার কোনো কার্যকর উপকরণ নয়। আবার শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য অডিও রেকর্ড বা শ্রবণযোগ্য উপকরণ শিখনে সহায়ক নয়। একইভাবে সব বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য সকল উপকরণ উপযুক্ত নয়। তাই শিক্ষার্থীর চাহিদা বুঝে সঠিক উপকরণ নির্বাচন করা প্রয়োজন। শিক্ষা উপকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন তা নিম্নরূপ:

**শিক্ষার্থীর বয়স ও গ্রহণ ক্ষমতাঃ** শিক্ষার্থীর বয়সের কারণে তাদের বোধগম্যতার ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা যায়। যেমন- একটু বয়সী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রাফ, পরিসংখ্যান ইত্যাদি বোধগম্য হলেও খুব ছোট শিশুদের কাছে তা বোধগম্য নয়। তারা ছবি, ভিডিও ইত্যাদি ভালো বোঝে। তবে শিশুদের জন্য ব্যবহৃত ছবিও জটিল না হয়ে সহজ হওয়া প্রয়োজন। আবার একই বয়সী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সবার বোঝার ক্ষমতা এক নয়। এরূপ

ক্ষেত্রে সকল শিশু বুঝতে সক্ষম এমন উপকরণ কিংবা তাদের বোধগম্যতার স্তর অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উপকরণ নির্বাচন করা যায়।

**শিক্ষার্থীর বিশেষ চাহিদা বিবেচনা:** শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা থাকতে পারে। যেমন- দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা, শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা, শারীরিক প্রতিবন্ধিতা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা ইত্যাদি। এ ধরনের প্রতিবন্ধিতা থাকলে শিক্ষার্থীর বিশেষ চাহিদা তৈরি হয়। যেমন- যার দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা রয়েছে তাকে যদি বর্ণনা শোনানো বা উপকরণ স্পর্শ করানো যায় তাহলে তার পক্ষে বিষয়বস্তু অনুধাবন করা সহজ হয়। আবার শ্রবণ প্রতিবন্ধী হলে তাকে বিষয়টি দেখানো হলে তার পক্ষে বোঝা সহজ হয়। এভাবে শিক্ষার্থীদের চাহিদার প্রতি সাড়া দিয়ে উপকরণ নির্বাচন করা দরকার।

**শিক্ষার্থীর ভিন্নতা বিবেচনা:** বহুমুখী বুদ্ধিমত্তা তত্ত্বে আমরা জেনেছি যে শিক্ষার্থীদের সবার শেখার ধরন এক নয়। কেউ ছন্দ, গান, নাচ ইত্যাদি পছন্দ করে, কেউ গল্প পছন্দ করে, কেউবা বর্ণনা পছন্দ করে। সুতরাং শিক্ষা উপকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এগুলো বিবেচনা করা দরকার। নির্বাচিত উপকরণ যেন শিক্ষার্থীদের বহুমুখী চাহিদার প্রতি সাড়া দিতে সক্ষম হয়।

**আকর্ষণ:** নির্বাচিত উপকরণ শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় হওয়া দরকার। তবে তা এমন হবে না যাতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বিষয়বস্তু থেকে উপকরণে চলে যায়।

**বিষয়সংশ্লিষ্ট ও শিখনফল অর্জনে সহায়ক:** উপকরণ ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো পাঠের বিষয়কে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করে তোলা। তাই নির্বাচিত উপকরণ অবশ্যই পাঠের বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত এবং পাঠের শিখনফল অর্জনে সহায়ক হবে। পাশাপাশি উপকরণের মাধ্যমে প্রদত্ত বার্তা সঠিক হওয়া evÃbxq| পাঠের বিষয়সংশ্লিষ্ট নয় এবং ভুল বার্তা প্রদান করে এমন উপকরণ যতই আকর্ষণীয় এবং শিক্ষার্থীর চাহিদা ও ভিন্নতাকে বিবেচনা করুক না কেন শিখনের ক্ষেত্রে তা মূল্যহীন।

**সহজলভ্য ও স্বল্পমূল্য:** নির্বাচিত উপকরণ সহজলভ্য হওয়া দরকার। তা না হলে উপকরণ সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। এ কারণে উপকরণ স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত এবং স্বল্পমূল্যে উপকরণ দিয়ে তৈরি হলে ভালো হয়। এতে করে অল্প চেষ্টাতেই প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা যায়।

**সহজে ব্যবহার ও সংরক্ষণের সুবিধা:** নির্বাচিত উপকরণ সহজে ব্যবহারযোগ্য হতে হবে। ধরা যাক, একজন শিক্ষক তার পাঠ পরিকল্পনায় লিখেছেন যে তিনি মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করবেন, অথচ তার মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের দক্ষতা নেই। তাহলে পাঠের জন্য এ ধরনের উপকরণ নির্বাচন নিরর্থক। একইভাবে নির্বাচিত উপকরণ ব্যবহারের পরে সহজে সংরক্ষণযোগ্য হতে হবে। তা নাহলে পরবর্তীতে শিক্ষক এ ধরনের উপকরণ ব্যবহারে উৎসাহী হবে না।

**নিরাপদ:** শিক্ষোপকরণ যেহেতু শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কে ব্যবহার ও নাড়াচাড়া করতে হয়, তাই এটি ব্যবহারের জন্য নিরাপদ হওয়া বাঞ্ছনীয়।যে ধরনের উপকরণ দিয়ে বিপদ ঘটতে পারে, যেমন- ধারালো উপকরণে কেটে যাওয়া, বৈদ্যুতিক শক খাওয়া ইত্যাদি পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

**শ্রেণিকক্ষে দর্শন ও শ্রবণযোগ্য:** উপকরণ এমন হবে যেন তা শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শন ও শ্রবণযোগ্য হয়। এ কারণে ব্যবহৃত ছবি বা লেখার আকৃতি বড় হতে হবে এবং ব্যবহৃত শব্দ স্পষ্ট ও উচ্চস্বর সংবলিত হবে।

**কৌতূহল ও চিন্তা উদ্দীপক:** নির্বাচিত উপকরণ এমন হবে যেন তা বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীদের কৌতূহল জাগায় এবং তাদেরকে বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে উদ্দীপ্ত করে।

এই বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে বিষয়সংশ্লিষ্ট উপযোগী উপকরণ নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচনের সময় লক্ষ রাখতে হবে উপকরণটি আকর্ষণীয় ও সঠিক কি না। এটি সহজলভ্য এবং সহজে ব্যবহারযোগ্য কি না এবং স্বল্পমূল্য বা বিনামূল্যে পাওয়া যায় কি না।

**শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ**

শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহারের আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখতে হয়। নানা উপায়ে উপকরণ সংগ্রহ করা যায়।

নিম্নে উপকরণ সংগ্রহের উৎস অনুযায়ী সংগ্রহ প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো-

- **সরকারের শিক্ষা বিভাগ**

সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ পাওয়া যায়। যেমন- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা পাওয়া যায়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পাঠ্যপুস্তক, লেখার খাতা, চার্ট, ক্যালেন্ডার, পোস্টার, ফ্লাশকার্ড, খেলনাসামগ্রী ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। এ সকল সামগ্রী যথাসময়ে সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

- **উন্নয়ন সংস্থা/বেসরকারি সংস্থা**

জাতিসংঘের শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা ইউনেস্কো ও ইউনিসেফ কর্তৃক মাঝেমাঝে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও বিতরণ করা হয়। ইউনেস্কো শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন পোস্টার, শিক্ষক সহায়িকা, অ্যাডভোকেসি গাইড ইত্যাদি তৈরি করে। অনুরূপ ইউনিসেফও বিভিন্ন পোস্টার, শিক্ষক সহায়িকা, গল্পের বই, চার্ট, ফ্লাশকার্ড, খেলনাসামগ্রী ইত্যাদি বিতরণ করে। এসব সংস্থার অফিসে যোগাযোগ করে বিদ্যালয়ের জন্য এসব উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থা, যেমন ইংলিশ ইন অ্যাকশন ইংরেজি শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার পাশাপশি শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের জন্য মোবাইল ফোন, অডিও স্পিকার, স্টোরেজ ডিভাইস কার্ড ইত্যাদি সরবরাহ করে। একইভাবে অন্যান্য বেসরকারি সংস্থাও মাঝেমাঝে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করে। যথাসময়ে খোঁজখবর নিয়ে বিদ্যালয়ের জন্য এসব উপকরণ সংগ্রহ করে রাখা যায়।

- **স্থানীয় দাতা**

স্থানীয় দাতা যেমন- দানশীল ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির (এসএমসি) সদস্যরা বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ সরবরারহ করেন। অনেক ক্ষেত্রে তাদের সাথে যোগাযোগ করে বিদ্যালয়ের চাহিদা সম্পর্কে অবহিত করে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা যায়।

– **শিক্ষক-শিক্ষার্থী**

শিক্ষক বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করে নানা ধরনের শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করতে পারেন। আবার নিজেই কিংবা শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আশাপাশ থেকে শিমের বিচি, তেঁতুলের বিচি, নুড়িপাথর, বাঁশের কাঠি, মাটির মার্বেল, বাস্তব নমুনা ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পারেন। বিভিন্ন উপকরণ, যেমন- মানচিত্র, পোস্টার, ছবি, পুরাতন মুদ্রা, ডাকটিকিট ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পারেন। পুরাতন ক্যালেন্ডার, ম্যাগাজিন, পত্রপত্রিকা থেকে প্রয়োজনীয় ছবি সংগ্রহ করতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের শুকনো খাদ্যশস্য ও ফলমূল, যেমন- ধান, চাল, গম, ডাল, বরই, তেঁতুল ইত্যাদি সংগ্রহ করা যায়। পুরাতন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, যেমন- বাল্ব, রেডিও, ইস্ত্রি, ব্যাটারি ইত্যাদি উপকরণ হিসেবে সংগ্রহ করা যায়।

– **অভিভাবকদের মাধ্যমে**

শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা যখন বিভিন্ন উপলক্ষ্য, যেমন- মা সমাবেশ ও অভিভাবক দিবস ইত্যাদিতে বিদ্যালয়ে আসে তখন মা ও অভিবাবকদের উদ্বুদ্ধ করে তাদের নিকট থেকেও নানা ধরনের শিক্ষাউপকরণ সংগ্রহ করা যায়। প্রয়োজনে তাদের দিয়ে বিদ্যালয়ে বসেই বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করানো যায়। স্থানীয় সহজলভ্য বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে এসব শিক্ষা উপকরণ তৈরি করানো যায়।

**শিক্ষা উপকরণ তৈরি**

শিখন শেখানো কার্যক্রমের জন্য নানা ধরনের উপকরণ দরকার হয়। এর অনেকগুলো আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে কাজ চালাই। কিন্তু তারপরও অনেক উপকরণ দরকার হয়, যেগুলো আমরা কোথাও থেকে সংগ্রহ করতে পারি না। এর মধ্যে কিছু উপকরণ হয়তো বাজার থেকে কিনে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে বিদ্যালয়গুলোর অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করলে উন্নত ও দামি উপকরণাদির কথা চিন্তাই করা যায় না। এ ক্ষেত্রে ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি বা অন্যান্য উপকরণের অভাব পূরণের জন্য অনেক সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীর সহায়তায় স্বল্পমূল্য বা বিনা মূল্যের কাঁচামাল ব্যবহার করে নিজ হাতে আকর্ষণীয় যন্ত্রপাতি, মডেল ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ তৈরি করে নিতে পারেন। এক্ষেত্রে অধিকাংশ কাঁচামাল পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করা যায়। বিদ্যালয় ও পরিবেশের অব্যবহৃত পরিত্যক্ত জিনিসগুলোকে এ ধরনের উপকরণ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

সহজলভ্য ও হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন কাঁচামাল দিয়ে ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করা যায়। যেমন- মাটি বা কাগজের মণ্ড দিয়ে বিভিন্ন প্রাণী, পর্বত, ফলমূল ইত্যাদি তৈরি করা যায়। কাঠ, বাঁশের কাঠি ইত্যাদি দিয়ে অ্যাবাকাস, পরিমাপের মডেল, যেমন- রুলার কম্পাস ও জ্যামিতিক আকৃতি তৈরি করা যায়। আর্ট পেপার, পোস্টার পেপার কিংবা পুরনো ক্যালেন্ডারের উল্টো পিঠে পেন্সিল, কালি ও রঙের উপযুক্ত ব্যবহার করে চার্ট, নকশা, ছবি, ছক, কার্টুন ইত্যাদি অঙ্কন করা যায়। পানীয় বোতলের অব্যবহৃত মুখটি গণিতে গণনার কাজে, কর্কের ভেতর সাইন পেন দিয়ে সংখ্যা প্রতীক, ইংরেজি বা বাংলা বর্ণমালা লিখে

শিক্ষোপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। পানীয় পান করার স্ট্র গণনার কাজে, সংখ্যা প্রতীক তৈরির কাজে, জ্যামিতিক আকৃতি তৈরির কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। মসুর ডাল, ধান ইত্যাদি আর্ট পেপারে গাম দিয়ে লাগিয়ে মানচিত্র, সংখ্যা প্রতীক, বর্ণমালা লিখে আকর্ষণীয় শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা যায়। এ ছাড়া শিকড়, বাকল, দড়ি, তুষ, খড়, নারিকেলের মালা, ছোবড়া, পাট, আঁশ, পুরনো কাপড়, শামুক, ফোম, খালি বাক্স ইত্যাদি নানা রকমের উপকরণ তৈরিতে ব্যবহৃত হতে পারে।

পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি পাঠ্যপুস্তক থেকে আর্ট পেপার, পোস্টার পেপার কিংবা পুরনো ক্যালেন্ডারের উল্টো পিঠে অঙ্কন করে ব্যবহার করা যায়। তা ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের পাঠসংশ্লিষ্ট চার্টও তৈরি করা যায়। পত্রপত্রিকার ছবি কেটে আর্ট পেপার বা পোস্টার কাগজে সাজিয়ে সুন্দর পোস্টার বা চার্ট তৈরি করা যায়। তবে পোস্টার বা চার্ট তৈরির সময় যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে তা হলো-

- পোস্টার/চার্টের চারদিকে মার্জিন থাকবে
- প্রতিটি পোস্টার/চার্টের একটি শিরোনাম থাকবে
- ব্যবহৃত ছবি বা নকশার পরিচিতি থাকবে
- ছবি ও লেখাগুলো যথাসম্ভব বড় হবে
- বিভিন্ন স্থানে উপযুক্ত রঙের ব্যবহার করতে হবে
- বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে সাজাতে হবে

উপকরণ তৈরির কাঁচামাল সংগ্রহ করার পর শিক্ষক নিজেই এসব উপকরণ তৈরি করতে পারেন। আবার শিক্ষার্থীদের সহায়তায়ও বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের দিয়ে উপকরণ তৈরির আগে শিক্ষক তার কী উপকরণ দরকার, কী উদ্দেশ্যে ও কাদের জন্য এসব উপকরণ তৈরি করা হবে, এর জন্য কী কাঁচামাল প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে একটা পরিকল্পনা করে নিবেন। এরপর পরিকল্পনা অনুযায়ী উপকরণ তৈরির জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষার্থীরা উপকরণ তৈরির সময় ঘুরেঘুরে তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিবেন।

শিশুদের নিজ হাতে উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার করার বাস্তব অভিজ্ঞতার মূল্য রয়েছে। এর ফলে-

- পরিবেশের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচিতি ঘটে
- শিক্ষার্থীরা শ্রমের প্রতি মর্যাদাশীল ও আত্মবিশ্বাসী হয়
- শিক্ষার্থীদের সূক্ষ পেশীর বিকাশ ঘটে
- সবাই মিলেমিশে কাজ করতে গিয়ে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও অন্যান্য সামাজিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে।
- শিক্ষার্থী নির্মাণমূলক দক্ষতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে
- শিক্ষার্থীর সৃজনী প্রতিভার বিকাশ ঘটে এবং
- উপকরণ তৈরি করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা আনন্দ লাভ করে
- শিক্ষকের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি হয়
- নিজেরা তৈরি করে বলে এসব উপকরণ ব্যবহার করে পরিচালিত পাঠে অধিক মনোযোগী হয় এবং এক ধরনের অংশীদারিত্ববোধ তৈরি হয়।

উপরিউক্ত কারণে শিক্ষা উপকরণ তৈরিতে শিশুদের অংশগ্রহণ রাখা দরকার। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, এসব উপকরণ তৈরি করতে গিয়ে যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে।

**শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার**

শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কাজকে ফলপ্রসূ ও সার্থক করার জন্য শিক্ষোপকরণ ব্যবহার করা হয়। পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণ ব্যবহারে পাঠের বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় হয় এবং শিক্ষার্থীদের নিকট বক্তব্য সুস্পষ্ট হয়। তাই সার্থক ও ফলপ্রসূভাবে শিখনশেখানো কাজ পরিচালনার লক্ষ্যে সঠিক নিয়মে উপকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন। এ জন্য নিচের বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়া দরকার-

- **শিক্ষকের প্রস্তুতি:** নির্বাচিত উপকরণ ব্যবহারের পূর্বে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। অর্থাৎ উপকরণটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে এবং এর ব্যবহার কৌশল অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আয়ত্ত করতে হবে যেন শ্রেণিকক্ষে কোনো প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন না হয়। অনেক সময় শিক্ষককে চার্ট, মানচিত্র, ছবি, চিত্র ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়। শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা যেন সহজে সেগুলো দেখতে পায় সেভাবে টাঙানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

- **শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতি:** কী উপকরণ কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে, এ থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা কীভাবে তাদের শিখনে সহায়তা করবে, কোথায় এর প্রয়োগ ঘটাতে পারবে তা বিস্তারিত শিক্ষার্থীদের অবহিত করতে হবে।

- **উপস্থাপন:** শিক্ষক যেসব উপকরণ শ্রেণিতে নিয়ে যাবেন সেগুলো যেন সঠিকভাবে ব্যবহার বা প্রদর্শন করতে পারেন। উপকরণের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে নিচের কৌশলগুলো অনুসরণ করা প্রয়োজন-
    - শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই শিক্ষা উপকরণ প্রদর্শন করবেন না। এতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের কথা না শুনে উপকরণ দেখার প্রতি বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠবে।
    - শ্রেণি কার্যক্রম চলার সময় যখন শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজন হবে তখন তা প্রদর্শন করুন। যে ধারণা দেয়ার জন্য বা যে প্রসঙ্গে শিক্ষা উপকরণটি ব্যবহার করার কথা তা শেষ হলে উপকরণটি সরিয়ে ফেলুন। অর্থাৎ অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার পূর্বে উপকরণ সরিয়ে ফেলতে হবে।
    - উপকরণটি এমন স্থানে প্রদর্শন করুন যেন শ্রেণির সবাই তা দেখতে পায়। উপকরণ ছোট হলে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের সামনে গিয়ে দেখান।
    - যেসব শিক্ষার্থী দেখতে পায় না (দৃষ্টি প্রতিবন্ধী) তাদেরকে উপকরণ সম্পর্কে বর্ণনা করুন যেন তারা উপকরণটি সম্পর্কে ধারণা পায়। যেসব উপকরণের ত্রিমাত্রিক অবয়ব আছে যেমন গ্লোব, খেলনা ইত্যাদি তাদের ধরে দেখতে দিন। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা স্পর্শের মাধ্যমে শিক্ষা উপকরণ হতে প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রহণ করে। তাই বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে যতটা সম্ভব উপকরণকে অ্যাম্বুশ করা প্রয়োজন। এসংক্রান্ত বিস্তারিত এ বইয়ের প্রথম খণ্ডে (একীভূত শিক্ষা অধ্যায়ে) আলোচনা করা হয়েছে।
    - আবার শ্রবণযোগ্য (অডিও) উপকরণ ব্যবহার করলে শ্রেণিকক্ষে যদি শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী থাকে তবে সহায়ক দর্শনযোগ্য কোন উপকরণ ব্যবহার করুন অথবা ইশারা (অঙ্গভঙ্গির) মাধ্যমে সেটি বোঝানোর চেষ্টা করুন।
    - শিক্ষার্থীদের চাহিদার ভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য রেখে একই বিষয়ের জন্য একাধিক ভিন্ন ভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন।

- শ্রেণির দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পাশাপশি অন্য শিক্ষার্থীদেরও উপকরণ ধরে দেখার সুযোগ দিন। এতে উপকরণ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাদের কৌতূহল ও চিন্তার উদ্রেক হবে।
- উপকরণ প্রদর্শনের পাশাপাশি ছোট ছোট প্রশ্ন করুন যেন প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করতে পারে।
- উপকরণ প্রদর্শনে শিশুদের যুক্ত করুন এবং তাদের সহায়তা নিন। এতে উপকরণের প্রতি তাদের আগ্রহ তৈরি হবে।

● **উপকরণের কার্যকারিতা মূল্যায়নঃ** যে উদ্দেশ্যে উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে কি না তা মূল্যায়ন করে দেখতে হবে। নির্দিষ্ট বিষয়ে পাঠ উপস্থাপনের সময় কোন উপকরণটি সবচেয়ে কার্যকর তা দেখতে হবে। পরবর্তীতে কোনো উপকরণ ব্যবহারে অসুবিধা দেখা দিলে প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহারে সচেষ্ট হতে হবে।

**শিক্ষা সহায়ক উপকরণ সংরক্ষণ**

বিদ্যালয়ে শিক্ষাউপকরণের গুরুত্ব অনেক বেশি। বারবার এসব উপকরণ সংগ্রহ বা তৈরি করা সম্ভব নয়। সে জন্য ব্যবহারের পরপরই এগুলো নষ্ট না করে যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। যাতে প্রয়োজনের সময় ঠিকভাবে পাওয়া যায় এবং বেশ কয়েক বছর ব্যবহার করা যায়। এ কাজে শিক্ষকের ভূমিকা অগ্রগণ্য। যেমন-

- মানচিত্র, চার্ট, ছবি ইত্যাদি উপকরণ শ্রেণি, বিষয় ও পাঠ অনুযায়ী কাঠের স্ট্যান্ডে গুটিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
- কাঠের তাকে, টিন বা প্লাস্টিকের কৌটায় শিমের বিচি, তেঁতুলের বিচি, মার্বেল, গুলতি, চাকতি, নুড়িপাথর ইত্যাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। এ ক্ষেত্রে কোন কৌটায় কী উপকরণ রাখা আছে তা স্পষ্ট করে লিখে রাখতে হবে।
- ওষুধ বা সাবানের খালি কার্টুনে বাঁশ বা কাঠের তৈরি দশকের বান্ডিল, বিভিন্ন মডেল ইত্যাদি সংরক্ষণ করা যায়।
- পোস্টার পেপার বা পুরনো ক্যালেন্ডারে অঙ্কিত চার্ট, ছবি ইত্যাদি দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা যায়।
- অপেক্ষাকৃত মূল্যবান শিক্ষাউপকরণ, যেমন- যন্ত্রপাতি, রেডিও, ক্যাসেট, সহায়ক পুস্তক ইত্যাদি আলমারিতে সংরক্ষণ করা ভালো।
- বিদ্যালয় গৃহের পাকা দালানে সিলিং বাক্সে বা টিনের ঘরের পাটাতনে উপকরণ রাখা যায়। সম্ভব হলে একটি পৃথক কক্ষে উপকরণ কর্নার তৈরি করে শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক উপকরণ সাজিয়ে রাখা যায়। সংরক্ষিত উপকরণগুলো মাঝেমধ্যে পরিষ্কার করতে হবে। এ কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে হবে।

শিখন শেখানোর কাজে উপকরণের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে যথাযথ উপকরণ নির্বাচন ও তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারলে উপকরণ ব্যবহারের উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে। তাছাড়া ব্যবহৃত উপকরণের মাধ্যমে যেন শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও ভিন্নতার প্রতি সাড়া দেয়া হয় সেটিও লক্ষ রাখা বাঞ্ছনীয়।

## পাঠ পরিকল্পনা

কার্যকর শ্রেণি সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার জন্য পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন। কারণ পাঠ পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্টভাবে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কখন কী করা হবে, কীভাবে করা হবে, কে করবে, কী দিয়ে করা হবে ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। ফলে সে অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় এবং সহজেই শ্রেণি ব্যবস্থাপনা করা যায়।

### পাঠ পরিকল্পনার ধারণা

শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে পাঠ পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। পাঠ পরিকল্পনা হচ্ছে কোন একক শ্রেণী কার্যক্রমের একটি সার্বিক পরিকল্পনা যার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় শিখন শেখানো কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কখন কীভাবে পাঠ পরিচালনা করা হবে। অর্থাৎ শিখন শেখানো কার্যক্রমের উদ্দেশ্য কী হবে, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কী ধরনের আচরণিক পরিবর্তন ঘটবে, উদ্দেশ্য অর্জনেকী ধরনের শিখন অভিজ্ঞতা বা বিষয়বস্তু ব্যবহার করা হবে, কোন পদ্ধতি ও কৌশলে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হবে, এজন্য কী ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হবে, কত সময় ধরে একেকটা কার্যক্রম চলবে, কখন কোনটি করা হবে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কার কী ভূমিকা থাকবে, শিক্ষার্থীরা শিখেছে কিনা তা কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে ইত্যাদি সামগ্রিক যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাই পাঠ পরিকল্পনা। পাঠ পরিকল্পনা সাধারণত দৈনিক ভিত্তিতে কোন একটা নির্দিষ্ট পাঠ (Lesson)-এর জন্য হয়ে থাকে এবং এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

দৈনন্দিন পাঠ পরিকল্পনার মত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক কিংবা বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা থাকতে পারে। এসব পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষক পরিকল্পনা করেন কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয় (Subject) সপ্তাহ, পক্ষকাল, মাস বা বছরের কখন, কতটুকু পড়াবেন, কীভাবে পড়াবেন ইত্যাদি। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষক তার সাপ্তাহিক, মাসিক বা বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করেন ও বিষয়ভিত্তিক দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করেন।

### পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

সঠিকভাবে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করলে-

- **পাঠের উদ্দেশ্য জানা:** পাঠ পরিকল্পনা করতে গিয়ে পাঠের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য/শিখনফল জানা দরকার হয়। ফলে শিখনফল অনুযায়ী পাঠ পরিচালনা করে তা অর্জন নিশ্চিত করা যায়।
- **উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার:** পাঠ পরিচালনার জন্য কী ধরনের পদ্ধতি ও এর সহায়ক কৌশল দরকার তা আগে থেকেই ভেবে বের করা যায়। ফলে সঠিক পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে পাঠ পরিচালনাকরা যায়।
- **প্রস্তুতি ও অনুশীলনের সুযোগ:** আগে থেকেই পরিকল্পনা থাকায় শিক্ষক সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে ও অনুশীলন করতে পারে।

- **কার্যকর পাঠ পরিচালনাঃ** আগে থেকে পরিকল্পনা থাকায় সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে সুশৃঙ্খল, ধারাবাহিক ও কার্যকর পাঠ উপস্থাপন করা যায়। ফলে কোন কিছু বাদ পড়ে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকে না।
- **দক্ষ শ্রেণি ব্যবস্থাপনাঃ** পূর্ব পরিকল্পনা থাকায় পরিকল্পনা অনুসারে শ্রেণি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়, যেমন- শ্রেণি কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের যথাযথ ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদির মাধ্যমে কার্যকর শ্রেণি ব্যবস্থাপনা করা যায়।
- **শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণঃ** পাঠ পরিকল্পনায় শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থীদের করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা থাকায় সে অনুযায়ী তাদেরকে বিভিন্ন কাজে যুক্ত করে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়।
- **শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নঃ** পাঠ পরিকল্পনা থেকে মূল্যায়নের কৌশল সম্পর্কে দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় ও সে অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও ফিডব্যাক প্রদান করা যায়।
- **পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সহায়তাঃ** পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা চিহ্নিত করে তাদের চাহিদা অনুসারে পাঠপরিচালনা ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।
- **পাঠকে আকর্ষণীয় করাঃ** পূর্ব পরিকল্পনার ফলে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করে তোলা যায়। ফলে শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়।

শিখন শেখানোর ক্ষেত্রে পরিকল্পনার কাজ শুরু হয় শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে। প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের সাথে সাথে শিখনসামগ্রী হিসেবে পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সংস্করণ/শিক্ষক সহায়িকা/শিক্ষক নির্দেশিকা, প্রশ্নপুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লিখিত শিখন শেখানো সামগ্রীগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণকে সহায়তা করার জন্য। এ জন্য প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে রয়েছে সাপ্তাহিক ছুটি, অন্যান্য ছুটি, উৎসব অনুষ্ঠান ও পরীক্ষা গ্রহণ (মূল্যায়ন) ইত্যাদি। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাতে একই সময়ে বিভিন্ন শ্রেণি ও বিষয়ের একই যোগ্যতা অনুসারে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হয় সেদিকেও লক্ষ রাখা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ধারাবাহিক মূল্যায়ন, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির সাময়িক মূল্যায়নের কর্মসূচি এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠপরিকল্পনাতে দৈনিক ক্লাস রুটিন অন্তর্ভুক্ত করা আছে।

**পাঠ পরিকল্পনার ধরন**

- **বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা**

বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা হচ্ছে সারা বছর কখন কোন বিষয় পড়ানো হবে তার একটি পরিকল্পনা। প্রতি বিদ্যালয়ে নমুনা হিসেবে বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে। প্রতিবছরের শুরুতে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণ মিলে এনসিটিবি প্রণীত বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা অনুসরণ করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। অনেক সময় অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে, যেমন- প্রাকৃতিক দুর্যোগ-বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস বা অন্য কোনো কারণে বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ করা সম্ভব হয় না তখন শিক্ষককে তার পরিকল্পনায় সমন্বয় করে তা শিক্ষার্থীদের জানাতে পারেন। এতে শিক্ষক বুঝতে পারেন তিনি পাঠ্যসূচির কতটুকু শেষ করেছেন আর কতটুকু অবশিষ্ট আছে এবং এজন্য তার বাড়তি ক্লাসের প্রয়োজন হবে কি না। বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা শিক্ষককে প্রতিদিনের পাঠপরিকল্পনা বা পাঠ টীকা তৈরি করতে সহায়তা করে।

- **পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা**

দুই সপ্তাহ বা পনের দিনে এক পক্ষ হয়। এই পক্ষকাল সময়ে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে কোন কোন পাঠ দেয়া হবে, এর শিখনফল কী হবে, সেসব পাঠে কী পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা হবে, কী ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হবে, এর মূল্যায়ন পদ্ধতি কী হবে ইত্যাদি সংক্রান্ত যে পরিকল্পনা তাই পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা। বর্তমানে ডিপিএড কর্মসূচিতে শিক্ষার্থী হিসেবে আপনারা প্রতিবার এক পক্ষকাল সময় ধরে প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে অবস্থান করেন। এ সময়ে আপনারা যেসব বিষয় পড়াবেন শুরুতই তার একটি পরিকল্পনা করে নিলে পাঠকে এগিয়ে নিতে এবং সেভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সহায়ক হবে। তাছাড়া পাক্ষিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও পাঠ পরিকল্পনা সহায়তা করবে। পাক্ষিক পরিকল্পনা অবশ্যই সিলেবাস ও বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার আলোকে করতে হবে। পরবর্তীতে দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রেও পাক্ষিক পাঠ পরিকল্পনা সহায়ক হয়।

- **দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা**

প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সারা বছরের পাঠপরিকল্পনা গ্রহণ করার পর শিক্ষককে বিষয় অনুযায়ী প্রতি শ্রেণির প্রতি পাঠের জন্য ৩০-৩৫ মিনিটের দৈনিক পাঠপরিকল্পনা তৈরি করতে হয়। কিন্তু অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকগণ দৈনিক পাঠপরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব দেন না। ফলে নির্ধারিত সময়ে পাঠ্য বিষয় শেষ করতে অসুবিধা হয়। এতে শিক্ষার্থীরা পাঠে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। আবার শিক্ষকের পূর্বপ্রস্তুতি না থাকার কারণে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে শিখনশেখানো কার্যক্রম পরিচালনা এবং উপকরণের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এতে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু বুঝতে না পেরে বিরক্তিবোধ করে। ফলে শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে না। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রেণিকক্ষে কার্যকর পাঠটীকা প্রণয়ন অত্যাবশ্যক।

শিখন শেখানোর ক্ষেত্রে হার্বার্টের পঞ্চ সোপান ও পরবর্তীকালে পরিবর্তিত ত্রিসোপানিক পাঠপরিকল্পনাকে অনেকে যান্ত্রিক বলে মনে করেন। কারণ এতে শিক্ষকের স্বাধীনতা থাকে না অর্থাৎ সৃজনশীল শিক্ষকের জন্য এ পদ্ধতি উপযোগী নয়। তা ছাড়া একই নিয়মে পাঠদান করলে একঘেয়েমি এসে যায়। এই পদ্ধতিতে আধুনিক শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদানের চেয়ে শিক্ষককেন্দ্রিক পাঠদান অধিক গুরুত্ব পায়। কিন্তু বর্তমানে শিখনে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর আগ্রহ, রুচি, প্রবণতা, সামর্থ্য ও বুদ্ধিমত্তা এক নয়। আবার সকলের শেখার ধরনও ভিন্ন ভিন্ন। তাই বহুমুখী শিখন পদ্ধতিকে অনুসরণ করে পাঠ পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। এখানে একই বিষয়বস্তু ভিন্ন ভিন্নভাবে অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ রেখে পাঠদান করা হয়।

### পাঠ পরিকল্পনার কাঠামো

পাঠ পরিকল্পনার কাঠামো বিভিন্ন রকমের হতে পারে। কেউ কেউ একটি শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন অংশ বা উপাদানগুলোকে পর পর অর্থাৎ উপর-নিচ ভিত্তিতে, আবার কেউ কেউ পাশাপাশি লিখে থাকেন। এনসিটিবির শিক্ষক সংস্করণেও এক ধরনের অত্যন্ত সরল পাঠপরিকল্পনার কাঠামো অনুসরণ করা হয়েছে। এতে রয়েছে পাঠ, শিখনফল, উপকরণ, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, মূল্যায়ন, পুনরালোচনা এবং পরিকল্পিত কাজ। প্রয়োজনে নিরাময়মূলক কাজও এই কাঠামোতে দেয়া হয়েছে। বহুমুখী শিখন শেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী পাঠপরিকল্পনার কাঠামোতে- শ্রেণি, বিষয়, পাঠের শিরোনাম, পাঠের অংশ, যোগ্যতা ও শিখনফল, শিক্ষকের কার্যাবলি, মূল্যায়ন, উপকরণ সংগ্রহ ও বুদ্ধিমত্তা অনুসারে শিশুদের কার্যাবলি এভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

হার্বার্টের পঞ্চ সোপানের পর ত্রিসোপানবিশিষ্ট পাঠপরিকল্পনা বা অন্যান্য পাঠপরিকল্পনাগুলোকে আধুনিক পাঠপরিকল্পনা হিসেবে আখ্যা দেয়া যায়। শিক্ষক তার নিজের সুবিধা অনুযায়ী যেকোনো পাঠ পরিকল্পনা কাঠামো অনুসরণ করতে পারেন। ডিপিএড কোর্সের বিভিন্ন তথ্যপুস্তকে (যেমন: বাংলা, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়) পাঠ পরিকল্পনার নমুনা প্রদান করা হয়েছে।

# অধ্যায় ৩

# শিখন মূল্যায়ন

## মূল্যায়নের ধারণা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

যে কোনো শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রে রয়েছে শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করাই শিক্ষাব্যবস্থার কাজ। শিক্ষার্থীর শিখনে সহায়তার জন্য রয়েছে শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবই। শিক্ষার্থীর শিখনে সহায়তার জন্য শিক্ষককে জানতে হয় কোন শিক্ষার্থী কতটুকু শিখেছে, শিখনের কোন ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী বাধার মুখোমুখি হচ্ছে ইত্যাদি। শিক্ষকের পেশাগত দায়িত্বের অংশ হলো তার শিক্ষার্থীরা কী শিখতে পারছে এবং কী মাত্রায় ও কতটা ভালোভাবে শিখতে পারছে সে সম্পর্কে জানা (Leskes, 2002)।

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পথ চলার বাঁকে বাঁকেও মূল্যায়নের ব্যবহার করে থাকি। যেমন- আমরা বিভিন্ন মানুষের সাথে পরিচিত হই। বিভিন্ন কাজে নানা ধরনের মানুষের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব হয়। এই বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা ওই মানুষটির কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, চাল-চলন, ইত্যাদি পর্যালোচনা করি। আসলে ওই মানুষটি বন্ধু হিসেবে কতটা ভালো বা মন্দ হবে তা যাচাই করারচেষ্টা করি। এই যাচাই করার প্রক্রিয়াটিই মূল্যায়ন।

একইভাবে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিক্ষার সাথেও সম্পর্কিত। গ্রনলান্ড ও লিন (১৯৯০)-এর মতে, শিক্ষণ উদ্দেশ্যের কতটুকু শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পেরেছে তা নির্ণয়ের জন্য তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হলো মূল্যায়ন। অর্থাৎ মূল্যায়ন হলো একটি উপকরণ বা কৌশল, যার দ্বারা শিক্ষার্থীরা তাদের জন্য নির্ধারিত শিখনফল কতটা ভালোভাবে অর্জন করতে পেরেছে তা নিরূপণ করা বা মাপা যায়। মূল্যায়নের পারিভাষিক শব্দ হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষাবিদগণ Assessment আবার অনেকেই Evaluation ব্যবহার করেছেন। এমনকি *Oxford Advanced Learner's Dictionary*-তে Assessment -এর প্রতিশব্দ হিসেবে Evaluation শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম অনযায়ী একজন শিক্ষার্থীর শিখনের অবস্থান জানার অন্যতম উপায় হচ্ছে সে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির শিখনফল কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তা যাচাই করা। শিক্ষার্থীর শিখনফল যাচাইয়ের এই প্রক্রিয়াকেই আমরা বলছি মূল্যায়ন। এই মূল্যায়নের প্রধান লক্ষ্য হলো: পাঠের বিষয়বস্তু শেখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করা(Freeman & Lewis, ১৯৯৮)। মূল্যায়ন আবার শিক্ষার্থীর শিখন মান উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সহায়তা করে (Cartwright, Weiner, & Streamer-Veneruso, ২০০৯)। মূল্যায়নের ফল বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের নানা ধরনের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মূল্যায়ন করেন এবং মূল্যায়নের ফল ব্যবহার করে থাকেন। যেমন: শিক্ষার্থীর শিখনে আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য মূল্যায়নের ফল ব্যবহৃত হয়। আবার একই মূল্যায়ন শিক্ষককে শিক্ষণ পদ্ধতি যাচাই করার সুযোগ করে দেয় (Rust, ২০০২)। একইভাবে এই মূল্যায়ন অভিভাবকদেরকে তাঁদের সন্তানদের অগ্রগতি সম্পর্কে এক ধরণের ধারণা দেয় এবং তাদের করণীয় নির্ধারণে সহায়তা করে। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া ও শিক্ষকদের শিক্ষণ দক্ষতা সম্পর্কে অবগত হয়। যা সার্বিকভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কারণে মূল্যায়ন করে থাকি। মূল্যায়নের নানামুখী উদ্দেশ্য রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে:

১. শিক্ষার্থীর শিখনে সহায়তা করা।
২. শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যাবলি ঠিকমত অগ্রসর হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা।
৩. শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি, সাফল্য ও দুর্বলতা জানা এবং তাদের শিখন প্রক্রিয়ার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।
৪. নির্ধারিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থী কতটুকু শিখনফল অর্জন করতে পেরেছে তা যাচাই করা।
৫. শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা/কৃতিত্বের ভিত্তিতে প্রোফাইল তৈরি করা।
৬. কোনোকোর্স শেষে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব অনুসারে সনদপত্র প্রদান করা।
৭. শিক্ষার্থীদের অবস্থান সম্পর্কে জানা এবং তাদের অবস্থান অনুযায়ী দল গঠন করা ।
৮. শিক্ষকের কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের পাঠদান শিক্ষার্থীরা কতটুকু বুঝতে পেরেছে তা যাচাই করা এবং করণীয় নির্ধারণ করা।
৯. শিক্ষকের নিজস্ব মান উন্নয়ন সহায়তা করে এবং তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে সহায়তা করে।
১০. অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করে এবং শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলে।

নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল:

- **শিক্ষার্থীর শিখনকে সহায়তা করা**

মূল্যায়নের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর শিখনকে সহায়তা করা। শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, যেকোনো মূল্যায়নের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীর শিখনকে উৎসাহিত করা (Black et al., 2005; Freeman & Lewis, 1998)। মূল্যায়ন কৌশল শিক্ষার্থীর শিখনকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করতে পারে। যেমন– শ্রেণি কক্ষে মৌখিক প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করলে তার পাঠের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। একইসাথে শিক্ষার্থী শিক্ষককে তার শুভাকাঙ্ক্ষী ভাবতে শুরু করে। ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে। যা সার্বিকভাবে শিক্ষার্থীর শিখনে সহায়তা করে।

- **শ্রেণি শিখন শেখানো কার্যাবলির অগ্রগতি যাচাই করে**

একজন শিক্ষকের অন্যতম কাজ হচ্ছে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা। শিক্ষক পাঠদানের ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করে তাদের শিখন শেখানো কার্যাবলির অগ্রগতি যাচাই করবেন। শিক্ষার্থীদের কোনো বিষয় বুঝতে সমস্যা হলে তা আরো সহজ করে বুঝিয়ে বলবেন। যাতে শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অগ্রসর হয় এবং শিখন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

- **অগ্রগতি, সাফল্য ও দুর্বলতা জানা এবং শিখন প্রক্রিয়ার উন্নয়নে ব্যবস্থা নেয়া**

মূল্যায়নের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর অগ্রগতি-অবনতি, সাফল্য-ব্যর্থতা, সবলতা-দুর্বলতা ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। শিক্ষক শিক্ষার্থীর দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করার মাধ্যমে তার শিখনের উন্নয়নে কোনো ধরনের উদ্যোগ নেয়া তা ঠিক করতে পারেন। শিক্ষার্থীর শিখনের উন্নয়নের জন্য তাকে ও তার অভিভাবককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারেন।যেমন: মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠদানের কোনো একটি বিষয়ের

উপর অনুশীলনের সুযোগ পায়। শিক্ষক তাদের এই কাজের মান যাচাই করে তাদের অগ্রগতি কিংবা দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করতে পারেন। অবশেষে তিনি ফলাবর্তন (Feedback) প্রদানের মাধ্যমে তাদের শিখনে সহায়তা করতে পারেন।

- **শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জনের মাত্রা যাচাই**

মূল্যায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক শিখনফল অর্জনের মাত্রা যাচাই করা। অর্থাৎ মূল্যায়নের মাধ্যমেই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট বিষয়ের শিখনফল কতটুকু অর্জিত হল সে সম্পর্কে তথ্য পান। যেমন ধরা যাক, গণিত বিষয়ের একটি শিখনফল হচ্ছে- এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা দুই অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যার সাথে দুই অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যার যোগ করতে পারবে। কিন্তু পাঠ শেষে দেখা গেল কিছু শিক্ষার্থী এটা পারছে না। কারণ অনুসন্ধানে দেখা গেল, তারা এক অঙ্কের সাথে এক অঙ্কের যোগই ঠিক মত পারছে না। ফলে শিক্ষকের অন্যতম কাজ হচ্ছে- এসব শিক্ষার্থীদের এক অংকের সাথে এক অঙ্কের যোগ ভালোভাবে বুঝিয়ে তারপর দুই অঙ্কের সাথে দুই অঙ্কের যোগ করানো।

- **পারদর্শিতা/কৃতিত্বের ভিত্তিতে প্রোফাইল তৈরি**

শ্রেণিকক্ষে নিয়মিত মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা/ কৃতিত্বের ভিত্তিতে প্রোফাইল তৈরি করতে পারেন। যার ভিত্তিতে শিক্ষক সহজেই একজন শিক্ষার্থীর অগ্রগতি বা অবনতি সম্পর্কে জানতে পারেন এবং তার শিখনের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়নের ফল সরল এবং সাদাসিধাভাবে অনেকটা সংক্ষেপেই প্রকাশিত হয়। যেমন–বর্ণ গ্রেড (যেমন– এ+, এ,বি ইত্যাদি), সাংখ্যিক নম্বর, উত্তীর্ণ, অনুত্তীর্ণ ইত্যাদি। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা বা কৃতিত্ব সম্পর্কে সাধারণ ধারণামাত্র দিতে পারে।

- **সনদ প্রদান**

মূল্যায়নের একটি বহুল ব্যবহৃত বা গুর"ত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে শিক্ষার্থীকে তার কৃতিত্বের স্বীকৃতি দেয়া। অর্থাৎ শিক্ষার্থী কোনো কোর্স বা বিষয়ে নির্ধারিত মানদন্ড। (Particular Standard) অর্জন করতে পেরেছে কি না তার একটি প্রমাণ বা সনদ প্রদান করা হয় মূল্যায়নের মাধ্যমে (Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 2005)। যেমন– বার্ষিক পরীক্ষা,প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা ইত্যাদি। শিক্ষার্থীকে তার অর্জনের সনদ প্রদান করার বিভিন্ন উপায় আছে। এই সনদ হতে পারে শুধু পাস-ফেল (কৃতকার্য বা অকৃতকার্য) সম্পর্কিত; 'যোগ্য' অথবা 'এখনো যোগ্য নয়'। এ ধরনের মূল্যায়ন শিক্ষার্থী পারদর্শিতার একটি বিশেষ স্তর অর্জন করেছে কি না সে সম্পর্কে সনদ প্রদান করে। এই সনদ পরবর্তী স্তরে অধ্যয়ন বা কাজের যোগ্যতার প্রমাণপত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

- **শিক্ষার্থীদের অবস্থান জানা এবং অবস্থান অনুযায়ী দল গঠন করা**

মূল্যায়নের মাধ্যমে আমরা একজন শিক্ষার্থী কোন অবস্থানে আছে সে সম্পর্কে জানতে পারি। যেমন: বছরের শুরুতেই আমরা শিক্ষার্থীদের পূর্ববর্তী বছরের শিখনফল কতটুকু অর্জন করেছে তা জানার জন্য একটি মূল্যায়ন করি। যার মাধ্যমে তাদের অবস্থান নির্ণয় করতে পারি। এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে আমরা বেসলাইন মূল্যায়ন নামে নামকরণ করেছি। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অবস্থান নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সবচেয়ে দুর্বল শিক্ষার্থীদের লাল দলে, মধ্যম মানের শিক্ষার্থীদের হলুদ

দলে এবং সবচেয়ে ভালো মানের শিক্ষার্থীদের সবুজ দলে নির্বাচিত করি। যার ভিত্তিতে পরবর্তী ৩-৪ মাস এসব শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া উন্নতকরণে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন।

- **শিক্ষকের শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মানোন্নয়ন করা**

শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষককে তার শিক্ষণ পদ্ধতি ও কলাকৌশল পর্যালোচনা করার সুযোগ প্রদান করে। অন্য কথায়, মূল্যায়ন শিক্ষককে তার শ্রেণিতে ব্যবহৃত শিক্ষণ পদ্ধতির প্রভাব যাচাই করার সুযোগ প্রদান করে। যেমন–শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা কোনো প্রশ্নের উত্তর কতটা সঠিকভাবে দিতে পারছে; সব শিক্ষার্থী উত্তর দিতে পারছে কি না ইত্যাদি তথ্যের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষক তার শিক্ষণ পদ্ধতির মান যাচাই করতে পারেন। যদি শিক্ষক দেখতে পান যে অনেক শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিতে পারছে না, তখন তাকে উক্ত বিষয়ে পাঠ উপস্থাপন পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে।

- **শিক্ষকের নিজস্ব মান উন্নয়ন এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে**

শিক্ষার্থীদের মতই মূল্যায়ন শিক্ষকের নিজের মান উন্নয়নে সহায়তা করে। শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষক মূল্যায়নের মাধ্যমে নিজের পাঠ সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন। অন্যভাবে বলা যায়, শিক্ষকের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করা। একটি শ্রেণির সব শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটানো। তাই মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া কতটা অর্জিত হচ্ছে বা কোন পর্যায়ে আছে সে সম্পর্কে ধারণা নিতে পারেন। একইভাবে তিনি প্রতিটি আলাদা আলাদা শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়ার উন্নয়নে নতুন করে কোনো পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়নের সুযোগ পান।

- **অভিভাবক ও অন্যদের শিক্ষার্থীর অগ্রগতি জানানো**

শিক্ষার্থীর অগ্রগতি কতটা হয়েছে বা শিক্ষার্থী কোনো কাজের জন্য কতটা যোগ্য–এ বিষয়ে অভিভাবককে অবহিত করা মূল্যায়নের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। এর ফলে শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়ায় অভিভাবকের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়, নিজ সন্তানের শিখন প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দানের সুযোগ লাভ করেন। যেমন: তৃতীয় শ্রেণির সব বিষয়ের ওপর একটি মাসিক পরীক্ষা নেয়া হল। এই ফলাফলে দেখা গেল একজন শিক্ষার্থী বাংলা ও ইংরেজিতে ভালো ফল করলেও গণিতে খারাপ করেছে। অতএব তার সার্বিক উন্নয়নের জন্য গণিতের ওপর বেশি জোর দিতে হবে। গণিতের কোন অংশে সে দুর্বল সেটা খুঁজে বের করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষক এ বিষয়টি তারা অভিভাবককে জানালে তারাও শিক্ষার্থীর উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারেন।

## পরিমাপ, অভীক্ষা, মূল্যযাচাই ও মূল্যায়ন

পরিমাপ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করা। যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Measurement। আর শিক্ষায় পরিমাপ হলো শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির পরিমাণ নির্ণয় করা। গ্রনলান্ড ও লিন (১৯৯০)-এর মতে, কোনো ব্যক্তির মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য কতটুকু রয়েছে তার সংখ্যাগত বর্ণনা লাভের প্রক্রিয়াই হলো পরিমাপ। বিভিন্ন অভীক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সংখ্যায় প্রকাশের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কোন পরীক্ষার ফল বা কোন কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করে তার সংখ্যাগত প্রকাশই হল পরিমাপ। পরিমাপ মূল্যায়নের একটি অংশ। শিক্ষার উদ্দেশ্য কতটা অর্জিত হয়েছে তা জানতে পরিমাপ মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে।

অভিক্ষা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Test। সাধারণভাবে যে কোন পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সেট হচ্ছে অভিজ্ঞা। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা যে প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে উত্তর প্রদান করে তাই অভীক্ষা। গ্রনলান্ড ও লিন (১৯৯০)-এর মতে, অভীক্ষা হচ্ছে একসেট প্রশ্নের সমাহার (Test is a set of question)। মূলত- শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাইয়ের লক্ষ্যে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য যে প্রশ্নপত্র বা উপকরণ বা কৌশল ব্যবহৃত হয় তাকে অভিক্ষা বলে। অভীক্ষার মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের অবস্থান জানতে পারি এবং শিখনের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলতে পারি। অভীক্ষা তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন হতে পারে যেমন: নৈর্ব্যক্তিক, সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন ইত্যাদি। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন কয়েক ধরনের হতে পারে যেমন: বহুনির্বাচনি বা মাল্টিপল চয়েস, শূন্যস্থান পূরণ, এক কথায় উত্তর, মিলকরণ, সত্য-মিথ্যা নিরূপণ ইত্যাদি।

সাধারণভাবে আমরা কোন জিনিসের বা বস্তুর মূল্য যাচাইয়ের প্রক্রিয়াকেই বলি মূল্যায়ন। মূল্যায়ন হল একটি প্রক্রিয়া, যেখানে শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা, তা পর্যালোচনা করা এবং পর্যালোচনার ফল শিক্ষার্থীদের শিখন মান উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা হয়। মূল্যায়ন দ্বারা শিক্ষার্থীরা কী মাত্রায় তাদের পাঠ্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছে; একই সাথে তা বুঝতে পেরেছে এবং অন্যান্য সামর্থ্যের বিকাশ ঘটেছে তা যাচাই করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের একাধিক পর্যায়ে মূল্যায়ন করা হয়। যেমন-পাঠ চলাকালে শ্রেণিশিক্ষক দ্বারা; বছরের বিভিন্ন সময়ে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা এবং প্রাথমিক স্তর শেষে পরীক্ষার মাধ্যমে (যেমন–প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা–(Primary Education Completion Examination) শিক্ষার্থীরা মূল্যায়িত হয়। মূল্যায়নের ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে Assessment I Evaluation ব্যবহার করে থাকি।

**Assessment:** শিক্ষার্থীর শিখন, শিক্ষকের শিক্ষণ ও শ্রেণি কার্যক্রমের উন্নয়নে সহায়তা করে। Assessment একটি চলমান প্রক্রিয়া যা মূলত শিক্ষার্থীরা কোন প্রক্রিয়ায় শেখে সে বিষয়টির ওপর জোর দেয়। এই মূল্যায়ন থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ওই শ্রেণিকক্ষের উন্নয়নে ব্যবহার করেন। এটা কোর্স চলাকালীন সময়ে হয়ে থাকে যাতে শিক্ষার্থীদের ভুলগুলো সংশোধনের উপায়গুলো নির্ধারণ করা যায়।

**Evaluation:** কোর্সের শেষে যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে ইংরেজিতে Evaluation বলে। এটা মূলত শিক্ষার্থীদের গ্রেড প্রদানের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কি শিখতে পেরেছে তা জানার জন্য ব্যবহার করা হয়। এখানে শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের তেমন সুযোগ থাকে না।

## শিখনফল, শিখন শেখানো কার্যাবলি ও মূল্যায়নের পারস্পরিক সম্পর্ক

সাধারণভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা শিখবে বলে ধরে নেয়া হয় তাই শিখনফল। এছাড়া এভাবেও বলা যায়, কোন একটি শিখন বিষয়ে শিখন শেখানো কার্যক্রম থেকে শিক্ষার্থীরা যে পারদর্শিতা বা দক্ষতা অর্জন করে তাই শিখনফল। মূলত প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকেই শিখনফল নির্ধারণ করা হয়। আর শিখনফলের আলোকেই প্রণয়ন করা হয়পাঠ্যবই। শিখনফল অর্জনের জন্যই শিক্ষকের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করা হয়। শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয় মূল্যায়নের মাধ্যমে। তাই শিখনফল, শিখন শেখানো কার্যাবলি ও মূল্যায়ন একটি আরেকটির সাথে খুবই ঘষ্ঠিভাবে জড়িত।

নিচে সংক্ষেপে দেখানো হলো:

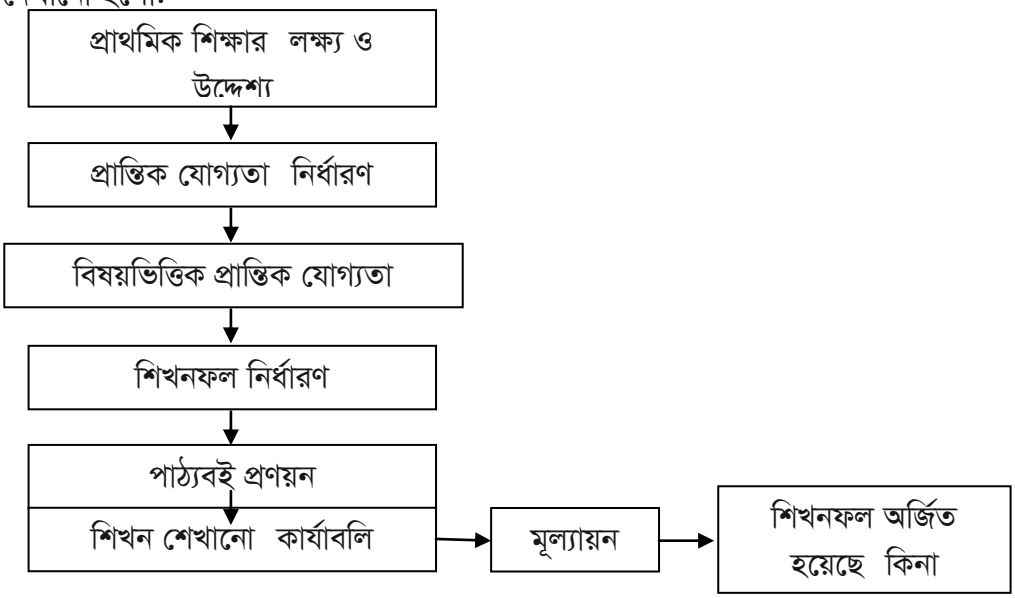


চিত্র ৩.১: শিখনফল, শিখন শেখানো কার্যাবলি ও মূল্যায়নের পারস্পরিক সম্পর্ক

নিচে একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়গুলো আলোচনা করা হল-

প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে- 'শিশুকে গাণিতিক ধারণা, যৌক্তিক চিন্তা ও সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা'। এই উদ্দেশ্যের আলোকে প্রাথমিক স্তরের জন্য দুটি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে:

১. গাণিতিক ধারণা ও দক্ষতা অর্জন করা।

২. যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারা।

এরপর উল্লিখিত দুটি প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে বিষয় ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন: বিষয়ভিত্তিক একটি প্রান্তিক যোগ্যতা হচ্ছে (৯) দুই বা ততোধিক সংখ্যার যোগ ও এতদ্‌সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারা (হাতে রেখে ও হাতে না রেখে)।

বিষয়ভিত্তিক এই প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য শ্রেণিভিত্তিক দুটি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

১.উপকরণ ব্যবহার করে যোগ করতে পারবে (যোগফল হবে অনূর্ধ্ব ১০০)।

২.হাতে না রেখে ও রেখে অনূর্ধ্ব দুই অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা যোগ করতে পারবে (যোগফল হবে অনূর্ধ্ব ১০০)।

উল্লিখিত বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে দুটি শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। শিখনফল দুটি হচ্ছে- এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

২.১ হাতে না রেখে দুই অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা উপরে-নিচে ও পাশাপাশি যোগ করতে পারবে (যোগফল অনূর্ধ্ব ১০০)।

২.২ হাতে রেখে দুই অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা ওপরে-নিচে ও পাশাপাশি যোগ করতে পারবে (যোগফল অনূর্ধ্ব ১০০)।

এই শিখনফল দুটি অর্জন করার লক্ষ্যে পাঠ্য বইয়ে যোগ অঙ্কের অধ্যায় দেয়া হয়েছে। শিক্ষক শিখন শেখানো কার্যাবলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপকরণ ব্যবহার করে যোগ করতে শেখাবেন। এছাড়াও তিনি শিক্ষার্থীদের

হাতে না রেখে ও রেখে অনূর্ধ্ব দুই অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা যোগ করতে শেখাবেন। ধরা যাক শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে উল্লিখিত শিখনফল দুটি অর্জনের জন্য শিখন-শেখানো কার্যাবলির মাধ্যমে চেষ্টা করলেন। তিনি শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়ন করে দেখলেন শিক্ষার্থীরা শিখনফল অর্জন করতে পারল কিনা। দেখা গেল শিক্ষার্থীরা দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার হাতে না রেখে উপরে নিচে ও পাশাপাশি যোগ করতে পারছে। কিন্তু তারা হাতে রেখে যোগ করতে পারছে না। ফলে তিনি পুনরায় শিক্ষার্থীদের হাতে রেখে যোগের ওপর একটি পাঠ দিলেন। এবার যদি শিক্ষার্থীরা শিখনফল অর্জন করতে পারে তবে তিনি পরবর্তী পাঠে যাবেন। আর যদি শিক্ষার্থীদের শিখনফল পরিপূর্ণভাবে অর্জিত না হয় তবে তিনি শিখনফল অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন। মূলত এভাবেই শিখনফল, শিখন শেখানো কার্যাবলি ও মূল্যায়ন একে অপরের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

## মূল্যায়নের ধরন

আমরা দেখেছি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মূল্যায়ন করা হয়। যেমন কোন শিক্ষার্থী তৃতীয় শ্রেণিতে তার জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন করেছে কিনা সে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আবার কোন শিক্ষকের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে বাক্য গঠন কীভাবে করতে হয় তা শেখানো । বাক্য গঠন করার দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। মূল্যায়নের উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে মূল্যায়নকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে গাঠনিক মূল্যায়ন (Formative Assessment) আর অন্যটি সামষ্টিক মূল্যায়ন (Summative Assessment)। স্ক্রিভেন (Scrieven) ১৯৬৭ সালে গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের ধারণা প্রবর্তন করেন (তপন ও রশিদ, ২০১৪)। নিচে গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হল।

### গাঠনিক মূল্যায়ন

যে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হওয়া থেকে শেষ পর্যন্ত চলে তাই গাঠনিক মূল্যায়ন (মালেক, বেগম, ইসলাম ও রিয়াদ, ২০০৯)। প্রতিটি শিক্ষার্থীর নির্ধারিত জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের জন্য তাকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে গাঠনিক মূল্যায়ন একটি অপরিহার্য কৌশল হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। গাঠনিক মূল্যায়ন এমন পদ্ধতি, যার মাধ্যমে অনবরত শিক্ষার্থীর অগ্রগতি নিরীক্ষা করা হয়। এটি শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো প্রক্রিয়া চলাকালীন অ্যাকাডেমিক বছরের প্রায় সম্পূর্ণ সময় ধরে পরিচালিত হয়। তবে এটা কোর্স বা অ্যাকাডেমিক বছরের শেষে অনুষ্ঠিত হয় না।

গাঠনিক মূল্যায়নে বহু উপায় বা কৌশল ব্যবহার করে শিক্ষার্থী কী জানে, কী করতে পারে এবং কী করা প্রয়োজন তা নিরূপণ করা হয় এবং তা ভবিষ্যৎ পাঠ-পরিকল্পনার জন্য ফলাবর্তন (Feedback) হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ই নির্দিষ্ট শিখনফলের (Learning Outcomes) সাপেক্ষে শিক্ষার্থীর শিখন যাচাই করার সুযোগ লাভ করে। এই প্রক্রিয়ার প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো ফলাবর্তন। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ই ফলাবর্তন লাভ করে এবং তা ব্যবহার করে তাদের শিখন শেখানোর প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটাতে পারে (Rust, 2002)। শিক্ষাবিদগণ গাঠনিক মূল্যায়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'Formative assessment is a process used by teachers and students during instruction that provides feedback to adjust ongoing teaching and learning to improve students' achievement of intended instructional outcomes' (Wylie, 2008, p.3). অর্থাৎ গাঠনিক মূল্যায়ন হলো একটি প্রক্রিয়া, যা শ্রেণিকার্য চলাকালীন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ই ব্যবহার করে; যেখান থেকে প্রাপ্ত ফলাবর্তনের ভিত্তিতে চলমান শিখন শেখানো কার্যাবলিতে পরিবর্তন আনা হয়, যাতে তা নির্ধারিত শিখন উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীর শিখন/পারদর্শিতার উন্নয়ন ঘটায়।

উল্লিখিত সংজ্ঞার আলোকে গাঠনিক মূল্যায়নের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা যায়। এগুলো হচ্ছে-

- এটা মূলত শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন
- শিখন প্রক্রিয়ার অগ্রগতিই এ মূল্যায়নের মূল লক্ষ্য
- এই মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে তার শিখন/পারদর্শিতার সাফল্য সম্পর্কে অবহিত করেন
- শিক্ষার্থীদের কোন পাঠ বুঝার ক্ষেত্রে কোথায় অসুবিধা হচ্ছে তা অনুসন্ধান করেন
- শিক্ষার্থীরা কীভাবে তাদের সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারে তার নির্দেশনা দেন
- মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর শিখন বা পারদর্শিতার সবল দিক চিহ্নিত করা হয়
- একই সাথে শিখনের দুর্বলতা বা সমস্যা চিহ্নিত করা হয়।
- শিখনফল অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত প্রচেষ্টা অব্যহত রাখা।

গাঠনিক মূল্যায়ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দুইভাবেই হতে পারে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে অভীক্ষা, অ্যাসাইনমেন্ট ইত্যাদির মাধ্যমে মূল্যায়ন হতে পারে আবার অনানুষ্ঠানিকভাবে শ্রেণিকক্ষে কুইজ, বিষয়ভিত্তিক মৌখিক ও লিখিত প্রশ্ন, দলীয় কাজ ও উপস্থাপন, জোড়া কাজ বা ব্যক্তিগত পঠন, প্রতিযোগিতা, খেলা ইত্যাদির মাধ্যমেও মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

গাঠনিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর চেষ্টা অব্যহত রাখেন। যদি কোন কারণে কোন শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জিত না হয় তবে শিক্ষক এর পিছনের কারণ অনুসন্ধান করবেন। এরপর তিনি সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন। যাতে শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জিত হয়। অতঃপর তিনি নুতন ভাবে একটি পাঠ পরিকল্পনা করে পুনরায় শিখন শেখানো কাজ পরিচালনা করবেন। যাতে শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জিত হয়। নিচে চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো-

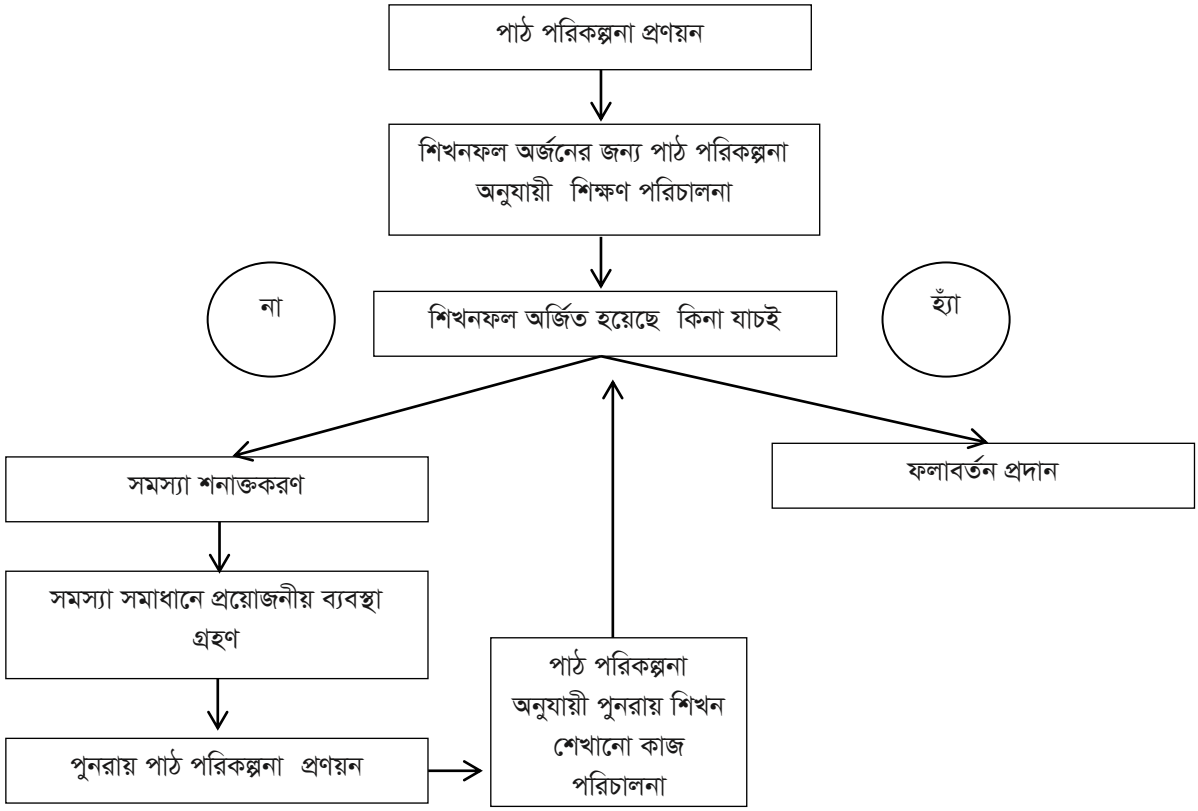


চিত্র ৩.২: গাঠনিক মূল্যায়নের প্রক্রিয়া

গাঠনিক মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর শিখনে সহায়তা করে বলে অনেক শিক্ষাবিদ এর নাম দিয়েছেন 'শিখনের জন্য মূল্যায়ন' (Assessment for Learning-AfL) (Glasson, 2009)। শিখনের জন্য মূল্যায়ন (AfL)সরাসরি শিখনের সাথে জড়িত। এটি শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণকে ত্বরান্বিত করে এবং শিক্ষকের পাঠ-পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ শিখনফল অর্জন করতে সাহায্য করে। শিক্ষক এ শিখন মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর সমস্যা শনাক্ত করেন ও তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানে নিয়মিত ফলাবর্তন প্রদান করেন।

গাঠনিক মূল্যায়নের একটি অংশ হল শিখনের মাধ্যমে মূল্যায়ন (Assessment as Learning- AsL)। শিখনের মাধ্যমে মূল্যায়ন (অংখ) হল শিক্ষার্থীর চলমান শিখন স্ব-মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। যা তাদের শিখনকে আরও বোধগম্য ও স্থায়ী করে। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী নিজেকে মূল্যায়ন করবে। শিক্ষার্থীরা নিজে-নিজে, জোড়ায়-জোড়ায়, প্রতিফলন লিখন, নতুন ও পুরাতন শিখনের ধারণাচিত্র তৈরি, লক্ষ্য নির্ধারণ, অর্পিত দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষকের সাথে আলোচনা করবে। তারা তাদের শিখন অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবে। ব্ল্যাক এবং উইলিয়াম (১৯৯৮) ব্যাখ্যা করেন যে, শিক্ষার্থীরা স্ব-মূল্যায়নে দক্ষ হলেই গাঠনিক মূল্যায়ন সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হয় যার ফলে তারা তাদের শিখনের উদ্দেশ্য এবং তা অর্জনের উপায় বের করতে পারে।

**সামষ্টিক মূল্যায়ন**

সাধারণভাবে কোন কাজের শেষে ওই কাজের সামগ্রিক ফলাফল, এর প্রভাব ও অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ণয়ের জন্য যে মূল্যায়ন করা হয় তাই সামষ্টিক মূল্যায়ন। সামষ্টিক মূল্যায়ন একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর একটি বিশেষ সময়ে শিক্ষার্থী কী জানে বা জানে না তা নিরূপণ করার জন্য ব্যবহার করা হয় (Garrison & Ehringhaus, 2007)। যেমন–বাংলাদেশের বিদ্যালয়ে প্রথম, দ্বিতীয় সাময়িক (তিন/চার মাস পর পর) এবং বছরের শেষে যে মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণভাবে কোনো কোর্স, ইউনিট, অধ্যায়, সেমিস্টার বা

টার্মের শেষে এই মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হয়। এ থেকে শিক্ষার্থী কোনো কোর্স বা পাঠের বিষয়বস্তু কতখানি আয়ত্ত করতে বা শিখতে পেরেছে তা জানা যায়। গিবস (১৯৯৪) এর মতে, Summative assessment takes place at the end of a term or a course and is used to provide information about how much students have learned and how well a course has worked. (p. vii) অর্থাৎ সামষ্টিক মূল্যায়ন কোনো টার্ম বা কোর্সের শেষে অনুষ্ঠিত হয় এবং শিক্ষার্থীরা কতটুকু শিখতে পেরেছে ও কতটা ভালোভাবে কোর্সটি কাজ করেছে সে সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।

এই মূল্যায়ন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে সাধারণত গ্রেড বা নম্বর প্রদান করা হয় এবং শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যেমন–শিক্ষার্থীকে উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ; কিংবা পাস-ফেল হিসেবে ফলাবর্তন দেয়া হয়। শিক্ষার্থীর শিখন সমস্যা সমাধান বা উন্নয়নের সুযোগ থাকে না।

এই মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর শিখন অবস্থা এবং মান সম্পর্কে শুধু তথ্য প্রদান করে বলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের শিক্ষাবিদগণ (Glasson, 2009) এর নাম দিয়েছেন 'শিখনের বা পারদর্শিতার মূল্যায়ন' অথবা (Assessment of Learning- AoL)। নির্দিষ্ট সময় বা অধ্যায় শেষে মূল্যায়ন-ই শিখনের মূল্যায়ন। এতে শিক্ষাক্রমের শিখনফল অর্জনের প্রতি ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। শিক্ষার্থী এ মূল্যায়নের পর কোন বিস্তারিত ফলাবর্তন প্রাপ্ত হয় না বরং গ্রেড বা নম্বর পেয়ে থাকে। মূল্যায়নের ফলাফল যা-ই হোক না কেন শিক্ষক পরবর্তী পাঠে চলে যান, কেননা তিনি সিলেবাস সমাপ্তির দিকে বেশি মনোযোগী থাকেন। শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর ফলাফলের প্রতি ও উন্নয়নের প্রতি মনোযোগী না হন তাহলে এ ধরনের মূল্যায়নের খুব কমই কার্যকারিতা পাওয়া যায়।

সারণি ৩.১: গাঠনিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের পার্থক্য

| বিষয়/দিক | গাঠনিক মূল্যায়ন | সামষ্টিক মূল্যায়ন |
|---|---|---|
| উদ্দেশ্য | শিক্ষণ-শিখন কাজের অগ্রগতি যাচাই করা এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাফল্য ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা | চূড়ান্ত অবস্থা জানা, শিক্ষার্থীদের গ্রেড বা সনদপত্র প্রদান করা |
| বিষয়বস্তুর পরিসর | সংকীর্ণ পরিসর থেকে কিন্তু বিস্তারিতভাবে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে | ব্যাপক পরিসর থেকে কিন্তু সাধারণভাবে |
| পদ্ধতি | পর্যবেক্ষণ, দৈনিক অ্যাসাইনমেন্ট, কুইজ | অভীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষা, প্রজেক্ট |
| ব্যাপ্তি | প্রতিদিন | সাপ্তাহিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাষিক, বার্ষিক |

## Norm-referenced assessment

এটা হচ্ছে এমন এক ধরনের মূল্যায়ন যা একটি নির্দিষ্ট অভীক্ষার মাধ্যমে একদল শিক্ষার্থীর কৃতীত্বের মধ্যে তুলনা করে। এই মূল্যায়ন কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর তথ্য দেয় তবে এখানে ভুল তথ্য আসার সম্ভাবনা বেশি থাকে। যেমন একদল শিক্ষার্থী কোচিং করছে এবং অন্য আরেকটি দল কোচিং করছেনা। যখন একটি মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের ওপর কোচিংয়ের কোন প্রভাব আছে কিনা তা দেখা হয় তখই সেটা Norm-referenced assessment হয়। এখানে মূলত একজন শিক্ষার্থীর সাথে অন্য আরেকজন শিক্ষার্থীর তুলনা করা হয়।

## Criterion-referenced assessment

এটা হচ্ছে এমন এক ধরনের মূল্যায়ন যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পূর্বের কৃতিত্বের সাথে বর্তমান কৃতিত্বের তুলনা করা হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর পূর্ববর্তী ফলাফলের সাথে বর্তমানের ফলাফলের তুলনা করে দেখা হয় শিক্ষার্থীর উন্নয়ন ঘটেছে কিনা। এখানে নির্দিষ্ট কাজের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর Criteria ঠিক করে নেয়া হয় যার সাথে তার পূর্ববর্তী কাজের তুলনা করা হয়। এখানে অন্য শিক্ষার্থীর সাথে তুলনাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। যার ফলে শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রতিযোগিতার মনোভাব কমে আসে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীর নিজের পূর্ব ও পরের কৃতিত্বের ফলাফলের মধ্যে তুলনা করলে তার উন্নয়ন সাধিত হওয়ার সুযোগ বেশি থাকে।

## একীভূত শিক্ষার আলোকে মূল্যায়নে নমনীয়তা

মূল্যায়নের সময় শিক্ষার্থীদের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জেন্ডার,সংস্কৃতি, ভাষা, প্রতিবন্ধিতা, আর্থ সামাজিক-অবস্থা, ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বিশেষ নজর দিতে হয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে প্রচলিত মূল্যায়নের সময় এসব বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে মূল্যায়িত হয় না। মূল্যায়নের সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্যমান ভিন্নতাকে বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন শিক্ষার্থী বিভিন্নভাবে শেখে-এই বিবেচনা থেকে সকলের জন্য উপযুক্ত মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে শিখন চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষার্থীর জন্য বিভিন্ন প্রকার মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োগ করা প্রয়োজন।
একীভূত শিক্ষার আলোকে মূল্যায়নের জন্য যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখা প্রয়োজন:

- **প্রশ্নপত্র প্রণয়ন:** একজন শিক্ষক যখন তার শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য কোন এক সেট প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন তখন তাকে সব ধরনের শিক্ষার্থীর কথা বিবেচনায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে প্রশ্নপত্রের ভাষা, শব্দের ব্যবহার এবং সময় ইত্যাদির উপর নজর রাখবেন। উদাহরণস্বরূপ-
    - সাধারণত শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের ভাষার ওপর দক্ষতা খুবই কম থাকে। তারা ছোট ছোট বাক্যের মাধ্যমে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করেন এবং কঠিন শব্দ তারা বোঝে না। তাই প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সময় এমন কোন শব্দ ব্যবহার না করা যা তাদের বুঝতে সমস্যা হয়।
    - সাধারণত দৃষ্টি প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীরা শ্রুতি লিখন পদ্ধতিতে যে কোন ধরনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। তাই যখন কোন প্রশ্নের উত্তর চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলা হয়, তখন ওই শিক্ষার্থীর জন্য এর উত্তর দেয়া সম্ভব হয় না। আর যদি তারা উত্তর দিয়েও থাকেন তবে তা ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। তাই প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সময় তাদের কথা বিবেচনায় রাখা ও সম্ভব হলে ওই ধরনের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া বা অথবা দিয়ে দেয়া কিংবা দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ব্যাখ্যা লিখতে বলা।
    - বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, আদিবাসী শিশুরা বাংলা ভাষা খুব ভালো ভাবে বুঝতে পারে না। তাই যখন জাতীয়ভাবে বা আদিবাসী শিশু রয়েছে এমন বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে তখন খুব সহজ বাংলা ব্যবহার করা।
    - এছাড়াও প্রশ্নপত্র প্রণয়ের সময় ধর্মীয় বিষয়, নারী-পুরুষের সমতা এবং শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলো খেয়াল রাখা। শিক্ষক প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সময় সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, ছেলে-মেয়েদের নামের ব্যবহারে ক্ষেত্রে সমতা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনার ক্ষেত্রে ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাইকে সমান গুরুত্ব দিবেন।
- **পরীক্ষা গ্রহণ:** একজন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের সময় সব ধরনের শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করবেন। বিশেষ করে শ্রেণিকক্ষে যেসব বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী রয়েছে তাদের কথা তিনি বিবেচনায় নিবেন।

- সাধারণত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের যে কোন প্রশ্নপত্রের বিপরীতে উত্তর দিতে একজন সাধারণ শিক্ষার্থীর তুলনায় একটু বেশি সময় প্রয়োজন। শিক্ষক নিয়মানুযায়ী তাদের অতিরিক্ত সময়ের ব্যবস্থা করবেন।
- যেসব শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষা বুঝতে পারেনা সম্ভব হলে তাদেরকে তাদের নিজ নিজ ভাষায় প্রশ্ন বুঝিয়ে দেয়া। আদিবাসী শিশুদের ক্ষেত্রে বিষয়টি অনেক বেশি প্রযোজ্য।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর শ্রুতি লেখকের জন্য পরীক্ষার হলে বসার ব্যবস্থা করা। এছাড়াও কোন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর কোন বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে তার ব্যবস্থা করা।

- **উত্তর পত্র মূল্যায়ন:** একজন শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের উত্তর পত্র মূল্যায়নের সময়ও কিছু বিষয়ের ওপর নজর রাখতে হবে। বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশুদের উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় তার অবস্থাটি বিবেচনায় নেয়া।
  - উদাহরণস্বরূপ- কোন প্রশ্নের উত্তরে যদি চিত্র দেয়া বাধ্যতামূলক হয় তা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিথিল করা কিংবা শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য মৌখিক পরীক্ষার পরিবর্তে কোন কিছু লিখতে দেয়ার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা ইত্যাদি।
  - আবার যেসব শিশুর ডিজলেকশিয়া রয়েছে তারা 'ন', 'হ্ন'ও 'ঢ়' ইত্যাদি বর্ণ তারা উলটা করে লেখে। তাদের উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া। কেননা একটা নির্দিষ্ট সময় পর তাদের এই সমস্যা দূর হয়ে যায়। তাই শিক্ষকের একটু সহানুভূতি তাদেরকে শিক্ষা জীবনে অনেক দূর এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

## মূল্যায়নের জন্য শিখন তথ্য সংগ্রহ

যে কোন ধরনের পরিকল্পনার জন্য ওই বিষয়সংশ্লিষ্ট তথ্যের প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের কার্যকর শিখনে সহায়তা করার জন্য শ্রেণি শিক্ষককে শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায়ের তথ্য জানতে হয়। এ তথ্যের ওপর নির্ভর করে শিক্ষক তার শিক্ষণ পদ্ধতি সংশোধন বা পরিবর্তন করতে পারেন। যাতে তিনি শিক্ষার্থীর উন্নততর শিখনে সহায়তা করতে পারেন। আমরা নানা ধরনের পরীক্ষা ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য পেতে পারি। যেমন মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত তথ্য শিখন মান উন্নয়নে, এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে এবং পরবর্তী পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। তথ্য গুণগত (qualitative) বা সাংখ্যিক (quantitative) বা উভয় ধরনের হতে পারে। পরীক্ষা বা কুইজ থেকে সাংখ্যিক তথ্য পাওয়া যাবে। আর শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষ পারদর্শিতা থেকে গুণগত বা বর্ণনামূলক তথ্য পাওয়া যাবে।

**পরীক্ষা**

যে কোন বিষয়ে একজন শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, নৈপূণ্য, অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা অথবা সাফল্য যাচাইয়ের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি বা উপায় হচ্ছে পরীক্ষা (মালেক ও অন্যান্য, ২০০৯)। মূলত শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের কার্যকারিতা, সফলতা কিংবা ব্যর্থতা যাচাইয়ের একটি বহুল প্রচলিত উপায় হচ্ছে পরীক্ষা। এ পরীক্ষা দুইভাবে গ্রহণ করা যায়: অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষা। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ বিদ্যালয়ের পরিচালনায় এবং তত্ত্বধায়নে দিয়ে থাকে যেমন বিদ্যালয়ের শ্রেণি, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক এবং বার্ষিক পরীক্ষা। আবার বহিঃপরীক্ষা হচ্ছে যে পরীক্ষা বিদ্যালয়ের বাইরের কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা বোর্ডের

মাধ্যমে পরিচালিত হয় যেমন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (নেপ কর্তৃক পরিচালিত), এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষা (বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত)।

**ধারাবাহিক মূল্যায়ন**

সাধারণভাবে কোন পাঠ চলাকালীন শিক্ষার্থীরা ওই পাঠ সঠিকভাবে বুঝতে পারছে কিনা কিংবা ওই পাঠের শিখনফল পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য শিক্ষক যে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ব্যবহার করেন তাই ধারাবাহিক মূল্যায়ন। অন্যভাবে বললে, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত সকল শিশু আবশ্যকীয় শিখনক্রম অনুসরণ করে কী পরিমাণ বিষয় ও শ্রেণিভিত্তিক জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন করেছে, তার প্রতি সচেতন দৃষ্টি রেখে পাঠ চলাকলীন অথবা পাঠ শেষে শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই করাকে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বলা হয় (আলম ও অন্যন্য, ২০০৩)।

মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য যথাযথ এবং নির্ভরযোগ্য (valid and reliable) হওয়া প্রয়োজন। কারণ কেবল ভালো তথ্য ব্যবহার করেই পাঠদান পদ্ধতির মান উন্নয়ন করা সম্ভব। যথাযথ তথ্য তখনই পাওয়া যাবে যদি মূল্যায়ন কৌশল যথাযথ হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কে যে তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে যদি মূল্যায়নের মাধ্যমে সে তথ্যই পাওয়া যায়, তাহলে মূল্যায়ন ও তথ্য যথাযথ হয়েছে বলে বিবেচনা করা যায়। আর তথ্য নির্ভরযোগ্য হবে যদি একই মূল্যায়ন কৌশল একাধিকবার প্রয়োগ করার পর একই বা অনুরূপ উত্তর পাওয়া যায়।

মূল্যায়ন থেকে ভালো তথ্য পেতে হলে শিক্ষককে প্রত্যেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত মূল্যায়ন কৌশল শনাক্ত করতে হবে এবং মূল্যায়ন কৌশল যতটা সম্ভব কার্যকর করতে হবে। ত্রুটিপূর্ণ মূল্যায়ন কৌশল থেকে শিক্ষার্থীদের শিখন সম্পর্কে কাজের উপযোগী তথ্য লাভ করা সম্ভব নয়। বরং তা শিক্ষককে ভুল সিদ্ধান্ত নেয়ার দিকে ধাবিত করবে। কেবল ভালো এবং উপযুক্ত মূল্যায়ন কৌশল থেকে শিক্ষক তার শিক্ষার্থীরা কী শিখেছে সে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। একইভাবে মূল্যায়ন কৌশল বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হতে হবে এবং কয়েকটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

## প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য যেহেতু শিশুদের সার্বিক বিকাশে সহায়তা করা সেহেতু মূল্যায়ন শুধু পড়ালেখা সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং শিক্ষার্থীর শারীরিক বৃদ্ধি, মানসিক ও আবেগের বিকাশ, সামাজিকতা ও অন্যান্যদের সাথে মিলেমিশে কাজ করা, সৃজনশীলতা এসব প্রতিটি ক্ষেত্রকেই গুরুত্ব দিতে হবে। তাই প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক সহায়িকায় শিক্ষার্থীদের ৮টি শিখনক্ষেত্র মূল্যায়নের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

- শারীরিক ও চলনক্ষমতা
- সামাজিক ও আবেগিক বিকাশ
- যোগাযোগ ও ভাষার বিকাশ
- প্রারম্ভিক গণিত
- সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার বিকাশ
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
- স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং পরিবেশ

প্রাক প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করবেন। তবে তা হবে অনানুষ্ঠানিক এবং ধারাবাহিক। শিক্ষক গাঠনিক মূল্যায়নের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিকভাবে পাঠ চলাকালীন বা পাঠ শেষে শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করে যথাযথ ফলাবর্তন প্রদানের মাধ্যমে শিশুদের শিখন নিশ্চিত করবেন। শিক্ষক প্রাক-প্রাথমিকে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য যেসব মূল্যায়ন কৌশল অবলম্বন করতে পারেন সেগুলো নিচে তুলে ধরা হল-

- আটটি শিখনক্ষেত্রের জন্য মোট ১৫টি নির্দিষ্ট মূল্যায়নসূচক নিয়ে একটি মূল্যায়ন ছক তৈরি করা হয়েছে। এগুলো ধারাবাহিকভাবে সারা বছর ধরে মূল্যায়ন করে হাজিরা বইয়ে দেয়া ছকে প্রতি মাসে রেকর্ড করে রাখতে হবে।
- কিছু সূচক আছে যেগুলো প্রতিমাসে মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে না। যেমন- পড়া, লেখা, গাণিতিক দক্ষতা ইত্যাদি। এই ধরনের সূচকগুলো ক্লাসে অনুশীলন হলে তবেই মূল্যায়ন করতে হবে।
- প্রতিটি মূল্যায়ন সূচকের বিপরীতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে ৩টি স্কেলে।
    ক) ভালো
    খ) মোটামুটি
    গ) উন্নতি প্রয়োজন
- শিক্ষার্থীর প্রতিদিনের কাজের নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে মাসিক একটি স্কেল দিতে হবে।
- প্রতি চারমাস পরপর অর্থাৎ বছরে তিনবার (এপ্রিল মাসে প্রথমবার, আগস্ট মাসে দ্বিতীয়বার এবং ডিসেম্বর মাসে শেষবার) রেকর্ডকৃত মাসিক স্কেল বিশ্লেষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কে একটি সার্বিক এবং সংক্ষিপ্ত মন্তব্য মূল্যায়ন ছকের নির্দিষ্ট স্থানে টিক চিহ্ন দিবেন।
- বছর শেষে শিক্ষার্থীর সারা বছরের কাজ এবং রেকর্ডকৃত মন্তব্যের আলোকে 'প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তি প্রত্যয়নপত্রে' শিশুর উল্লেখযোগ্য একটি সবল ও একটি উন্নয়নযোগ্য দিক (যদি থাকে) তুলে ধরবেন। এই গুণগত মন্তব্য শিশুর বিকাশগত অবস্থান সম্পর্কে পিতামাতা ও পরবর্তী শ্রেণির শিক্ষককে বুঝতে ও সে অনুযায়ী সহায়তা দিতে সাহায্য করবেন।

প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক প্রতিটি শিশুর অগ্রগতি নিয়ে মাসিক অভিভাবক সভায় আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে খুব বিস্তারিত বর্ণনায় না গিয়ে শুধু মূল তথ্যগুলো পিতামাতাকে অবহিত করবেন। বিশেষ করে কোন শিশু কোন কাজে পারদর্শী হলে তার প্রশংসা করুন এবং অভিভাবককেও উৎসাহ দিন। আবার কারো যদি কোন আচরণিক সমস্যা থাকে তবে তা পিতামাতাকে অবহিত করে করণীয় কী হতে পারে তা আলোচনা করুন। এছাড়া কোন শিশুর সমস্যা সকলের সামনে আলোচনা না করে নির্দিষ্ট শিশুর পিতামাতাকে আলাদা করে জানাবেন এবং যতটা সম্ভব ইতিবাচকভাবে সমস্যাটি তাদের সামনে তুলে ধরুন। সার্বিকভাবে এর মাধ্যমে শিশুর ধারাবাহিক অগ্রগতি সম্পর্কে পিতামাতা সচেতন থাকবেন এবং শিক্ষক নিজেও শিশুর বিকাশ নিশ্চিতকরণে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন।

## প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী মূল্যায়ন

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 'প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়ন নির্দেশনা-২০১৬' নামে একটি মূল্যায়ন নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে। যার আলোকে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করার জন্য শিক্ষকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য দুই ধরনের মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। একটি হলো ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং অপরটি সামষ্টিক মূল্যায়ন। এই

মূল্যায়নের জন্য সারা অ্যাকাডেমিক বছরকে তিনটি প্রান্তিক বা সাময়িকে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রান্তিকের মেয়াদ মোটামুটি ৩-৪ মাস। প্রত্যেক প্রান্তিকে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে। শিক্ষার্থীদের কোন কোন দক্ষতার মূল্যায়ন করা হবে তাও এই নির্দেশিকায় ঠিক করে দেয়া হয়েছে। যেমন:বাংলা ও ইংরেজির ক্ষেত্রে  শোনা, বলা, পড়া ও লেখা ইত্যাদি মূল্যায়ন করতে হবে। আবার গণিতের ক্ষেত্রে গাণিতিক ধারণা, প্রক্রিয়াগত ধারণা ও সমস্যা সমাধান ইত্যাদি মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, প্রয়োগ সক্ষমতা কিংবা বিশ্লেষণ দক্ষতা যাচাই করতে হবে। একই ভাবে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় এবং প্রাথমিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বিষয় জ্ঞান, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা এবং সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন করতে হবে। আর নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয়জ্ঞান, ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা এবং নৈতিক গুণাবলি চর্চা ইত্যাদি উল্লিখিত মূল্যায়ন পদ্ধতির আলোকে মূল্যায়ন করতে হবে।

**যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন**

বাংলাদেশে ১৯৮৮ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম চালু করা হয় এবং ১৯৯১ সাল হতে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন শুরু হয়। ১৯৯২ সালের পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক স্তরের জন্য ৫০টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয় (ইসলাম, ২০১২)। সর্বশেষ পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য হলো শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক ও আবেগিক বিকাশ সাধন এবং তাদের দেশাত্মবোধে, বিজ্ঞানমনস্কতায়, সৃজনশীলতায় ও উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা। এখানে প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছে ২৯টি (শিক্ষাক্রম, ২০১২)। পরবর্তী সময়েপিইডিপি-৩-এর আওতায় পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে এবং এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় হতে পরিপত্র জারি করা হয়েছে। পরিপত্র অনুযায়ী জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) প্রতিবছর যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন, পাইলটিং, নম্বর প্রদান ও বিশ্লেষণপূর্বক আইটেম ব্যাংক তৈরি করছে এবং উক্ত আইটেম ব্যাংক হতে নির্ধারিত পরিমাণ/সংখ্যক যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ সংযোজন করছে। উল্লেখ্য, ২০১২ সালে প্রতি বিষয়ে ১০ নম্বরের অভীক্ষাপদ ছিল যোগ্যতাভিত্তিক। ২০১৩ সালে ২৫ নম্বর, ২০১৪ সালে ৫০ নম্বর, ২০১৫ সালে ৭৫ নম্বর এবং ২০১৭ সালে শতভাগ অভীক্ষাপদ তৈরি করা হচ্ছে যোগ্যতাভিত্তিক।

## অভীক্ষা ওএর ধরন এবং বৈশিষ্ট্য

**অভীক্ষা কী?**

সাধারণভাবে একগুচ্ছ প্রশ্নকে (ধ ংবঃ ড়ভ য়ঁবংঃরড়হ) অভীক্ষা বলা যায়। একটি অভীক্ষার মধ্যে সাধারণত অনেকগুলো অভিক্ষা পদ বা প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকে। অভীক্ষা হলো শিক্ষার্থীর এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের জন্য একগুচ্ছ প্রশ্ন বা সমস্যার সেট। যে অভিক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে তাদের পঠিতব্য বিষয়ের ওপর কতটা পারদর্শিতা বা কৃতিত্ব অর্জন করতে পেরেছে তা পরিমাপ করা হয় তাকে পারদর্শিতা বা কৃতিত্ব অভীক্ষা বলে। কৃতিত্বের অভীক্ষাকে শিক্ষামূলক অভীক্ষাও বলা হয়।

**অভীক্ষার ধরন**

বাংলাদেশে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী কৃতিত্ব পরিমাপের অভীক্ষাগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় (মালেক ও অন্যান্য, ২০০৯)। এগুলো হচ্ছে লিখিত অভীক্ষা, মৌখিত অভীক্ষা ও ব্যবহারিক অভীক্ষা। নিচে একটি চার্টের মাধ্যমে অভীক্ষার ধরনসমূহ দেখানো হলো –

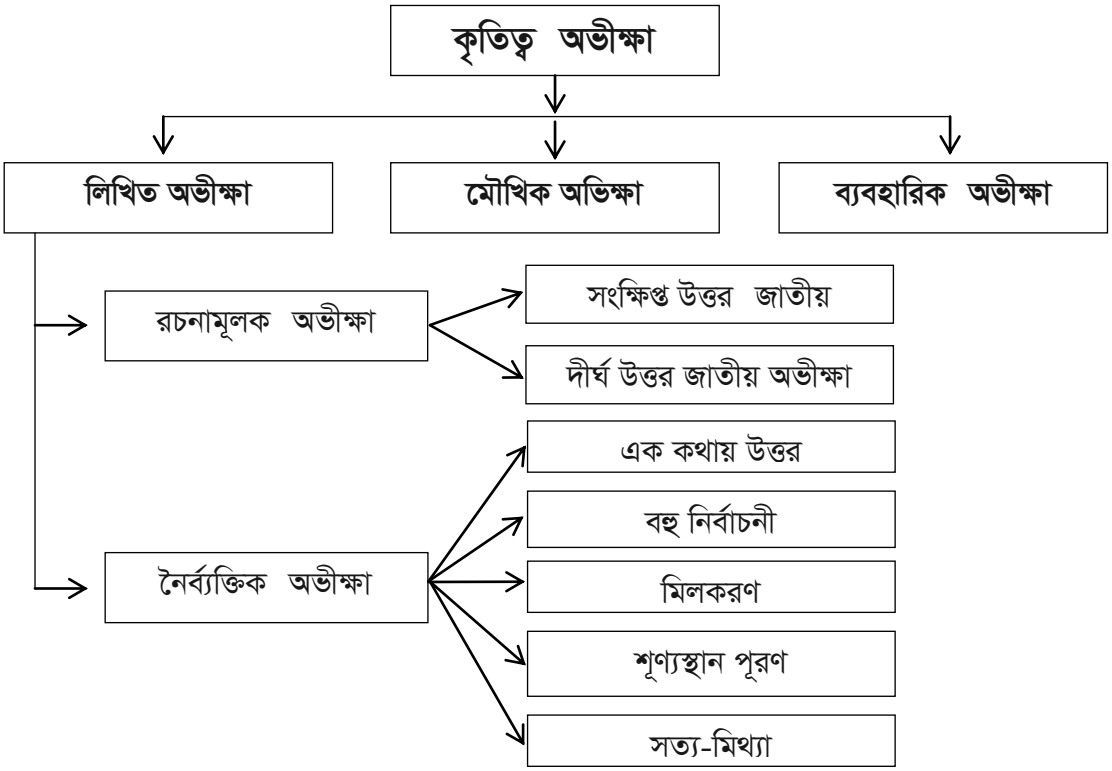


চিত্র ৩.৩: অভীক্ষার ধরন

**উত্তম অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য**

যে কোনো উত্তম অভীক্ষার কতকগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। এগুলোর যদি অভাব থাকে তবে অভীক্ষাটিকে পরিমাপের উপকরণ হিসেবে নিখুঁত বা নির্ভরযোগ্য বলা যায় না। অভীক্ষার এই উপাদান বা শর্তগুলোকে বলা হয় সু-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য। উত্তম অভিক্ষার যেসব বৈশিষ্ট থাকা একান্ত প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে-

- **অভীক্ষার যথার্থতা** (Validity of test)**:** অভীক্ষার যথার্থতা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের যেসব গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য অভিক্ষাটি তৈরি করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা পরিমাপ করতে পারছে কিনা, করলেও কতটুকু বা কী মাত্রায় করছে তা যাচাই করা।বিজ্ঞানের একটি অভীক্ষা যদি শিক্ষার্থীর হাতের লেখা বা ভাষাজ্ঞান পরিমাপ না করে শুধু বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দক্ষতা পরিমাপ করে, তবে অভীক্ষাটির যথার্থতা রয়েছে বলা যাবে। তবে সুন্দর হাতের লেখার জন্য যদি নম্বর কাটা হয় তবে অভীক্ষার যথার্থতা নষ্ট হবে।

- **অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা** (Reliability of test)**:** অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বলতে বোঝায় একটি অভিক্ষা কতটা নির্ভুল ও সংগতিপূর্ণ ফলাফল প্রদান করতে পারে। যদি একটি অভীক্ষা একদল শিক্ষার্থীর ওপর কিছুদিনের ব্যবধানে পর পর দুবার প্রয়োগ করা হয় এবং যদি দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীদের দু'বারের ফলাফলের মধ্যে মিল আছে, তাহলে বলা যাবে অভীক্ষাটির নির্ভরযোগ্যতা রয়েছে। অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়।

- **অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা** (Objectivity of test)ঃ যে অভীক্ষার গঠন, প্রয়োগ, ফল নির্ণয়, নম্বর প্রদান বা ফলাফল ব্যাখ্যায় পরীক্ষকের কোনরূপ নিজস্ব প্রভাব থাকেনা অর্থাৎ ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অভিমত কিংবা পছন্দমুক্ত থাকে তাই অভীক্ষার নৈর্ব্যক্তিকতা। মূলকথা হচ্ছে- নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রশ্নপত্রের উত্তর ও নম্বর একই হবে। এখানে পরীক্ষকের ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা খেয়াল-খুশির কোন প্রভাব থাকবেনা।

- **অভীক্ষার আদর্শায়ন** (Standardization of test)ঃকোন অভীক্ষার গঠন, প্রয়োগ ও স্কোরিং পদ্ধতির মধ্যে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য ঠিক রাখার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হয় তাই অভীক্ষার আদর্শায়ন। আদর্শায়িত অভীক্ষার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর একটি আদর্শমান নির্ণয় করা হয় এবং এ মানের নিরিখে ফলাফল ব্যাখ্যা করা হয়। তবে সে ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, যে পরিস্থিতিতে অভীক্ষাটি প্রয়োগ করা হচ্ছে তার বিভিন্ন দিক যেন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অপরিবর্তিত থাকে।

- **অভীক্ষার প্রয়োগশীলতা** (Administrability of test)ঃ অভীক্ষার প্রয়োগশীলতা হচ্ছে অভীক্ষাটি পরীক্ষার্থীদের উপর সহজে, সাবলীলভাবে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা। পরীক্ষক কী মূল্যায়ন করতে চান পরীক্ষার্থীরা যেন তা সহজে বুঝতে পারে। অভীক্ষাটি কিভাবে প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে তার সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা দেয়া।

- **অভীক্ষার পরিমিততা** (Economy of test)ঃ অভীক্ষার পরিমিততা হচ্ছে যে অভীক্ষা তৈরি, প্রয়োগ ও মূল্যায়নে যতটা সম্ভব কম সময়, অর্থ ও পরিশ্রম লাগবে। অর্থাৎ সময়, শ্রম ও অর্থের মিতব্যয়িতাই হলো পরিমিততা।

- **অভীক্ষার সম্পূর্ণতা** (Adequacy of test)ঃ অভীক্ষার সম্পূর্ণতা হচ্ছে অভীক্ষার প্রয়োগ থেকে প্রাপ্ত নম্বরগুলোর যথাযথ ব্যাখ্যা এবং সেগুলো পরস্পরের মধ্যে নির্ভরযোগ্যভাবে তুলনা করার প্রক্রিয়া। যার মাধ্যমে অভীক্ষাটি কতটা সঠিকভাবে শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য বা মানসিক গুণাবলি পরিমাপ করতে পেরেছে তা যাচাই করা যায়।

- **অভীক্ষার মান নির্ণয়ের সরলতা** (Easy of scoring of test)ঃ অনেক সময় শিক্ষকগণ সময়, ব্যস্ততা ও কাজের চাপের কারণে পরীক্ষার উত্তরপত্র ভালোভাবে না পড়েই নম্বর প্রদান করে থাকেন। ফলে শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে মূল্যায়িত হয় না। তাই অভীক্ষার মান নির্ণয়ের পদ্ধতি যত সহজ ও সরল হবে শিক্ষকরা সে অভীক্ষাকে ততবেশি পছন্দ করবেন। মান নির্ণয়ের সরলতার জন্যই মূল্যায়ন স্কিম তৈরি করা হয়।

## অভীক্ষাপদ তৈরিতে শিখনের ক্ষেত্র বিবেচনা

অভীক্ষাপদ তৈরির সময় অবশ্যই শিখনের ক্ষেত্রসমূহকে বিবেচনায় আনতে হবে। প্রতিটি স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য ঐস্তরে শিক্ষার্থীরা যেসব যোগ্যতা অর্জন করবে তা পূর্ব নির্ধারিত থাকে এবং শিক্ষার্থীরা যেন সেসব যোগ্যতা অর্জন করে তার জন্য যথাযথ শিখন সুযোগ নিশ্চিত করা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য শিখনযোগ্যতা হিসেবে ২৯ টি প্রান্তিক যোগ্যতাকে নির্ধারণ করা হয়েছে যা শিক্ষার্থীরা পঞ্চম শ্রেণি শেষে অর্জন করবে বলে ধরে নেওয়া হয়। প্রতিটি প্রান্তিক যোগ্যতার ভিত্তিতে কিছু অর্জন উপযোগী শিখন যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর এসব যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নির্ধারিত।

শিক্ষার্থীর যোগ্যতাসমূহকে মূল্যায়নের জন্য অভীক্ষাপদ তৈরিতে শিখনের ক্ষেত্রসমূহকে গুরুত্ব দেয়া দরকার। এক্ষেত্রে বেঞ্জামিন ব্লুমের Concept of Learning Domainwelয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়াকে মুখস্থনির্ভর থেকে চিন্তননির্ভর প্রক্রিয়ায় রূপান্তরের জন্য বেঞ্জামিন ব্লুম-এর Concept of Learning Domain অবলম্বনে অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পুরোপুরি শিখন

(Mastery Learning) সংগঠিত হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য শিখনের তিনটি ক্ষেত্রের সমন্বয়ে অভীক্ষাপদ তৈরি করতে হবে।

### বুদ্ধিবৃত্তিক বা জ্ঞানীয় ক্ষেত্রে শিখন মূল্যায়ন

মানুষের আচরণের পরিবর্তনই হচ্ছে শিখন। আর এই শিখন যখন কাঙ্ক্ষিত হয় তখনই তা শিক্ষা হিসেবে বিবেচিত হয়। মানুষের এই আচণের পরিবর্তনকে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীরা তিন ভাগে ভাগ করেছেন এগুলো হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক বা জ্ঞানমূলক পরিবর্তন, দক্ষতা বিষয় পরিবর্তন এবং আবেগিক বা অনুভবের পরিবর্তন (তপন ও রশিদ, ২০০৫)। এই পরিবর্তনগুলোকে মূল্যায়নের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কৌশল বা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন বুদ্ধিবৃত্তিক শিখন মূল্যায়ন করা হয় ৬টি উপক্ষেত্র মূল্যায়নের মাধ্যমে। এগুলো হচ্ছে- জ্ঞান, উপলব্ধি, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন। তবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক শিখন মূল্যায়নের জন্য জ্ঞান, উপলব্ধি ও প্রয়োগ এই তিনটি উপক্ষেত্র মূল্যায়ন করা হয়। মূলত আমরা কৃতিত্ব অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, উপলব্ধি ও প্রয়োগ দক্ষতার মূল্যায়ন করে থাকি।

### জ্ঞানীয় ক্ষেত্রে স্তরভিত্তিক যোগ্যতা যাচাই

ব্লুমের জ্ঞানীয় ক্ষেত্রের প্রশ্নের ধরনস্তরঅনুযায়ী ভিন্ন হয়ে থাকে। ব্লুম ট্যাক্সোনোমি (Bloom Taxonomy) অনুসারে জ্ঞান, অনুধাবন এবং প্রয়োগ স্তরের প্রশ্নগুলো হলো বিকাশের নিম্ন পর্যায়ের শিখনকে নির্দেশ করে। আর বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সৃজনসংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলো বিকাশের উঁচু পর্যায়ের শিখনকে নির্দেশ করে থাকে। নিম্ন স্তরের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে সাধারণত কোনো শেখা বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের গভীরতা ও দুর্বলতার মাত্রা, এবং বোধগম্যতার মাত্রা পরিমাপ করা হয়। অন্যদিকে উচ্চ স্তরের প্রশ্নের মাধ্যমে কোনোবিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের গভীর ও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করার দক্ষতা, সমস্যার সমাধানের ক্ষমতা, বিষয়বস্তু সম্পর্কে অলোচনা করার যোগ্যতা পরিমাপ করা হয়।নিচে সারণিতেজ্ঞানীয় ক্ষেত্রের উপ-ক্ষেত্রগুলোর উদাহরণ ও মূলশব্দ করাহলো।

সারণি ৩.২: জ্ঞানীয় ক্ষেত্রের উপ-ক্ষেত্রগুলোর উদাহরণ ও মূলশব্দ

| জ্ঞানের স্তর | উদাহরণ ও মূলশব্দ |
|---|---|
| **স্মরণ করা:**স্মৃতি থেকে কোনো সংজ্ঞা, তথ্য, উপাদান মনে করা বা চিনতে পারা বা স্মরণ করা। | **উদাহরণ:**<br>– কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'ভোর হলো' কবিতার প্রথম চার লাইন লিখ।<br>– দুইটি প্রাচীন নিদর্শনের নাম লিখ।<br>– মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় উপাধিগুলো কী?<br>**সম্ভাব্য ব্যবহারযোগ্য শব্দ:** বিন্যস্ত করা, বর্ণনা করা, সংজ্ঞায়িত করা,চিহ্নিতকরণ, তালিকাকরণ, মিল করা, নামকরণ বা নীতিমালা, পুনরুৎপাদন করা, পুনঃউপস্থাপন করা,নির্বাচন বা বিবৃত করা, সাজানো ইত্যাদি। |
| **বুঝতে পারা:**ব্যাখ্যা, উদাহরণ, শ্রেণিকরণ, সারসংক্ষেপকরণ, অনুমান বা | **উদাহরণ:**<br>– পরিবারের ধারণা নিজের ভাষায় ব্যক্ত করা। |

| | |
|---|---|
| তুলনার মাধ্যমে মৌখিক বা লিখিতভাবে কোনো বিষয়ের অর্থ গঠন করা। | – ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো আমাদের সংরক্ষণ করা উচিত কেন?<br>– গ্রিন হাউজের ভিতরের পরিবেশ গরম থাকে কেন? ব্যাখ্যা কর।<br>**সম্ভাব্য ব্যবহারযোগ্য শব্দঃ** বুঝা, রূপন্তর করা, অনুবাদ করা, অনুমান করা, ব্যাখ্যা করা, বিস্তৃতকরণ, সাধারণীকরণ, উদাহরণ প্রদান, পূর্বোক্তি করা, পুনর্লিখন, সারসংক্ষেপ, পার্থক্য নির্ণয় করা, শনাক্ত করা, সংক্ষেপ করা, উপযুক্তটি বেছে নেয়াইত্যাদি। |
| **প্রয়োগ করা:**প্রাপ্ত তথ্য বা অর্জিত জ্ঞানকে কোনো নতুন পন্থায় বা নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা বা সাদৃশ্যপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। | **উদাহরণঃ**<br>– বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য তুমি কী করবে?<br>– শিশু অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে তুমি কী পদক্ষেপ নিবে?<br>– রাস্তায় কীভাবে নিরাপদ থাকা যায় সেসম্পর্কে তুমি তোমার বন্ধুকে কী বলবে?<br>**সম্ভাব্য ব্যবহারযোগ্য শব্দঃ** প্রয়োগ করা, পরিবর্তন করা, নির্ণয় করা, গঠন করা, গণনা করা, প্রদর্শন করা, পূর্বসংকেত/ভবিষ্যৎ বলা, প্রস্তুত করা, উপস্থাপন/উৎপাদন করা, সম্পর্ক দেখানো, আবিষ্কার করা, পরিচালনা করা, সমস্যা সমাধান করা ইত্যাদি। |
| **বিশ্লেষণ করা:**কোনো বিষয়কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে অর্থপূর্ণভাবে বিভক্ত করা এবং অংশগুলো কীভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তা পার্থক্যকরণ বা সংগঠনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা। | **উদাহরণঃ**<br>– বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের মানবসৃষ্ট কারণসমূহ বর্ণনা কর।<br>– মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গণতন্ত্রের বিজয় কীভাবে অর্জিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর।<br>– সুষম খাদ্যের উদাহরণ প্রদান পূর্বক সুস্বাস্থ্যের জন্য এর উপকারিতা বর্ণনা কর।<br>**সম্ভাব্য ব্যবহারযোগ্য শব্দ:**বিশ্লেষণ করা, তুলনা করা, ব্যাখ্যা করা, চিত্র, পার্থক্যকরণ, চিহ্নিতকরণ, শনাক্তকরণ, সম্পর্ক নির্ণয় করা, নির্বাচন করা, পৃথকীকরণ ইত্যাদি। |
| **মূল্যায়ন করা:**নির্দিষ্ট মানদণ্ড বা আদর্শের ভিত্তিতে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ এবং সমালোচনার মাধ্যমে কোনো বিষয়ের মূল্য যাচাই করা। | **উদাহরণঃ**<br>– বাংলাদেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কার ভূমিকা অধিক গুরুত্ব বহন করে? যুক্তি দাও।<br>– বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের অবদান বিচার কর।<br>– নারী শিক্ষার বিস্তারে বেগম রোকেয়ার ভূমিকা যাচাই কর।<br>**সম্ভাব্য ব্যবহারযোগ্য শব্দঃ** তুলনা করা, সারাংশ, বৈসাদৃশ্য, বর্ণনা করা, সমালোচনা বা মূল্যায়ন করা, ব্যাখ্যা করা, যুক্তিপ্রদান, সম্পর্ক নিরূপণ, সারসংক্ষেপ, সমর্থনকরা ইত্যাদি। |
| **সৃজন:**পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন উপাদান | **উদাহরণঃ** |

| | |
|---|---|
| একত্রিত করার মাধ্যমে কোনো ধারণার সামগ্রিক রূপ দেওয়া, অর্জিত জ্ঞানের সমন্বয়ে নতুন জ্ঞান বা ধারণার সৃষ্টি, কোনো নতুন উপাদান বা সামগ্রীর ডিজাইন করা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন প্রস্তাব। | – আন্তর্জাতিক নারী দিবসের তাৎপর্য কী?<br>– 'মহাস্থানগড়' সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখ।<br>– বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধন, প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর।<br>**সম্ভাব্য ব্যবহারযোগ্য শব্দ:** শ্রেণিকরণ করা, সমন্বয় করা, ব্যাখ্যা করা, তৈরি করা, পরিবর্ধন করা, সংগঠন, পরিকল্পনা করা, পুনরালোচনা, বলা, লেখা ইত্যাদি। |

**আবেগীয় ক্ষেত্রে শিখন মূল্যায়ন**

আবেগিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং যথাযথ গুণ বিচার ও খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা বিকশিত হয়। এটি শিক্ষার্থীর আবেগ অনুভূতির সাথে সম্পর্কিত। মূলত শিখনের সাথে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব, আবেগ, অনুভূতি, প্রশংসা করার ক্ষমতা এবং যথাযথ গুণ বিচারকরণ ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শিক্ষার্থীরা গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধা করবে এবং বাড়ি ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি চর্চা করবে। বিশেষ করে তাদের নেতা নির্বাচনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে। এই ক্ষেত্রের শিখন যাচাই করার জন্য যেসব শব্দ আচরণ নির্দেশ করা জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে তা হলো- সম্পন্ন করা, প্রদর্শন করা, পার্থক্যকরণ, ব্যাখ্যা করা, অনুসরণ করা, গঠন করা, প্রবর্তন করা, বিচারকরণ, প্রস্তাবদান, পড়া, প্রতিবেদন তৈরি করা, নির্বাচন, সংস্কার করা, কাজ করা ইত্যাদি। তবে এক্ষেত্রে সরাসরি প্রশ্ন না করে প্রজেক্ট, ডায়েরি লিখন, শিক্ষার্থীর বিভিন্ন কার্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি যাচাই করা অধিক উত্তম। আবেগীয় ক্ষেত্রের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য শিক্ষক একটি পর্যবেক্ষন চেকলিস্ট তৈরি করে তা অনুসারে শিক্ষার্থীর দ্বারা সম্পন্নকৃত প্রজেক্ট, লিখিত ডায়েরি, বিভিন্ন কাজে তার অংশগ্রহণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

**মনোপেশীজ ক্ষেত্রে শিখন মূল্যায়ন**

মনোপেশীজ ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য মন ও পেশী একসাথে কাজ করে। এটি অনেকটা হাতে কলমে কাজ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত। একে সাধারণভাবে বলা হয় দক্ষতা। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের যেসব আচরণ পেশীজ ক্রিয়া বা কর্মের অন্তর্ভুক্ত এবং যার জন্য স্নায়ুপেশীজ সমন্বয় প্রয়োজন তাদেরকে মনোপেশীজ ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে নিজ এলাকায় সংঘটিত যে কোন একটি দুর্যোগের ওপর সংক্ষিপ্ত (সর্বোচ্চ এক পাতা) প্রতিবেদন তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। এই ক্ষেত্রের শিখন যাচাই করার জন্য যেসব শব্দ আচরণ নির্দেশ করা জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে তা হলো- বিন্যাসকরণ, সমন্বয় করা, রচনা করা, গঠন করা, সৃষ্টি করা, নক্শা করা, পরিকল্পনা করা, বিশুদ্ধকরণ, উৎপন্ন করা, অতিক্রম করা ইত্যাদি।এক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর দক্ষতা যাচাইয়ে পর্যবেক্ষণ একটি আবশ্যিক প্রক্রিয়া হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে নিম্নের প্রশ্নগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে

- খেজুর পাতা দিয়ে একটি চরকা তৈরি কর।
- পাট দিয়ে একটি খেলনা পুতুল তৈরি কর।
- মাটি দিয়ে একটি আম বানাও এবং তাতে রঙ কর।

## যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন প্রণয়ন

এবার আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র কীভাবে তৈরি করতে হবে তা একনজরে দেখে নেব। তবে মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র জ্ঞানমূলক প্রশ্নই শিক্ষার্থীরা তাদের মুখস্থ নির্ভর জ্ঞান থেকে বা সরাসরি বই থেকে উত্তর দিতে পারবে। অন্য প্রশ্নগুলো তারা সরাসরি বই বা গাইড বই থেকে উত্তর দিতে পারবেনা। তাদের নিজেদের উপলব্ধি ও প্রয়োগ ক্ষমতা ব্যবহার করেই তারা অন্য প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবে। দেশের বিভিন্ন জাতীয় পরীক্ষার (পিইসি, জেএসসি ও এসএসসি) প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, উপলব্ধি ও প্রয়োগের প্রশ্নও সরাসরি বই থেকে বা শিক্ষার্থীরা মুখস্থ নির্ভর জ্ঞান থেকে উত্তর দিতে সক্ষম হয়। তাই যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন তৈরি করার সময় আমাদের খুবই সচেতনভাবে প্রশ্ন তৈরি করতে হবে। কেননা আপনার মূল্যায়ন প্রক্রিয়াই পারে শিক্ষার্থীদের শিখনকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে।

উদাহরণ-

পঞ্চম শ্রেণির একটি প্রান্তিক যোগ্যতা হচ্ছে- ১০. দুর্যোগ সম্পর্কে জানা এবং দুর্যোগ মোকাবেলার দক্ষতা অর্জন করা। এ প্রান্তিক যোগ্যতার আলোকে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে এভাবে-

১০.১ বাংলাদেশে আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন ও সামাজিক কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ সম্পর্কে জানবে এবং তা মোকাবেলার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবে।

১০.২ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এমন কর্মকান্ড করা থেকে বিরত থাকবে।

এর আলোকে কয়েকটি শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে যেমন-

১০.১.২ জলবায়ু কী বলতে পারবে।

১০.১.৫ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও পরিবেশের ওপর আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।

১০.২.১ প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয় এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকবে যেমন (গাছ কাটা, পাহাড় কাটা, পাখি শিকার, বন্য প্রাণী নিধন, জলাভূমি ভরাট ইত্যাদি)।

শিক্ষার্থীদের এসব শিখনফল অর্জনের জন্য পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্য বইয়ের 'জলবায়ু ও দুর্যোগ'অধ্যায়ে (পৃ. ৪৮-৫৫) যোগ করা হয়েছে। আমরা উল্লিখিত শিখনফলের আলোকে এই অধ্যায় থেকে যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন করতে চাই তা হলে আমরা এভাবে প্রশ্ন করতে পারি।

১. জলবায়ু কী? (জ্ঞান)
২. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কী কী প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়? বর্ণনা কর। (উপলব্ধি)
৩. প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় তোমার করণীয় কী কী? উদহরণসহ ব্যাখ্যা কর। (প্রয়োগ)

## অভীক্ষাপদ তৈরির কৌশল

সাধারণত লিখিত পরীক্ষার জন্য অভীক্ষাপদ তৈরি করতে হয়। ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, লিখিত অভীক্ষা দুই ধরণের হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে রচনামূলক অভীক্ষা আর অন্যটি নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা।

**রচনামূলক অভীক্ষাপদ তৈরির কৌশল**

রচনামূলক অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা না গেলেও এখনো এ ধরনের অভীক্ষা প্রাথমিক স্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে রচনামূলক অভীক্ষা তৈরির সময় কিছু কৌশল অবলম্বন করলে শিক্ষার্থীদের অনেকটা ভালোভাবে মূল্যায়ন করা যায়। রচনামূলক অভীক্ষা তৈরির সময় শিক্ষক যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে পারেন -

- প্রশ্ন তৈরির করার সময় কী পরিমাপ করতে চাওয়া হচ্ছে তা বিবেচনা করে প্রশ্ন তৈরি করা। অর্থাৎ শিখনফল বিবেচনায় নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করা।
- প্রশ্নের ভাষা সহজ ও সবালীল হওয়া যাতে পরীক্ষার্থীরা বুঝতে পারেন এর উত্তর কোথা থেকে শুরু এবং কোথায় শেষ হবে।
- প্রশ্নের নির্দেশনা স্পষ্ট ও যথাযথ হওয়া যাতে উত্তরে কী কী লিখতে হবে তা যেন পরীক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পারেন। এ লক্ষ্যে প্রশ্নের মধ্যে তালিকা প্রস্তুত কর, তুলনা করা, যুক্তি দাও ইত্যাদি ভাষা নির্দেশ হিসেবে ব্যবহার করা।
- প্রশ্নের মধ্যে নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর, তোমার মতে কি হওয়া উচিত, তুমি কি মনে কর কিংবা যাহা জান লিখ ইত্যাদি বাক্যাংশ ব্যবহার করা উচিত নয়।
- নির্ধারিত সময় ও মান বন্টণ উল্লেখ করা। প্রশ্নের কোন অংশের জন্য কত নম্বর প্রদান করা হবে তা উল্লেখ করা।
- প্রশ্ন এমনভাবে তৈরি করা যাতে যে বিষয়ের প্রশ্ন তার উত্তর থেকে ঠিক সে বিষয়ের জ্ঞান বা দক্ষতা পরিমাপ করা যায়।
- রচনাধর্মী প্রশ্নের সাথে অন্য জাতীয় প্রশ্ন থাকা উচিত নয়। এতে পরীক্ষার্থীর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- তাড়াতাড়ি করে প্রশ্ন তৈরি করা উচিত নয়। এছাড়াও উত্তরের জন্য যতটা সময়ের প্রয়োজন পরীক্ষার্থীকে ততটা সময় দেয়া। পরীক্ষার্থী যেন নির্দিষ্ট সময়ে সবকয়টির উত্তর দিতে পারেন।

**নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাপদ তৈরির কৌশল**

রচনামূলক অভীক্ষার দুর্বলতা থেকেই নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উৎপত্তি। রচনাধর্মী প্রশ্নপত্র এবং নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্রের মধ্যে উদ্দেশ্য বা প্রকৃতির দিক থেকে কোন পার্থক্য না থাকলেও পদ্ধতি ও সংগঠনের দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। মূলত যেসব অভীক্ষাপদ বা প্রশ্নে শিক্ষার্থী ও পরীক্ষক উভয়েরই ব্যক্তিগত প্রভাব পরার সম্ভাবনা থাকে না তাই নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে যার মধ্যে রয়েছে এক কথায় উত্তর, বহু নির্বাচনি প্রশ্ন, মিলকরণ, শূন্যস্থান পূরণ ও মিলকরণ ইত্যাদি।

**১. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন**

শিক্ষামূলক পরিমাপের ক্ষেত্রে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। এ জাতীয় প্রশ্নকে নির্ভরযোগ্য করে তুলতে হলে সঠিকভাবে প্রশ্ন রচনা করতে হবে। বহু নির্বাচনি প্রশ্নের প্রধানত দুটি অংশ থাকে। মূল অংশে (STEM) থাকে একটি প্রশ্ন বা সমস্যা এবং নিচে চার-পাঁচটি বিকল্প উত্তর (Alternatives or options) দেয়া থাকে। এই বিকল্প উত্তরগুলোর মধ্যে একটিমাত্র উত্তর সঠিক (কবু) এবং বাকিগুলো ভুল উত্তর বা বিচলক (Distracter)। বহু নির্বাচনিঅভীক্ষা তৈরির ক্ষেত্রে যেসব বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে-

- প্রশ্নের মূল অংশে একটি সরাসরি প্রশ্ন বা অসম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে প্রশ্নের মূল অংশ অর্থপূর্ণ হলে ভালো হয়।
- সমস্যাটিকে সুস্পষ্ট করার জন্য যতটুকু তথ্য দরকার ঠিক ততটুকুই প্রশ্নের মূল অংশে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ প্রশ্নের মূল অংশের ভাষা হবে সহজ, সংক্ষিপ্ত ও অতিরিক্ত জটিল শব্দের ব্যবহার থেকে মুক্ত।

- একান্ত প্রয়োজন না হলে প্রশ্নের মূল অংশে না-বোধক বাক্য ব্যবহার করা উচিত নয়। না-বোধক প্রশ্নের চেয়ে হ্যাঁ-বোধক প্রশ্ন দ্বারা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ শিখন উদ্দেশ্য পরিমাপ করা সম্ভব হয়।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ শিখনফল পরিমাপের জন্য না-বোধক শব্দ ব্যবহার করে প্রশ্ন করতে হয়। সে ক্ষেত্রে না-বোধক শব্দটিকে জোর দেয়ার জন্য তার নিচে দাগ টেনে দিতে হবে অথবা বড় অক্ষরে লিখতে হবে।
- প্রত্যেক প্রশ্নের যেন একটিমাত্র সঠিক উত্তর বা উত্তম উত্তর (best answer) থাকে। প্রশ্নে প্রদত্ত বিকল্প উত্তরগুলো (alternatives) প্রশ্নের মূল অংশের (ঝঃবস) সঙ্গে ব্যাকরণগত দিক দিয়ে শুদ্ধ বা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
- সঠিক উত্তর নির্বাচন অথবা ভুল বিকল্প বর্জন করার ব্যাপারে প্রশ্নে যেন কোনো সংকেত (clue) প্রদত্ত না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।
- বিচলকগুলো এমনভাবে রচনা করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীর নিকট আকর্ষণীয় ও আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সংগত বলে মনে হয়। বিচলকগুলো আকর্ষণীয় ও আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সংগত করে তোলার জন্য নিচের নিয়মগুলো অনুসরণ করতে হবে
    - শিক্ষার্থীরা সাধরণত যেসব ভুল করে সেগুলোকে বিচলক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
    - শিক্ষার্থীদের ভাষায় বিকল্পগুলোকে লিখতে হবে।
    - সঠিক উত্তর এবং বিচলক লেখার ক্ষেত্রে 'good- sounding'শব্দ ব্যবহার করতে হবে।
    - শব্দের দৈর্ঘ্য ও জটিলতা উভয় দিক থেকেই বিচলক ও সঠিক উত্তর সমার্থক হবে।
    - বিকল্প যেন সমজাতীয় (Homogeneous)হয়।
- সঠিক উত্তরটি যেন বিচলকগুলোর চেয়ে দৈর্ঘ্যে ছোট বা বড় না হয়। আইটেম লেখার সময় বিকল্প উত্তরগুলোর দৈর্ঘ্য যতদূর সম্ভব সমান রাখা উচিত।
- 'উপরের সবগুলো' বা 'উপরের কোনোটিই নয়'- এ ধরনের বিকল্প এড়িয়ে চলুন।
- আইটেমগুলো পরস্পর স্বাধীন থাকবে। তারা যেন একে অপরের ওপর নির্ভরশীল না হয়। অর্থাৎ একটি আইটেমের উত্তর যেন পরবর্তী আইটেমের উত্তর দিতে সাহায্য না করে।

**২. শূন্যস্থান পূরণ**

শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষায় কোন বাক্য হতে একটি শব্দ বাদ দিয়ে সে জায়গাটুকু খালি/ফাঁকা করে রাখা হয়। সে খালি জায়গাটুকু একটি উপযুক্ত শব্দ দিয়ে পূরণ করতে হয়। অনেক সময় এ জাতীয় প্রশ্নে একটি অসম্পূর্ণ বিবৃতিও দেয়া হয়। শূন্যস্থান পূরণ অভীক্ষা তৈরির সময় যেসব বিষয়গুলোর খেয়াল রাখতে হয়-

- প্রশ্নের বাক্য এমন হওয়া উচিত যাতে নির্দিষ্ট শূন্যস্থানের জন্য একটি উত্তর থাকে।
- প্রশ্নে বইয়ের ভাষা হুবহু থাকা উচিত নয়।
- একটি বাক্যে বেশি শূন্যস্থান থাকা উচিত নয়।
- বাক্যের প্রধান শব্দটি বাদ দিয়ে শূন্যস্থান তৈরি করা উচিত।
- একটি শূন্যস্থান একটি মাত্র শব্দ দিয়ে পূরণ করা উচিত।
- খাতা দেখার পূর্বে উত্তর পত্র তৈরি করে নেয়া উচিত।
- প্রশ্নপত্র তৈরি করা সময় মনে রাখা উচিত যাতে বাক্য হিসেবে নম্বর বরাদ্দ না করে শূন্যস্থানের সংখ্যা হিসেবে নম্বর বরাদ্দ রাখা হয়।

**৩. মিলকরণ**

মিলকরণ অভীক্ষায় দুই বা ততোধিক তালিকা থাকে। পরীক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী কোন একটি তালিকার প্রত্যেকটি জিনিসের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে অন্য তালিকার বর্ণিত জিনিসগুলো হতে বেছে প্রকাশ করতে হয়। মিলকরণ অভীক্ষা তৈরির ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে-

- এক প্রশ্নে এক জাতীয় বিষয় থাকবে।
- প্রশ্নের তালিকায় বর্ণিত সংখ্যার চেয়ে উত্তরের তালিকায় বর্ণিত সংখ্যা বেশি হওয়া উচিত।
- কোন বিষয়ের সাথে কোন বিষয়ের মিল করতে হবে তা স্পষ্ট করে বলা উচিত।
- উত্তরের তালিকা অক্ষরের মান অনুসারে বা সময়ের মান অনুসারে সাজানো উচিত।
- উত্তরের তালিকার উত্তরগুলো এলোমেলো ভাবে সাজানো উচিত।
- প্রশ্নগুলো এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে ছাত্ররা অনুমান করে উত্তর দেয়ার সুযোগ না পায়।

**৪. সত্য-মিথ্যা**

সত্য-মিথ্যা হলো এক ধরনের বিকল্প-উত্তরমূলক অভীক্ষা যেখানে একটি নির্দেশমূলক বিবৃতি প্রদান করে শিক্ষার্থীদের এটি সত্য না-কি মিথ্যা তা চিহ্নিত করতে বলা হয়ে থাকে। এই প্রশ্ন তিন ধরনের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য অধিক প্রযোজ্য: শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক শিখন, ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে বোধগম্যতা ও কোনো বিবৃতি/ঘটনা/তথ্য নিশ্চিতভাবে সত্য/মিথ্যা তা সম্পর্কে ধারণা যাচাই। সত্য-মিথ্যা অভীক্ষা তৈরির ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে-

- একটি প্রশ্নে শুধু একটিই মূল বিষয় থাকবে।
- বিবৃতি/তথ্যটি দ্ব্যর্থহীনভাবে সত্য বা মিথ্যা হতে হবে।
- শিক্ষার্থীর মতামত সংক্রান্ত বিবৃতি হলে তা অবশ্যই নিশ্চিতভাবে সত্য বা মিথ্যা হতে হবে।
- 'না' বোধক বিবৃতি ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।
- নাম বা গুণবাচক (কিছু, সামান্য, অনেক, বহু ইত্যাদি) শব্দের পরিবর্তে নির্দিষ্ট সংখ্যাবাচক (এক, দুই, তিন, চার ইত্যাদি) শব্দ ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে।
- বিবৃতিগুলো এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা অনুমান করে উত্তর দেয়ার সুযোগ না পায়।

## উত্তরপত্র মূল্যায়ন

শিখনের ক্ষেত্র অনুযায়ী যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়নের পর সঠিকভাবে মূল্যায়ন করাও জরুরি। মূল্যায়ন সঠিক না হলে অভীক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে এবং যে উদ্দেশ্যে ও যে শিখনফল যাচাইয়ের জন্য অভীক্ষাটি প্রণয়ন করা হয়েছে তা সফল হবে না। অভীক্ষাপদ প্রণয়ন করার পর শিক্ষার্থীর উত্তরপত্র মূল্যায়নপদ্ধতি তথা মার্কিং স্কিম, মূল্যায়নকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো আলোচনা করা হলো।

মূল্যায়নকারীভেদে একই উত্তরপত্র মূল্যায়নে পার্থক্য থাকার কারণ–

- প্রতিটি প্রশ্নের বিপরীতে কতটুকু বা কী লিখলে কত নম্বর দেয়া হবে তার নির্দেশনা দেয়া থাকে না।
- কোনো প্রকার মূল্যায়ন নির্দেশিকা বা মার্কিং স্কিম সরবরাহ করা হয় না।
- মূল্যায়ন করার জন্য অপেক্ষাকৃত কম সময় দেয়া হয়।
- অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং পর্যাপ্ত বিষয়জ্ঞানহীন শিক্ষককে পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

- পরীক্ষকের এ সংক্রান্ত কাজে মূল্যবোধের অভাব।
- মূল্যায়নকালীন কোন প্রকার পরিবীক্ষণ করার ব্যবস্থা/সুযোগ নেই।

মূল্যায়নকারীভেদে একই উত্তরপত্র মূল্যায়নে পার্থক্য থাকলে সেটা শিক্ষার্থীর শিখন ও সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। দেশব্যাপী অভিন্ন বা সর্বনিম্ন পর্যায়ে মূল্যায়ন পার্থক্য নিয়ে আসা দরকার।
দেশব্যাপী মূল্যায়নে পার্থক্য সর্বনিম্ন বা অভিন্ন করার উপায়–

- প্রতিটি বিষয়ের জন্য স্ব-ব্যাখ্যায়িত মূল্যায়ন নির্দেশিকা বা মার্কিং স্কিম[১] সরবরাহ করা।
- মূল্যায়ন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেয়া।
- অভিজ্ঞ ও পর্যাপ্ত বিষয়জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষককে পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া।
- পরীক্ষকের এ সংক্রান্ত কাজে মূল্যবোধের সৃষ্টি করা।
- মূল্যায়নকালীন সুসংগঠিত পরিবীক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

**উত্তরপত্র মূল্যায়নকালীন করণীয়-**

- ধৈর্যসহকারে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করুন।
- মূল্যায়নকালে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করুন। মনে রাখবেন, আপনি বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন।
- উত্তরপত্রের প্রতিটি শব্দ/বাক্য/বানান প্রভৃতি মনোযোগসহকারে পড়ে মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুযায়ী নম্বর প্রদান করুন।
- পরীক্ষার্থী ভেদে সংক্ষিপ্ত এবং রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর ভিন্নতা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে অর্থগত, ভাবগত ও Communicating Value-এর ভিত্তিতে মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুযায়ী নম্বর প্রদান করুন।
- যেহেতু হাতের সুন্দর লেখার জন্য কোনো নম্বর সুনির্দিষ্ট করা নেই– কাজেই পরীক্ষার্থীর হাতের লেখা সুন্দর না হলেও যদি প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করা যায় এবং উত্তর প্রদান সঠিক হয় তবে পূর্ণ নম্বর দিন।
- বহু নির্বাচনি প্রশ্নের জন্য প্রশ্নপত্রে যে নির্দেশনা প্রদান করা আছে, তা যথাযথভাবে অনুসরণ করুন।
- অভীক্ষার উত্তরের যথার্থ ও সুনির্দিষ্টতার দিকে লক্ষ্য রেখে মূল্যায়ন করুন।
- প্রতিটি অভীক্ষা পদের (প্রশ্নের) উত্তর মূল্যায়ন করেছেন কি না, তা যাচাই করুন।
- প্রতিটি উত্তরের জন্য নির্দেশনা মোতাবেক নম্বর প্রদান করা হয়েছে কি না, তা পুনঃনিরীক্ষা করুন।
- লক্ষ রাখুন, শিক্ষার্থীর কোন প্রশ্নে অতিরিক্ত নম্বর (Over marking) দেয়া হয়েছে কিনা অথবা কম নম্বর (under marking)দেয়া হয়েছে কিনা।

***মূল্যায়নকারী যা যা করবেন না-***

- এক বসায় ৫-১০টির বেশি উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবেন না।
- নিজের ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তিতে উত্তর মূল্যায়ন করবেন না।
- উত্তরপত্র যেখানে-সেখানে অযত্নে ফেলে রাখবেন না।
- অমনোযোগী বা কোনো প্রকার খোশগল্পে মত্ত হয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবেন না।
- অপরিষ্কার লেখা দেখে অধৈর্য হওয়া যাবে না এবং সুন্দর লেখা বা অপরিষ্কার লেখার জন্য অধিক/কম নম্বর প্রদান করা যাবে না।

[১]প্রতি বিষয়ের প্রতিটি প্রশ্ন ও তার সম্ভাব্য উত্তর এবং উত্তর মূল্যায়ন নির্দেশিকা অর্থাৎ শিক্ষার্থী কর্তৃক লিখিত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের প্রেক্ষিতে কত নম্বর পাবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা সংবলিত ডকুমেন্ট হলো মার্কিং স্কিম। এসম্পর্কে পরবর্তিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সর্বোপরি মনে রাখবেন, একজন পরীক্ষকের মূল্যায়নের ওপর একজন শিক্ষার্থীর অনাগত ভবিষ্যত নির্ভর করছে। তাই পরীক্ষক যদি একজন শিক্ষার্থীকে সঠিক ভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন তবে তা যেমনিভাবে ওই শিক্ষার্থীর জন্য তেমনিভাবে দেশের জন্যও মঙ্গল জনক। আর পরীক্ষকের অবমূল্যায়নের কারণে যদি কোনো শিক্ষার্থীর পড়াশুনার পরিসমাপ্তি ঘটে পরীক্ষক নৈতিকভাবেই এর দায়ভার এড়াতে পারেন না।

## শিখনের মানসম্মত পরিমাপ

**নম্বর বণ্টন ও প্রদান**

শিক্ষার্থীদের কোনভাবে মূল্যায়ন করতে হবে তার নম্বর বণ্টন প্রক্রিয়া প্রাথমিক শিক্ষা মূল্যায়ন নির্দেশিকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

**রুব্রিক কী ও কেন?**

সাধারণভাবে বলতে গেলে রুব্রিক একটি মূল্যায়ন উপকরণ, যা শিক্ষার্থী সম্পাদিত বিভিন্ন কাজ, উত্তর বা অ্যাসাইনমেন্ট মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা হয় (Hoehne, 2009)। অর্থাৎ রুব্রিক শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা বা কাজের মানের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। একটি ভালো রুব্রিক সেই সব মানদন্ডের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়, যা আমরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখতে চাই। শিক্ষার্থীদের শিখন বা পারদর্শিতা সম্পর্কে আমাদের প্রত্যাশা কী, রুব্রিক সে সম্পর্কে শিক্ষক ও শিক্ষর্থী উভয়কেই স্পষ্ট ধারণা দেয়।

রুব্রিকে শিক্ষার্থীর কোনো কাজ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত মানদন্ড সংযোজন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো লেখা যাচাই করার জন্য উদ্দেশ্য, সংগঠন, বর্ণনা, যুক্তি, প্রক্রিয়া ইত্যাদি মানদন্ড একটি লেখা যাচাই করার রুব্রিকে থাকতে পারে। এ ছাড়া রুব্রিকে প্রতি মানদন্ডের মান যাচাই করে নম্বর (marks) বা গ্রেড প্রদান করার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে, যেমন খুব ভালো (excellent) থেকে দুর্বল (poor) দিকনির্দেশনা থাকে (Goodrich, 1997)।

নানা কারণে রুব্রিক গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে শিক্ষক শিক্ষার্থীর কী কী মানদন্ড ও আদর্শের আলোকে মূল্যায়ন করবেন তা জেনে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সেভাবে প্রস্তুত করতে পারেন। কেননা রুব্রিক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা বা সাফল্য মানদন্ড সু-নির্দিষ্ট করে। এছাড়াও রুব্রিক যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো-

- নির্ভরযোগ্য মূল্যায়নে সহায়তা করে।
- বিভিন্ন মূল্যায়নকারীর যাচাই প্রক্রিয়া একই রকম হয়।
- নির্দিষ্ট দক্ষতা মূল্যায়নে সাহায্য করে।
- শিক্ষকের জন্য মূল্যায়নের দিক নির্দেশনা প্রদান করে।
- গ্রেড প্রদানের কাজ সহজ ও দ্রুত করতে সহায়তা করে।
- বিস্তারিত ও গঠনমূলক ফলাবর্তন প্রদানে সহায়তা করে।

**রুব্রিক তৈরির কৌশল**

সাধারণত একটি রুব্রিকে চারটি অংশ থাকে: মানদন্ড (criteria), আদর্শ (standards), বিবৃতি (descriptors) এবং স্কেল বা পয়েন্ট মান (scale)। এ চারটি অংশের ওপর ভিত্তি করেই একটি রুব্রিক তৈরি করা হয়। নিচে উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো-

- **মানদন্ড (criteria)**

রুব্রিকের একটি প্রধান অংশ হলো এর পারদর্শিতা বা সাফল্য বা মূল্যায়ন মানদন্ড (performance or success or evaluative criteria), যার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা, যেমন-কোনো কাজ বা দক্ষতা মূল্যায়ন করা হয়। এতে কোনো বিষয়ে সাফল্যমন্ডিত পারদর্শিতার জন্য যে যে দিকের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে বা যে যে শর্ত মানতে হবে সে সকল গুরুত্বপূর্ণ দিক সংযোজন করা হয়।

এই মানদন্ড নির্ধারণের সময় লক্ষ রাখা প্রয়োজন, যেন তা শিখন শেখানো পদ্ধতির সাথে সংগতিপূর্ণ হয় এবং শিক্ষকের পাঠ পরিকল্পনার জন্য দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে। কারণ এসব মানদন্ডের অর্জনই শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ সাধনে সহায়তা করবে। শিক্ষক এই মানদন্ড শিক্ষার্থীকে অবহিত করবেন, যাতে শিক্ষার্থী তা অর্জনে সচেষ্ট হতে পারে। যেমন- একটি লিখিত অ্যাসাইনমেন্টের মানদন্ডের মধ্যে যা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে:

- ভূমিকা
- প্যারাগ্রাফ
- উদাহরণ
- উপসংহার

- **আদর্শ (standards)**

এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো আদর্শ (standard) বা আদর্শ মাত্রা। পারদর্শিতার মানদন্ড কতটা ভালোভাবে অর্জিত হয়েছে তা নির্দেশিত হয় আদর্শ মাত্রা দ্বারা। অর্থাৎ পারদর্শিতার বিভিন্ন অংশ কতটা ভালোভাবে অর্জিত হয়েছে তার সাংখ্যিক বা বর্ণনামূলক মাত্রা, যা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। যেমন–

- ভূমিকা : দুর্বল, মোটামুটি, ভালো ইত্যাদি।
- প্যারাগ্রাফ : দুর্বল, মোটামুটি, ভালো ইত্যাদি।
- উদাহরণ : দুর্বল, মোটামুটি, ভালো ইত্যাদি।
- উপসংহার : দুর্বল, মোটামুটি, ভালো ইত্যাদি।

- **বিবৃতি (descriptors)**

এখানে পারদর্শিতার বিভিন্ন অংশের মানদন্ড এবং আদর্শ মাত্রার বিস্তারিত বর্ণনা থাকে, যার আলোকে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা বা এর বিভিন্ন অংশ যাচাই বা মূল্যায়ন করা হয়।

- **স্কেল বা পয়েন্ট মান (scale)**

পয়েন্ট মান যা দ্বারা শিক্ষার্থী সম্পাদিত কাজের মান নির্দেশ করা হয়। পয়েন্ট মান সাংখ্যিক বা বর্ণনামূলক হতে পারে এবং একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে যে কোনো মান হতে পারে। সবচেয়ে উত্তম কাজের জন্য সর্বোচ্চ মান দেয়া হয়। যেমন–

- উন্নয়ন প্রয়োজন (১), সন্তোষজনক (২), ভালো (৩), খুবই ভালো (৪) [চার পয়েন্ট মান/স্কেল]
- দুর্বল (১), মোটামুটি (২), গড়পড়তায় ভালো (৩), খুব ভালো (৪), চমৎকার (৫) [পাঁচ পয়েন্ট মান/স্কেল]

রুব্রিক তৈরির সময় শিক্ষক এক সেট মানদন্ড তৈরি করেন, ব্যাখ্যাসহ মানদন্ডের প্রয়োজনীয় বর্ণনা প্রদান করেন, প্রতিটি মানদন্ডের সাথে একটি পয়েন্ট মান (১, ২, ৩, ইত্যাদি) সংযোজন করেন।
যেখানে গ্রেড ব্যক্তি দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে সেখানে রুব্রিক গ্রেড প্রদানে একটি নিরপেক্ষ উপকরণ হিসেবে কাজ করে।

## কার্যকর মূল্যায়নের নীতিমালা

মানসম্মত শিক্ষণ ও শিখনের সাথে মূল্যায়নের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে কার্যকর মূল্যায়নের বিকল্প নেই। শিখন উদ্দেশ্যের সাথে কতটা সঙ্গতিপূর্ণভাবে শিখন–শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে প্রয়োজন কার্যকর মূল্যায়ন।
কার্যকর মূল্যায়ন হলো সেই মূল্যায়ন, যা শিক্ষার্থীর শিখনকে ত্বরান্বিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। যে মূল্যায়ন শিক্ষার্থী কী শিখতে পেরেছে আর কী শিখতে পারেনি, কতটুকু শিখতে পেরেছে আর কী শিখতে হবে তা চিহ্নিত করে এবং শিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে যাওয়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করে, তা-ই কার্যকর মূল্যায়ন। মূল্যায়নকে কার্যকর করতে হলে কতগুলো নীতিমালা মেনে চলা প্রয়োজন, যা নিচে আলোচনা করা হলো।

**১. শিশুসহায়ক মূল্যায়নঃ** মূল্যায়ন কৌশল বা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর শিখনের জন্য সহায়ক (Facilitator) হিসেবে কাজ করা উচিত। মূল্যায়ন এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে, যাতে তা থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শেখার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। শ্রেণি শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার সাথে মূল্যায়নকে সমন্বিত করে শিক্ষার্থীদের 'কীভাবে শিখতে হবে' (how to learn) সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। আর এ জন্য শিক্ষার্থীর শিখনকে প্রক্রিয়া(process) হিসেবে দেখা দরকার, শুধু একটি সর্বশেষ ফল(product) হিসেবে নয়।

**২. মূল্যায়নের মানদন্ড নির্ধারণঃ** মূল্যায়নের মানদন্ড শিক্ষার্থীর নিকট সুস্পষ্ট থাকা আবশ্যক, গোপনীয় নয়। শিক্ষার্থীকে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করার জন্য তাদের সাথে মূল্যায়নের সাফল্য মানদন্ড (Assessment Criteria) আলোচনা করা প্রয়োজন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর কাছে এটা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে কী ধরনের উত্তর আশা করেন। সাফল্য মানদন্ড শিক্ষার্থীকে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে। এ ছাড়া শিক্ষকও বুঝতে পারবেন মূল্যায়নের সময় তার কোন নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

**৩. বহুমুখী মূল্যায়নঃ** শিক্ষার্থীদের অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে একাধিক ধরনের মূল্যায়ন কৌশলে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া প্রয়োজন। যেহেতু মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে তার শিখনে সহায়তা করা, তাই শিক্ষার্থী যাতে তার জ্ঞান বা দক্ষতা প্রদর্শনের একাধিক সুযোগ লাভ করে সেদিকে লক্ষ করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশল বা পদ্ধতি রয়েছে। মূল্যায়নের জন্য কোনো একক পদ্ধতি বা কৌশল যথেষ্ট নয়। শিক্ষার্থীদের শিখন বা পারদর্শিতা প্রদর্শনের জন্য যাতে একাধিক বা বহুমুখী সুযোগ পায় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। আর এই মূল্যায়ন অনানুষ্ঠানিক বা স্বাভাবিক পরিবেশে সংঘটিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থী মূল্যায়নকে শিখন শেখানো কার্যাবলি থেকে পৃথক না করতে পারে। এতে শিক্ষার্থীর উদ্বিগ্নতা হ্রাস পেতে সহায়তা হয়।

**৪. স্ব-মূল্যায়ন ও সহযোগিতামূলক মূল্যায়নঃ** মূল্যায়ন কৌশলে স্ব-মূল্যায়ন (Self-assessment) ও সহযোগিতামূলক মূল্যায়নের (Collaborative-assessment) সুযোগ থাকা প্রয়োজন। শিক্ষণ এবং শিখন

প্রক্রিয়াকে উচ্চ মানসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে স্বমূল্যায়ন এবং সহযোগিতামূলক মূলায়নের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কারণ এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জন ও দক্ষতা সম্পর্কে চিন্তা ও প্রতিফলনের সুযোগ পায়, জ্ঞানের গভীরতা বৃদ্ধির সুযোগ লাভ করে, দক্ষতা ও বোধগম্যতা বিকাশের সুযোগ পায়।

**5. দলীয় মূল্যায়নঃ** মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের একত্রে কাজ করার সুযোগ প্রদান করা উচিত এবং কাজ সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের দলগত কাজে জড়িত করা শ্রেণিকক্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। দলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের চিন্তা একে অন্যের সাথে বিনিময় করতে পারে, যা থেকে নতুন ধারণার জন্ম হতে পারে। এভাবে আলোচনার ফলকে শিক্ষার্থী নিজের কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দেবে এবং কোনো কাজ সম্পন্ন করার আত্মবিশ্বাস জন্মাবে। সহপাঠীদের মধ্যে সহযোগিতার সুযোগ শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যায়নের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি করবে।

**6. মূল্যায়নের ভিন্নতাঃ** মূল্যায়ন জেন্ডার, সংস্কৃতি, ভাষা, প্রতিবন্ধিতা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি ভিন্নতার সাপেক্ষে সংবেদনশীল হতে হবে। মূল্যায়নের সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্যমান ভিন্নতাকে বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন শিক্ষার্থী বিভিন্নভাবে শেখে-এই বিবেচনা থেকে সকলের জন্য উপযুক্ত মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে শিখন চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষার্থীর জন্য বিভিন্ন প্রকার মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

সর্বোপরি মূল্যায়ন হবে সমস্যা শনাক্তকারী, গাঠনিক এবং নিরন্তর/নিয়মিত। মূল্যায়ন সবচেয়ে ভালো কাজ করে যদি তা বিচ্ছিন্ন না হয়ে নিয়মিত পরিচালিত হয়, শিক্ষার্থীকে ফলাবর্তন দেয়, শিক্ষার্থীকে শিখনে সহায়তা করে।

# অধ্যায় ৪

# শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন ও প্রতিফলনমূলক অনুশীলন

## পেশাগত উন্নয়ন কী?

শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন শিখন শেখানো কার্যাবলির মানোন্নয়নের একটি অন্যতম উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পেশাগত উন্নয়ন কার্যক্রম বলতে সাধারণভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালীন চাকরিকালে (Inservice) পেশাজীবিগণ যে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন তাকে বোঝানো হয়। শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো সাধারণত চাকরিতে প্রবেশের পূর্বে বা চাকরির শুরুতে (Pre-service/Initial teacher education) এবং চাকরিকালীন বিভিন্ন অবস্থায়(Inservice) হয়ে থাকে। অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাকরিতে প্রবেশের পূর্বেই একজন ব্যক্তিকে শিক্ষা বিষয়ক ডিগ্রি/ ডিপ্লোমা/ সার্টিফিকেট অর্জন করতে হয়। কোন কোন দেশে যেমন- শ্রীলঙ্কাতে শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত হওয়ার শুরুতেই শিক্ষা বিষয়ক ডিগ্রি/ ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট অর্জন করতে হয় এবং এটি অর্জনের পরেই কেবল শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকতা করতে পারে। আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরিতে প্রবেশের কয়েক বছরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক ডিপিএড ডিগ্রি অর্জন করতে হয়।এ সব কার্যক্রমই Pre-service/ Initial teacher education এরঅন্তর্গত। এ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য প্রাথমিক শিক্ষকদের বিষয়বস্তুর পাশাপাশি শিক্ষাক্রম; শিশুর বিকাশ; শিখন শেখানো তত্ত্ব, কৌশল ও পদ্ধতি; মূল্যায়ন কৌশলসহ পেশাগত দক্ষতার ভিত্তি গড়ে তোলা। এ কার্যক্রম শিক্ষককে পরবর্তীতে অংশগ্রহণকৃত পেশাগত উন্নয়ন কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করতে সাহায্য করে।

এসব কৌশল কাঠামোবদ্ধ ও উন্মুক্ত উভয় ধরনেরই হতে পারে। কাঠামোবদ্ধ কৌশলসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

- কোর্স (পড়ঁৎংবং)
- ওয়ার্কশপ (ড়িৎশংযড়ঢ়)
- শিক্ষাবিষয়ক কনফারেন্স/ সেমিনার (education conference and seminars)
- অন্য বিদ্যালয়ে পর্যবেক্ষণমূলক পরিদর্শন (observation visits to other schools)
- শিক্ষকদের নেটওয়ার্কে অংশগ্রহণ (participation in a network of teachers)
- একক অথবা সমন্বিত গবেষণা (individual or collaborative research)
- মেনটরিং, সহকর্মীর কাজ পর্যবেক্ষণ এবং কোচিং (mentoring and/or peer observation and coaching)

এসব কাঠামোবদ্ধ পেশাগত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রাথমিক ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে একাধিক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম ও কাজ নিম্নে দেওয়া হলঃ

- প্রাইমারিটিচার ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (পিটিআই) - ডিপিএড কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।
- উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি) -বিষয়ভিত্তিক ও অন্যান্য চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করছে।
- ক্লাস্টার - চাহিদাভিত্তিক চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করছে।

- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) - ডিপিএড কোর্স পরিচালনা করে এবং প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাগনের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছে।
- শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় - ডিপিএড কোর্সের মান নিয়ন্ত্রণ ও সনদ প্রদান করে।
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রাথমিক পর্যায়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করে এবং বিস্তরণ করে।
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই), প্রশিক্ষণ শাখা - সব ধরনের চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও পরিচালনা করে।

এসব কাঠামোবদ্ধ পেশাগত উন্নয়ন কার্যক্রম ছাড়াও পেশাগত উন্নয়নের উন্মুক্ত কিছু কৌশল রয়েছে যেগুলো শিক্ষক নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোন সময় অনুসরন করতে পারেন যেমনঃ পেশাগত উন্নয়ন বিষয়ক প্রবন্ধ ও অন্যান্য প্রকাশনা পাঠ করা, সহকর্মীর সাথে আলোচনা করা। এসব পেশাগত উন্নয়ন কার্যক্রম শিক্ষককে বিষয়বস্তুর জ্ঞান, কার্যকরী শিক্ষণ কৌশল ব্যবহার ও শিক্ষার্থী মূল্যায়নের দক্ষতা বৃদ্ধি ছাড়াও সর্বোপরি শিক্ষকের শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে কাঙ্খিত পরিবর্তন আনতে সহায়তা করে থাকে।

Inservice বা চাকুরিকালীন পেশাগত উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় এই কৌশলগুলো মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি হল Top-Down approach এবং অন্যটি হল Bottom-Up approach. Top-Down approach হল বহুল প্রচলিত পেশাগত উন্নয়ন (Professional Development) প্রোগ্রামসমূহ যেগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত হয়ে থাকে । এসব কার্যক্রমে অল্প সময়ে খুব বেশি তথ্য প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে নতুন প্রবর্তিত বিষয় বা পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা প্রদান (যেমন: সৃজনশীল প্রশ্ন, নতুন পাঠ্যবই) বা শিক্ষকদের নির্দিষ্ট দক্ষতার উন্নয়ন (কম্পিউটার দক্ষতা, নতুন কোন শিখন-শেখানো কৌশল) ইত্যাদি এ প্রক্রিয়ার অর্ন্তভুক্ত।

অন্যদিকে Bottom-Up approach টি বর্তমানে পেশাগত শিখন বা Professional Learning নামে পরিচিত। এটি একধরনের Reflective practice বা প্রতিফলন অনুশীলন। নিজ কাজের প্রতিফলন চর্চা বা অনুশীলন এমন একটি কৌশল, যা শিক্ষককে তার পেশাগত মান সম্পর্কে ফলাবর্তন পেতে এবং এ ফলাবর্তন অনুসারে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পেয়ে থাকে। পেশাগত শিখনে শিক্ষক স্বতন্ত্রভাবে শিখনের পাশাপাশি সহকর্মীদের সাথে সহযোগিতামূলক পরিবেশে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষকরা মূলত পেশাগত শিখন দল (Professional Learning Community) গঠন করে থাকে। পেশাগত শিখন দলে শিক্ষকেরা বিষয়বস্তু সংক্রান্ত সমস্যা, নতুন কোন শিখন শেখানো কৌশল প্রয়োগজনিত সমস্যাসহ শিখন শেখানো কার্যক্রমের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকে।

## প্রতিফলনমূলক অনুশীলন (Reflective Practice) কী?

স্ব-উদ্যোগে শিক্ষকতা পেশার মান উন্নয়নেশিক্ষকরা সবসময়েই কিছু না কিছু করে থাকেন। যেমন, শিক্ষকরা একটি ক্লাস পরিচালনা করার সময় এবং ক্লাস সম্পন্ন করার পর ঐ ক্লাসের ওপর প্রতিফলন বা আত্ম-মূল্যায়ন করে থাকেন। এই আত্ম-মূল্যায়ন এর উদ্দেশ্য ক্লাসের ভুলত্রুটি বের করে পরবর্তী সময়ে আরও ভালভাবে

শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা। শিক্ষকদের এ আত্ম-মূল্যায়নে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে পেশাগত উন্নয়ন মানসম্মত হয়। নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আত্ম-মূল্যায়নকে প্রতিফলনমূলক অনুশীলন বা চর্চা বলে।

নিজ কাজের প্রতিফলন চর্চা বা অনুশীলন এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন শিক্ষক তার শিখন শেখানো দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাগুলোকে আলোচনা, সমালোচনা ও মূল্যায়ন করে শিখন শেখানো কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধন করতে পারেন।

শিক্ষকের প্রতিফলনমূলক অনুশীলনকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে - কর্মের ওপর প্রতিফলন (Reflection on action) এবং কর্মকালীন/ক্রিয়াকালীন প্রতিফলন (Reflection in action) কর্মেরওপর প্রতিফলন বা Reflection on action এর ক্ষেত্রে, শিক্ষকের শ্রেণি কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর তার ওপর প্রতিফলন অনুশীলন করা হয় এবং ফলাবর্তনের ভিত্তিতে শিক্ষক তার চর্চায় পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। ক্রিয়াকালীন প্রতিফলন বা Reflection in action হচ্ছে, শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে প্রতিফলনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান।

## প্রতিফলনমূলক অনুশীলনের উপায়

ক্রিয়ার প্রতিফলন বা Reflection on action সাধারণত চারটি উপায়ে করা যেতে পারেঃ

- কর্মসহায়ক/ কার্যোপযোগী গবেষণা (Action research)
- কেস স্টাডি (Case Study)
- পাঠ সমীক্ষা (Lesson study)
- মেন্টরিং (Mentoring)

শিক্ষকের প্রতিনিয়ত তাদের পেশাগত কাজে কিছু না কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। সে সমস্যাগুলো সমাধানের সহায়ক উপায় হলো কর্মসহায়ক গবেষণা বা Action research. শ্রেণি কার্যক্রমকে আরো পরিশীলিত করে তুলতে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পেশাগত শিখন দলে পাঠ সমীক্ষা (Lesson Study) কার্যক্রম একটি যুগোপযোগী কৌশল। জাপানী শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পাঠ সমীক্ষা (Lesson Study) কার্যক্রমের প্রয়োগ অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে পাঠ সমীক্ষা ব্যাপক অনুশীলন হচ্ছে। মেন্টরিং (Mentoring) প্রক্রিয়া, যেখানে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি একজন নবীন ব্যক্তিকে তার প্রারম্ভিক বা শিক্ষানবিশকালে সহায়তা করে থাকেন। এটি একটি কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়া, যেখানে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অন্যদের পেশাগত উন্নয়নে সহায়তার জন্যে মত বিনিময় করে থাকেন।

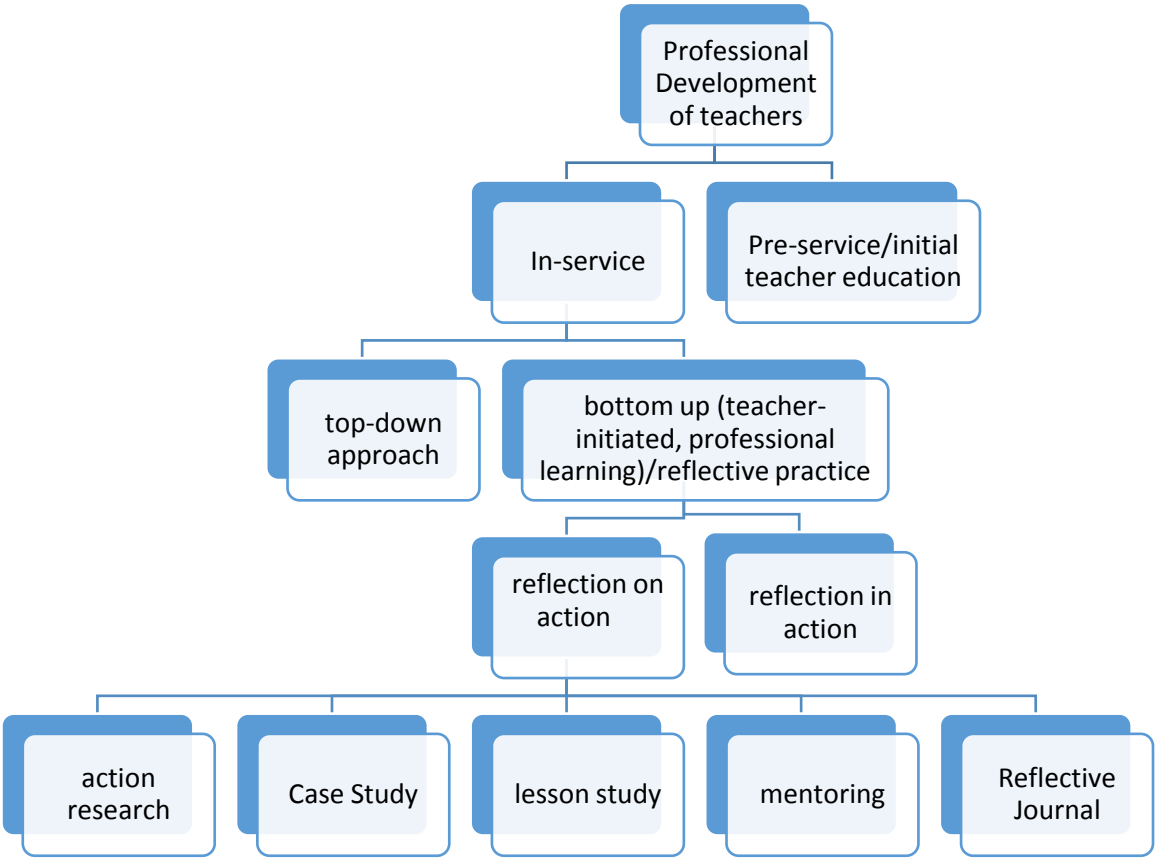


চিত্র ৪.১: শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন কার্যক্রম

**প্রতিফলন অনুশীলনের সুবিধা**

প্রতিফলন অনুশীলন একজন শিক্ষককে তার দক্ষতা বিকাশে এবং পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যভাবে সাহায্য করে।

1. শিক্ষককে নিজ নিজ কাজের প্রতিফলনের সুযোগ করে দেয়।
2. শিক্ষক তার নিজস্ব শিখন শেখানো কৌশল সর্ম্পকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেন।
3. শিক্ষক হিসেবে তাঁর পেশাগত সফলতা যাচাইয়ের সুযোগ পান।
4. বিকল্প শিখন শেখানো পদ্ধতি অনুশীলন করে সফলতা যাচাই করতে পারেন।
5. শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের অনুসৃত পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট কি না তা বুঝতে পারেন।

**প্রতিফলন অনুশীলন চক্র (Cycle of Reflective Practice)**

সাধারণভাবে প্রতিফলন অনুশীলন প্রক্রিয়া একটি চক্রাকার কার্যপ্রণালীর মাধ্যমে সম্পন্ন হয় বিধায় তাকে প্রতিফলন শিখন চক্র বলা হয়। প্রতিফলনমূলক শিখন চক্রের একটি কাঠামো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

বর্ণনা (Description)
অনুভূতি (Feelings)
মূল্যায়ন (Evaluation)
বিশ্লেষণ (Analysis)
উপসংহার (Conclusion)
কর্মপরিকল্পনা (Action Plan)

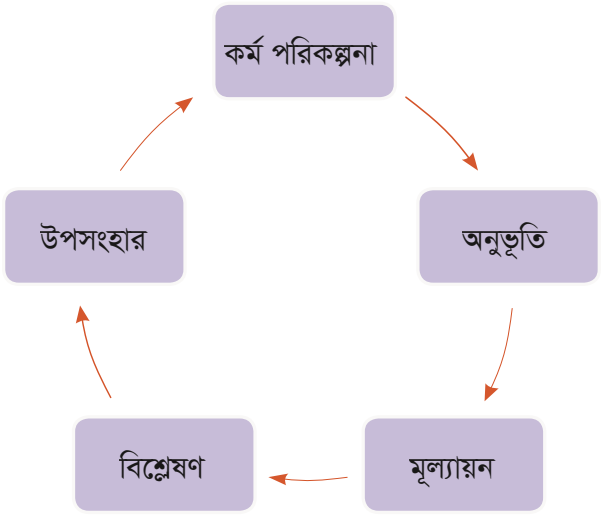


চ্র ৪.২: প্রতিফলন অনুশীলন চক্র

**বর্ণনা:** প্রতিফলনমূলক শিখন চক্রের এই অংশে শিক্ষার্থীদের শিখন অভিজ্ঞতার বিবরণ থাকে। শিক্ষার্থী শিক্ষকগণ তাদের শিখন শেখানো কার্যক্রম অনুশীলন থেকে কার্যক্রমের প্রতিফলন বিস্তারিতভাবে নোট বুক অথবা ডায়রিতে লিপিবদ্ধ করেন। এখানে শিক্ষক কেন তার দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে চান বা পরিবর্তন চান তার যুক্তি ব্যাখ্যা করা হয়।

**অনুভূতি:** শ্রেণিতে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার পর এ কার্যক্রম সম্পর্কে শিক্ষকের অনুভূতি কেমন, কার্যক্রম যেভাবে পরিচালনা করেছেন তাতে কি যথাযথভাবে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে? যে সকল উপকরণ ব্যবহার করেছেন তা কি যথেষ্ট ও যথোপযুক্ত ছিল? শিক্ষার্থীরা কি শিখনফল অর্জন করতে পেরেছে? ইত্যাদি বিষয়গুলো কেমন লেগেছে তা লিখে রাখেন। সার্বিকভাবে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা যেভাবে করেছেন তাতে কি তিনি সন্তুষ্ট অথবা আরো উন্নয়নের প্রয়োজন আছে মনে করেন? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়।

**মূল্যায়ন:** শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালে যদি কোনো অংশ যথাযথভাবে হয়নি বলে মনে হয় তবে কেন সেটা সঠিকভাবে হয়নি; বিকল্প পদ্ধতি/কৌশল অবলম্বন করতে পারতেন কি না এ সকল বিষয় এ অংশে লিপিবদ্ধ করা হয়।

**বিশ্লেষণ:** এ অংশে কী কী অভিজ্ঞতা অর্জিত হলো সেটা আলোচনা করা হয়। এ অংশে শিক্ষার্থী শিক্ষকের কোনো ত্রুটি হলে তার অন্তর্নিহিত কারণ চিহ্নিত করে তা বিশ্লেষণ করেন।

**উপসংহার:** প্রতিফলন অনুশীলন বিশ্লেষণের পর কী কী পদক্ষেপ পরবর্তীতে নেয়া হবে সেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

**কর্মপরিকল্পনা:** পরবর্তী পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। চিহ্নিত উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো উন্নয়নের জন্য সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়।

**প্রতিফলন অনুশীলনে সহযোগিতা**

প্রতিফলন অনুশীলনের জন্য একজন শিক্ষক বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে সহযোগিতা নিতে পারেন। যেমন

1. শিক্ষক প্রশিক্ষক কর্তৃক নির্দেশনা
2. অভিজ্ঞ শিক্ষকের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ
3. সতীর্থ শিক্ষকের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ
4. শিখন দলে আলোচনা/মতবিনিময়
5. সতীর্থ শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ

**শিক্ষক প্রশিক্ষক কর্তৃক নির্দেশনা:** প্রতিফলন অনুশীলনে শিক্ষক প্রশিক্ষকগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের শ্রেণি শিখন শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে প্রশিক্ষকরা কার্যকর ও সঠিক নির্দেশনা প্রদান করবেন। শিক্ষার্থীরা যাতে নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করে, তা ফলোআপ করে শিক্ষ ার্থীদের শিখন শেখানো কার্যক্রমের মনোন্নয়ন নিশ্চিত করবেন। প্রশিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত কাজ পর্যালোচনা, কাজ পর্যবেক্ষণ, বিভিন্নভাবে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন এবং তদনুযায়ী নির্দেশনা দিতে পারেন। প্রশিক্ষক বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষ ার্থীদের মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি করতে পারেন, যাতে তারা প্রতিফলন অনুশীলনে আগ্রহী হন।

**বিশেষজ্ঞ/অভিজ্ঞ শিক্ষকের শিখন শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ:** অভিজ্ঞ শিক্ষকের শ্রেণি শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ প্রতিফলন অনুশীলনের আরেকটি অন্যতম উপায়। বিশেষজ্ঞ/অভিজ্ঞ শিক্ষকের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষক নিজের কাজের সাথে তুলনা করতে পারেন। ভালো ও যথাযথ পদ্ধতি/কৌশলগুলো অবলম্বন করে শিখন শেখানো কার্যক্রমের মনোন্নয়ন করতে পারেন। শ্রেণি পর্যবেক্ষণ শেষে অভিজ্ঞ শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে গৃহীত পদ্ধতি/কৌশল গ্রহণের অন্তর্নিহিত কারণও জানা যেতে পারে, যা শিক্ষার্থীকে আত্মবিশ্বাস স্থাপনে সহায়তা করে।

**সতীর্থ শিক্ষকের শ্রেণি শিখন শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ:** সতীর্থ শিক্ষকের শ্রেণি শিখন শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যথাযথভাবে প্রতিফলন অনুশীলন করা যায়। কেটল ও মিনারস (১৯৯৬) তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, সতীর্থ প্রতিফলন দলের ব্যবহার শিক্ষার্থী শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষভাবে সহায়তা ও প্রেষণা দিয়ে থাকে। শিক্ষ ার্থী শিক্ষকগণ তাঁদের সতীর্থদের দ্বারা নিজেদের শিখন শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করাতে বা সতীর্থদের শ্রেণি শিখন শেখানো কার্যক্রম নিজে পর্যবেক্ষণ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এ ধরনের পর্যবেক্ষণে নিজের উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলোকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাঁরা আলোচনা ও যুক্তি প্রদানে স্বতঃস্ফূর্ততা বোধ করেন। সতীর্থদের শিখন শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে সহযোগিতামূলক ও অংশগ্রহণমূলক অনুশীলনের সুযোগ সৃষ্টি করে বিধায় এটা পেশাগত উন্নয়নে সহায়ক হয়।

**আলোচনা/মতবিনিময়:** শিক্ষার্থী শিক্ষক একদল সতীর্থ শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তুতিমূলক মানসম্মত ধারণা গঠন করতে পারেন। মতবিনিময় বা আলোচনার মাধ্যমে নবীন শিক্ষকের আচরণের বা পূর্বের ধারণা পরিবর্তনের জন্য ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

**সতীর্থ শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণঃ** চাকরিরত শিক্ষার্থী শিক্ষকদের জন্য প্রতিফলনমূলক অনুশীলনের আর একটি উপায় হলো সতীর্থদের পরামর্শ গ্রহণ। নিজের চিহ্নিত উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে সতীর্থদের সাথে আলোচনা করতে পারেন। তারা বিষয়গুলোকে কীভাবে সমাধান করেন তা শুনতে পারেন। উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিজের পরিকল্পনার কথা সতীর্থদের সাথে আলোচনা করতে পারেন। তেমনি সতীর্থরা চিহ্নিত কাজগুলো কীভাবে করে তা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। সতীর্থদের সাথে একটি সম্মিলিত ও সহযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজের কাজের মানোন্নয়ন করা যেতে পারে। এ প্রচেষ্টা শিক্ষকতা পেশাকে উন্নত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী ও সহায়ক উপায়।

## পাঠ সমীক্ষা(Lesson Study)

আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি, শিক্ষকদের অব্যাহত পেশাগত উন্নয়নের বিভিন্ন কৌশল রয়েছে। এই অংশেএকটি বিশেষ কৌশল হিসেবে পাঠ সমীক্ষা (Lesson Study) কার্যক্রমটির বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

### পাঠ সমীক্ষার ধারণা

শিক্ষার্থীর শিখনকে সহজ ও মানসম্পন্ন করার জন্য শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার মান উন্নয়ন দরকার। শিক্ষক তার শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যাবলির মানোন্নয়নের জন্য যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন পাঠ সমীক্ষা বা Lesson Study তার মধ্যে অন্যতম।পাঠ সমীক্ষা হলো শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের/শিখনের একটি বিশেষ ধরন, যা শিক্ষকের উদ্যোগে শ্রেণিকক্ষে পরিচালনা করা হয়। জাপান সর্বপ্রথম পাঠ সমীক্ষা শুরু করলেও ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর অনেক দেশে এটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

প্রকৃতপক্ষে পাঠ সমীক্ষা হলো শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের একটি ধারাবাহিক ও দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া যেখানে শিখন শেখানো কার্যক্রমের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষকগণ তাঁদের সহকর্মীদের নিয়ে একসাথে কাজ করেন। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষকেরা সম্মিলিতভাবে পরিকল্পনা, অনুশীলন ও প্রতিফলনের(Collaborative reflection)মাধ্যমে তাদের প্রত্যেকের শিখন শেখানো কাজ এর মান উন্নয়ন করতে পারেন। অর্থাৎ পাঠ সমীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষকেরা তাদের শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট শিখন পদ্ধতি ও তার বাস্তবায়ন এর পথ খুঁজে বের করতে পারেন।পাঠ সমীক্ষা কার্যক্রমের সাধারণ মডেল হচ্ছে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও প্রতিফলন চক্র (Plan- Do- See cycle) । এ মডেলের একেকটি চক্রকে মানসম্মত শিক্ষণ চক্র বলা হয়।

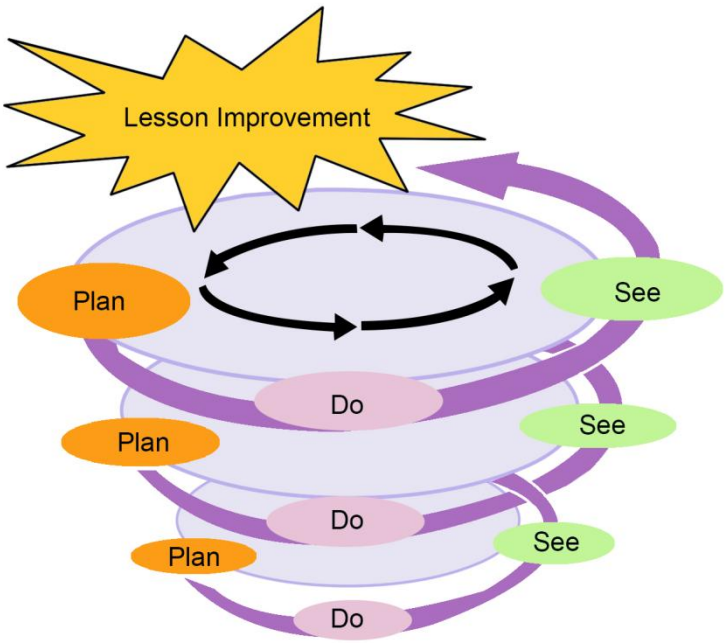


চিত্র ৪.৩: পাঠ সমীক্ষা চক্র

**পাঠ সমীক্ষা কেন?**

পাঠ সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিখন শেখানোর মান উন্নয়ন। শিখন শেখানোর মান উন্নীত হলে বেশি পরিমাণে শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জিত হবে তথা শিক্ষার গুণগত মান বাড়বে। একজন শিক্ষক কেন পাঠ সমীক্ষায় অংশ নেবেন তা নিচের চারটি পয়েন্টে আলোচনা করা হল।

১। শিখন শেখানো কার্যক্রমের উন্নয়ন (Teaching Improvement)

পাঠ সমীক্ষা শিক্ষকদের শিখন শেখানো কার্যক্রম উন্নয়নের একটি আদর্শ কৌশল। শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য আয়োজিত বিভিন্ন ওয়ার্কশপ বা প্রশিক্ষণে শিখন শেখানো কৌশল সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে একজন শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষের কোন সুনির্দিষ্ট কাজ দেখে তার সম্পর্কে ফিডব্যাক দেওয়ার সুযোগ নেই। তাই ওয়ার্কশপ বা প্রশিক্ষণে শিক্ষকেরা অনেক বিষয়ে ধারণা পেলেও তা হয়তো তাদের শ্রেণিকক্ষে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারে না। কিন্তু পাঠ সমীক্ষায় সরাসরি একজন শিক্ষকের সুনির্দিষ্ট শ্রেণি কার্যক্রমের ওপর দৃষ্টিপাত করা হয়। এর ফলে একজন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীরা কীভাবে শেখে এবং কোন শিখন শেখানো কৌশল শিক্ষার্থীদের শিখনের জন্য বেশি উপযোগী তা বোঝার সুযোগ পায়। কোনো শিখন-শেখানো কৌশল প্রয়োগে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে তা ও একজন শিক্ষক নিজে অনুশীলন বা চর্চার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারেন।

২। নির্দেশনা/শিক্ষা উপকরণ (instructional material)

পাঠ সমীক্ষার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে যাচাইকৃত পাঠ এবং পাঠ উপকরণ পাওয়া যায়, যা অন্যান্য শিক্ষকেরা তাদের শিখন শেখানো কার্যে ব্যবহার করতে পারেন। একটি নিয়মতান্ত্রিক ও প্রমাণভিত্তিক পদ্ধতি হওয়ার কারণে একজন শিক্ষকের পাঠ সমীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত ফলের ওপর ভিত্তি করে অন্য শিক্ষকেরাও তাদের শিখন শেখানো কার্যক্রম নিয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন। এভাবে একটি পাঠ সমীক্ষা শেষে

একটি পাঠ-সমীক্ষা দল সহযোগিতার মাধ্যমে নির্দেশনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কীভাবে শেখে তা সম্পর্কে জ্ঞান সৃজন করেন।

৩। পেশাগত শিখন দল (Teaching Community)

শিক্ষকেরা পাঠ সমীক্ষায় অংশ নেয়ার অভিজ্ঞতাকে আনন্দদায়ক মনে করেন। তাই পাঠ সমীক্ষা প্রক্রিয়া, শিখন শেখানো কার্যক্রম অনুশীলনকে কেন্দ্র করে একটি পেশাগত শিখন দল গড়ে তুলতে সাহায্য করে। পাঠ সমীক্ষার মাধ্যমে দলের প্রত্যেক সদস্য শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শিখন-শেখানো কার্যাবলি এবং শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি সাধারণ উপলব্ধি গঠিত হয়।

৪। পান্ডিত্যপূর্ণ অনুসন্ধান (Scholarly Inquiry)

পাঠ সমীক্ষা শিক্ষণ ও শিখন সম্পর্কে অধ্যয়নের একটি উপায়। এর মাধ্যমে শিক্ষকগণ শিক্ষণ ও শিখন সম্পর্কে গবেষণালব্ধ গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। পাঠ সমীক্ষায় প্রাপ্ত এ জ্ঞানকে পেশাগত সম্মেলনে উপস্থাপনা বা পেশাগত জার্নালে প্রকাশনার জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। পাঠ সমীক্ষা শিক্ষণ ও গবেষণা এবং তত্ত্ব ও অনুশীলনের মধ্যে সমন্বয় ঘটায়।

**পাঠ সমীক্ষা প্রক্রিয়া**

শিক্ষকের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পাঠসমীক্ষা কার্যক্রম একটি কার্যকরী কৌশল। এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাধারণত তিন থেকে ছয়জন সদস্যের (শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, বহিরাগত বিশেষজ্ঞ) সমন্বয়ে একটি দলগঠন করা হয়ে থাকে। ডিপিএড কার্যক্রমের ক্ষেত্রে গাইড ইনস্ট্রাক্টর, প্রধান শিক্ষক, শ্রেণিশিক্ষক এবং দুইজন প্রশিক্ষণার্থী- এ পাঁচজন শিক্ষককে নিয়ে একটি দলগঠন করা হয়ে থাকে। পাঠ সমীক্ষা মূলত তিনটি পর্যায়ে হয়ে থাকে; পর্যায় তিনটি হলো - পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং প্রতিফলন (Plan-Do-See)।। প্রতিটি পর্যায়ে যে কাজগুলো করতে হয়, তা পরবর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হল।

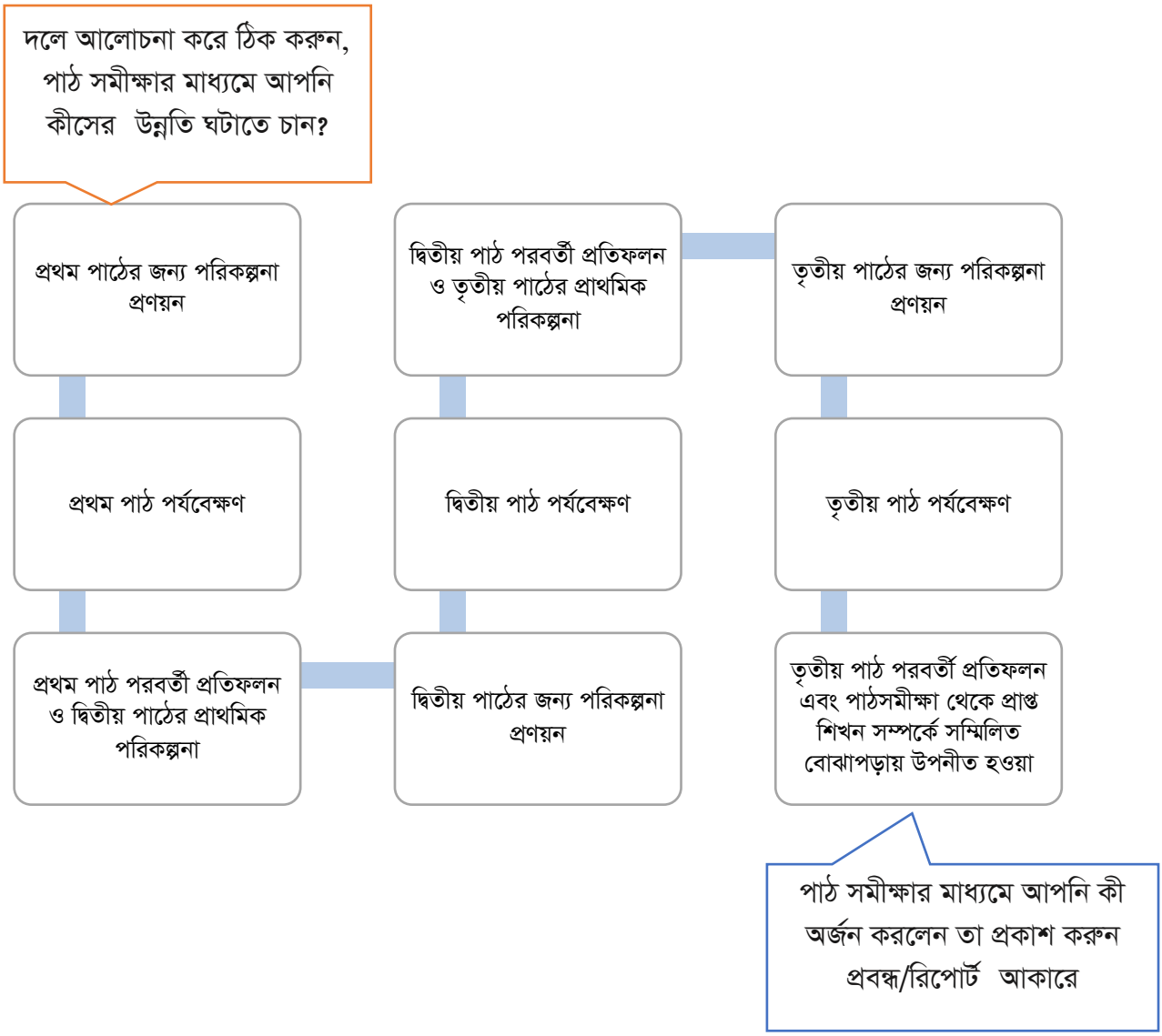


চিত্র ৪.৪: পাঠ সমীক্ষার বিভিন্ন স্তর

**পর্যায় ১: পরিকল্পনা প্রণয়ন**

পাঠ সমীক্ষার প্রথম ধাপ পরিকল্পনা প্রণয়ন। দলের সদস্যরা প্রথমেই পাঠ সমীক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন। তারপর বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ও ক্লাশ রুটিনের সাথে সমন্বয় করে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। কর্ম পরিকল্পনায় পাঠ বাস্তবায়নের তারিখ, শ্রেণি, বিষয় ও আলোচনা সভাসমূহের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হবে। পাঠটি সপ্তাহের শেষ কর্মদিবসের শেষ পিরিয়ডে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে দলের সদস্যরা একটি আলোচনা সভার আয়োজন করবে। এ সভায় ঠিক করতে হবে শিক্ষকের কোন শিক্ষণ-দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এছাড়াও পাঠের শিখনফল, বিষয়বস্তু এবং পাঠ বাস্তবায়নের পদ্ধতি, নির্ধারণ করা হবে। পাঠে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক, মনোপেশীজ, আবেগিক সকল

ধরণের শিখন অর্জন নিশ্চিত করার দিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। দলের সকলে বিষয়বস্তুর ধারণা ও বিস্তৃতি, শিক্ষার্থীদের পাঠে সম্পৃক্তকরণের কৌশল ও এর প্রেক্ষিতে তাদের আচরণ, শিক্ষার্থীদের চিন্তার বিকাশ, শিখনের ধরন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবে। সভায় আলোচিত বিষয়সমূহ যেকোন একজন সদস্য (পূর্ব নির্ধারিত) লিপিবদ্ধ করবে। এ আলোচনার ভিত্তিতে পাঠ বাস্তবায়নকারী শিক্ষক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি করবে। এ সভাটি দুই সপ্তাহ আগে করা যেতে পারে।

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের পর আরেকটি সভায় দলের সদস্যদের সাথে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা ও প্রয়োজনে পাঠ সিমুলেশন করা যেতে পারে। এ সভায় দলের সদস্যরা পাঠ পরিকল্পনার যেসব ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করবেন সেগুলো হল:

- পরিষ্কার, সুনির্দিষ্ট ও অর্জনযোগ্য শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে কিনা।
- শিক্ষক শিখনফল অর্জনের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট শিখন শেখানো পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে কিনা
- শিক্ষক পাঠের সাথে সংশ্লিষ্ট সর্বোৎকৃষ্ট টিচিং এইড নির্বাচন করেছে কিনা।
- শিখন শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে কিনা।
- কাঙ্ক্ষিত শিখনফল অর্জনের জন্য যথাযথ পাঠ পরিকল্পনা করা হয়েছে কিনা।

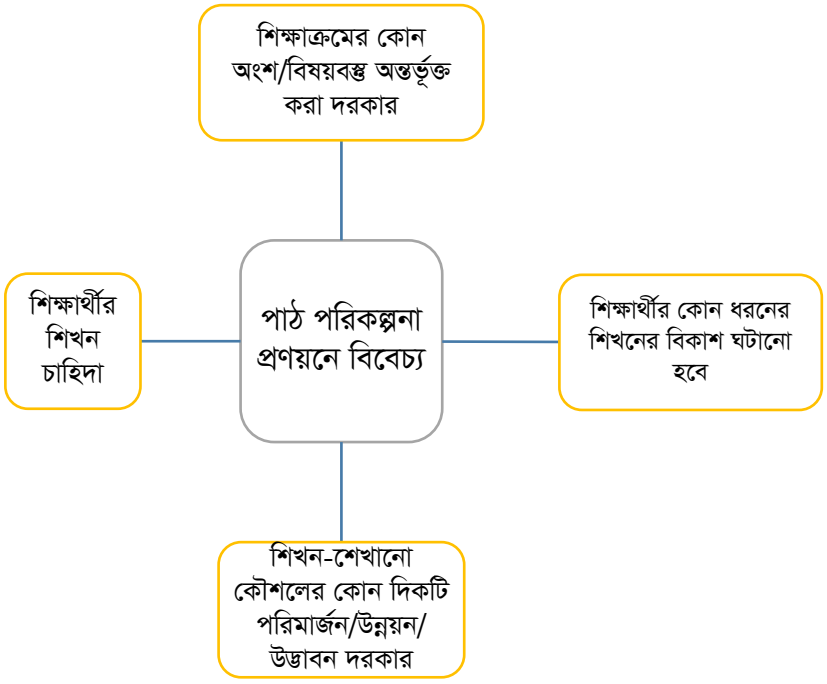


চিত্র ৪.৫: পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়াদি

অতঃপর দলের সদস্যদের সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পাঠ পরিকল্পনা পরিমার্জন করবেন। এ পর্যায়ের কাজ পাঠ বাস্তবায়নের এক সপ্তাহ আগে করা যেতে পারে।

**পর্যায়-২: পাঠ বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ**

পাঠ বাস্তবায়নকারী শিক্ষক এ পর্যায়ে শ্রেণিতে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। দলের সকল সদস্য এ সময় পাঠ পর্যবেক্ষণ (পর্যবেক্ষণ ছক অনুযায়ী) করবেন। দলের বাইরে অন্য সহকর্মীরাও চাইলে/প্রয়োজনে পাঠ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। প্রধান শিক্ষক পাঠ পর্যবেক্ষণকারী শিক্ষকদের রুটিনের নির্ধারিত ক্লাসের পাঠ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন। উক্ত পাঠটি যে পর্যবেক্ষণ করা হবে, এ তথ্যটি

আগের দিন শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখলে ভালো হয়। ক্লাসের শুরুতে পর্যবেক্ষকদের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে পাঠ শুরু করা যেতে পারে।

শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হবে পাঠ বাস্তবায়নকারী শিক্ষকের পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী। পাঠ পর্যবেক্ষণের সময় প্রত্যেক পর্যবেক্ষণকারী শিক্ষকের নিকট উক্ত পাঠ পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ ছক থাকা বাঞ্ছনীয়। পাঠ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষক কী কী করছেন তা নয়, বরং শিক্ষকের কার্যক্রম কীভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠে সম্পৃক্ত করছে এবং তাদের শিখনে সহায়তা করছে সেটিই মুখ্য বিষয়। শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও প্রতিক্রিয়া থেকে তাদের শিখন কতটুকু অর্জিত হল তা নির্ণয়ের মাধ্যমে পাঠ পর্যবেক্ষণকালে ঐ শিক্ষকের শিখন শেখানো কাজের ওপর প্রতিফলন করা হয়ে থাকে।

**পাঠ পর্যবেক্ষণকালে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ**

পাঠ পর্যবেক্ষণের জন্য পুর্বেই সকলের সম্মতিক্রমে পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। ডিপিএড কার্যক্রমে, পাঠ পর্যবেক্ষণের জন্য নির্ধারিত পর্যবেক্ষণ ছক ও রুব্রিক ব্যবহার করা হয়।

**পর্যায় ৩: প্রতিফলন**

পাঠ পরিচালনা শেষে, অল্পসময়ের ব্যবধানে পাঠ পরিচালনাকারী শিক্ষক ও পর্যবেক্ষকগণের সমন্বয়ে একটি debriefing সভার আয়োজন করা হয় যেখানে উক্ত পাঠ নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়। এ আলোচনা বাস্তবায়নকৃত শ্রেণিকক্ষে হওয়া বাঞ্ছনীয় কারণ এতে বোর্ডের ব্যবহারসহ পুরো শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনা সহজতর ও কার্যকর হতে পারে। পাঠ বাস্তবায়নোত্তর এ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হবে পাঠটিকে ভবিষ্যতে আরো ফলপ্রসূভাবে উপস্থাপন করা, বাস্তবায়নকারী শিক্ষকের সমালোচনা নয়। পাঠ পরিচালনাকারী শিক্ষকের দুর্বলতাগুলোকে সবল করার উপায় বের করা এ আলোচনার ফোকাস হবে। প্রকৃতপক্ষে এ আলোচনা অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষকের পেশাগত শিখনের মাধ্যম। অর্থাৎ এ আলোচনাটিকে সকল সদস্যের সম্মিলিত শিখনের সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে যার মাধ্যমে প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে শিখন শেখানো কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সম্মিলিত সাধারণ বোঝাপড়া বা common understanding তৈরি হবে।

প্রতিফলনমূলক এ আলোচনায় সকল অংশগ্রহণকারী শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন, চিন্তন ও পাঠে সম্পৃক্ততা/অংশগ্রহণের আলোকে পাঠ সম্পর্কে তাদের পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও মন্তব্য ব্যক্ত করেন। পাঠের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন হতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সংশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠটিকে আরো ফলপ্রসূ করে তোলার উপায় বের করা হয় এবং পাঠটি পরিমার্জন করা হয়।

মানসম্মত ফল পেতে পাঠ সমীক্ষার তিনটি শিক্ষণচক্র সম্পন্ন করা হয়। প্রয়োজনে সমীক্ষাদল পাঠ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রসমূহ পরিবর্তন করে থাকেন।

**আলোচনার বিষয়সমূহ**

পাঠ বিষয়ক আলোচনা মূলত তিনটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে:

- শিক্ষার্থীরা কীভাবে পাঠের উদ্দেশ্য অর্জন করেছে?
- পাঠটি কীভাবে আরো সমৃদ্ধ করা যায়?
- এ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কী শিখলাম?

সবশেষে, উক্ত পাঠটি বিদ্যালয়ের বাইরে অন্য শিক্ষকদের ব্যবহার, পেশাগত সম্মেলনে উপস্থাপনা বা পেশাগত জার্নালে প্রকাশনার জন্য প্রস্তুত করতে যেতে পারে।

## কর্মসহায়ক গবেষণা

একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হন। এসব সমস্যার কোনোটি শিক্ষার্থীদের শিখন-সংক্রান্ত, কোনোটি শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত কিংবা কোনোটি হয়ত নিজের পাঠদানের সাথে সম্পর্কিত। এছাড়াও একজন শিক্ষক প্রতিদিনই বা প্রায়ই বিদ্যালয়ে কিছু না কিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সমস্যাগুলো হতে পারে এরকম–

- শিক্ষক প্রতিদিন যেভাবে পাঠ পরিচালনা করছেন তাতে শিক্ষার্থীরা ঠিকমত সাড়া দিচ্ছে না।
- ক্লাস চলাকালীন একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিতে সবসময়ই হইচই বাবিশৃঙ্খলাহয়যা সহজে নিয়ন্ত্রণ করাযায় না।
- বিদ্যালয়ে দিনদিন শিক্ষার্থী সংখ্যা কমে যাচ্ছে।
- শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী সবসময়ই পিছনে বসে এবং সবসময়ই চুপচাপ থাকে। তার পরীক্ষার ফলাফলও খারাপ।

কার্যকর শিখন শেখানো নিশ্চিত করার জন্য একজন শিক্ষককে এসব সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন। শিক্ষক যদি এ-ধরনের সমস্যার সমাধান না করেন তাহলে তাঁর দ্বারা ভালোভাবে পাঠদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন নাও হতে পারে। এছাড়া সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি একজন শিক্ষক হিসেবে নিজেকে কীভাবে আরও যোগ্য ও দক্ষ করে তোলা যায় অর্থাৎ নিজের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়নের তথা শিক্ষক মানগুলো অর্জন করাযায় সেটি নিয়েও শিক্ষককে ভাবতে হয়। কিন্তু যথেষ্ট দক্ষ না হলে কেবল নিজস্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে অনেক সমস্যার সমাধান করা যায় না। যদিও এসব সমস্যার কিছু কিছু শিক্ষকরা নিজে নিজেই সমাধান করে থাকেন কিন্তু কিছু সমস্যা আছে যা একার পক্ষে সম্ভব হয় না বা কীভাবে এ সমস্যা থেকে বের হয়ে আসতে হবে তা বুঝে উঠতে পারেন না। এক্ষেত্রে শিক্ষকের গবেষণার দক্ষতার প্রয়োজন হয়। এ-ধরনের সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য যে উপায় বা পদ্ধতিটি শিক্ষককে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করতে পারে তা হল কর্মসহায়ক গবেষণা (Action Research)|

কর্মসহায়ক গবেষণা সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে 'গবেষণা' কী তা জানা দরকার। 'গবেষণা' শব্দটির বাংলা সমার্থক 'সযত্ন অনুসন্ধান'। এর ইংরেজি হল Research যার প্রতিশব্দ হিসেবে 'investigation', 'enquiry', 'study'ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে গবেষণা হলো, কোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য পদ্ধতিগত উপায়ে নিবিড়/গভীর অনুসন্ধান। প্ল্যানো ক্লার্ক এবং ক্রেসওয়েল (২০১০)-এর মতে, ' Research is a process of steps used to collect and analyse information in order to increase our understanding of a topic or issue' অর্থাৎ 'গবেষণা হলো একটি প্রক্রিয়া যেখানে বিভিন্ন ধাপে কোনো বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্য ওই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়'।

গবেষণা প্রক্রিয়ায় তিনটি ধাপ জড়িত– প্রথমত, অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন উত্থাপন বা সমস্যা চিহ্নিত করা; দ্বিতীয়ত, প্রশ্নের উত্তর লাভ বা সত্য উদঘাটনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা এবং তৃতীয়ত, প্রশ্নোত্তর বা উদঘাটিত সত্য প্রতিবেদনের মাধ্যমে উপস্থাপন করা (Creswell, 2008)। গবেষণা প্রক্রিয়াটি নিয়মতান্ত্রিক বা পদ্ধতিগত; এটি এলোমেলো বা অনিয়মিত কোনো প্রক্রিয়া নয়। অন্যদিকে গবেষণার পরিসর ছোট বা বড় দুই-ই হতে পারে। যখন কোনো শিক্ষা বিষয়ক সমস্যা বা বিষয়বস্তু নিয়ে পদ্ধতিগত ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে

অনুসন্ধান করা হয় তখন তা হয় শিক্ষা গবেষণা। শিক্ষা গবেষণার লক্ষ্য হলো শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিষয়ে (যেমন– শিক্ষণ, শিখন, শিক্ষাক্রম, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন, পেশাগত দক্ষতা, পাঠ্য বই ইত্যাদি) অজানা সত্য উদ্ঘাটন, নীতি বা তত্ত্বের বিকাশ, সংশোধন বা উন্নয়নে অবদান রাখা। যে সকল গবেষণা থেকে শিক্ষাবিষয়ক কোনো নতুন তত্ত্ব বিকাশ লাভ করে, তা মৌলিক গবেষণা (basic research) নামে পরিচিত। আর যেসব গবেষণায় কোনো তত্ত্ব বা নীতি পরীক্ষা করা হয়, সংশোধন বা পরিবর্তন করা হয়, তা হলো ব্যবহারিক গবেষণা (applied research)। যেমন, জ্যাঁ পিয়াজের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সম্পর্কিত তত্ত্ব মৌলিক গবেষণার ফল; আবার শ্রেণিকক্ষে এর ব্যবহারযোগ্যতা পরীক্ষা করা ব্যবহারিক গবেষণার কাজ।

শিক্ষা গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার মান উন্নয়ন করা বা এর সাথে সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করা। যেমন– গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতির (teaching method) পরিবর্তন করে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি প্রবর্তন করা; মুখস্থনির্ভর প্রশ্নপত্রের মান উন্নয়ন করে উচ্চতর চিন্তা সহায়ক (যেমন– সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করা) প্রশ্ন ব্যবহার করা। শ্রেণিকক্ষের দৈনন্দিন শিখন শেখানো সমস্যা সমাধান বা উন্নয়ন শিক্ষার্থীদের শিখনের মান উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
গতানুগতিক গবেষণা শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থীর সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান বা পেশাগত উন্নয়নের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নাও হতে পারে। কারণ গতানুগতিক গবেষণা সমস্যার সমাধান দেয় না; শুধু সমস্যা বা বিষয় সম্পর্কে তথ্য দেয় অথবা সমস্যার কারণ জানায়। গবেষণাকে বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত করার জন্য, শ্রেণিকক্ষের সমস্যা শনাক্ত করে তা সমাধানের পথ নির্দেশনার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মসহায়ক গবেষণা ধারার (Action Research Paradigm) সূচনা হয় (বেগম, জিন্নাহ এবং আলম, ২০০২)। বেগম ও অন্যান্য (২০০২) বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধের বরাত দিয়ে বলেছেন, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়ার (teaching-learning interaction) মানোন্নয়নে কর্মসহায়ক গবেষণা কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। গত কয়েক দশক ধরে উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় প্রকার সমাজেই শিক্ষা সমস্যা সমাধানে কর্মসহায়ক গবেষণা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে স্টুয়ার্ট (১৯৯৪) বেশ জোরের সাথে বলেছেন, কর্মসহায়ক গবেষণা উন্নয়নশীল দেশের বিদ্যালয় শিক্ষার মান নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকর উপায়।

আমাদের দেশের শ্রেণিকক্ষের শিখন শেখানোর মানোন্নয়নের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণার প্রয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে শ্রেণিশিক্ষক এবং প্রশিক্ষকসহ সকলকে এই গবেষণার সাথে পরিচিত করানো এবং এটি প্রয়োগের দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করাই এ অধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য। এই অধ্যায়ে কর্মসহায়ক গবেষণার ধারণা, বৈশিষ্ট্যসহ এটি বাস্তবে, বিশেষ করে শ্রেণিকক্ষে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করা হয়েছে।

**কর্মসহায়ক গবেষণার পটভূমি**

বিভিন্ন দলিলপত্র বা লিটারেচার থেকে কর্মসহায়ক গবেষণার উৎপত্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো সময়কাল বের করা যায় না[২]। কেমিস ও ম্যাকটাগার্ট (১৯৮৮), জুবের-স্কেরিট (১৯৯২), হোল্টার ও শোয়ার্টজ-বারকট (১৯৯৩)-এর মতে, কার্ট লিউইন নামক একজন মার্কিন মনোবিদ প্রথম কর্মসহায়ক গবেষণার ধারণা প্রদান করেন। তবে ম্যাকারন্যান (১৯৯১)-এর মতে, কার্ট লিউইনেরও পূর্বে বেশ কয়েকজন সমাজ-সংস্কারকের কর্মসহায়ক গবেষণার ব্যবহারের প্রমাণ রয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১৯৪৫ সালে কলিয়ের, ১৯৪৬ সালে লিপিটিক

[২] *Janet Masters* 1995

ও র‍্যাডকে এবং ১৯৫৩ সালে কোরি-এর কাজ উল্লেখযোগ্য। তবে কর্মসহায়ক গবেষণার ধারণা পূর্ব থেকে প্রচলিত থাকলেও ১৯৪০-এর মধ্যভাগে এর কাঠামোগত রূপ প্রদান করেন এবং ১৯৫৩ সালে স্টিভেন কোরি তাঁর Action Research to Improve School Practices প্রকাশনার মধ্যদিয়ে শিক্ষায় প্রথম পদ্ধতিগতভাবে কর্মসহায়ক গবেষণার ধারা সূচনা করেন (ম্যাকনিফ, ১৯৯৫)। কোরি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে প্রথমবারের মতো শিক্ষকদের নিয়ে কাজ করেন।

**কর্মসহায়ক গবেষণা কী?**

'কর্মসহায়ক গবেষণা'– এ শব্দ দুটি থেকেই এর অর্থ উপলব্ধি করা সম্ভব। কর্মসহায়ক শব্দটি বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি, যা কাজের সহায়ক বা যা থেকে কার্য সম্পাদনের নির্দেশনা পাওয়া যায়। সুতরাং, যে গবেষণা কর্মসম্পাদনে বা উন্নয়নে সহায়তা করে, তাকে কর্মসহায়ক গবেষণা বলা যায়।

কর্মসহায়ক গবেষণাকে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে চিহ্নিত করেছেন। যেমন, এই ধরনের গবেষণাকে হপকিন্স (১৯৮৫) বলেছেন 'শ্রেণিকক্ষ গবেষণা'; কেমিস (১৯৮২) চিহ্নিত করেছেন 'আত্ম-প্রতিফলনমূলক অনুসন্ধান' হিসেবে; কার ও কেমিস (১৯৮৬)-এর মতে 'শিক্ষায় কর্মসহায়ক গবেষণা'; অলরাইট ও বেইলি (১৯৯১)-এর মতে, 'বর্ণনামূলক শিক্ষণ ও শিখন' ইত্যাদি। এছাড়াও অনেকে কর্মসহায়ক গবেষণাকে 'পেশাগত অনুসন্ধান', 'প্রতিফলনমূলক বিশ্লেষণ' বা 'প্রমাণভিত্তিক চর্চা' হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। তবে যেভাবেই বলা হোক না কেন, কর্মসহায়ক গবেষণায় শিক্ষকের চর্চা ও প্রতিফলনের সমন্বয় করা হয় এবং তাতে শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষাবিদগণ কর্মসহায়ক গবেষণাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। কোরে (১৯৬২) এবং গুডনাফ (২০১১)এর ভাষায় কর্মসহায়ক গবেষণার ধারণা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা হলো–action research is the 'process by which practitioners attempt to study their problems scientifically in order to guide, correct, and evaluate their decisions and actions.'

ফারেন এবং রায়ান (২০০৪) আরো সহজ করে বলেছেন,'Action research is a form of research in which practitioners reflect systematically on their practice, implementing informed action to bring about improvement in practice.'

বিভিন্ন শিক্ষাবিদের প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসরণ করে বলা যায়, কর্মসহায়ক গবেষণা এমন একটি পদ্ধতিগত অনুসন্ধান প্রক্রিয়া, যা দ্বারা পেশাদার ব্যক্তি তাদের নিজ কর্ম, অবস্থা বা সমস্যা চিহ্নিত করে তা উন্নয়ন বা সমাধানে সচেষ্ট হন; নিজ উদ্যোগে পদ্ধতিগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভাব্য সমাধান বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তন আনা বা উন্নতি সাধন এই গবেষণার একটি অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়া। এলিয়ট এবং এডামসের ভাষায়, শ্রেণিশিক্ষক প্রতিদিন যে বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হন তার সমাধানে এই গবেষণা সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

**কর্মসহায়ক গবেষণা কে করবে? কার জন্য করবে?**

গতানুগতিক গবেষণা থেকে পৃথক বলে এমন প্রশ্ন বাঞ্ছনীয় যে, কর্মসহায়ক গবেষণা কে পরিচালনা করবেন এবং কার জন্য তা পরিচালিত হবে? এই গবেষণা শ্রেণিকক্ষের শিক্ষক থেকে শুরু করে পরিকল্পনাবিদ, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকসহ যেকোনো পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি নিজ অবস্থা উন্নয়নে নিজে গবেষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন বা অন্যান্য বিশেষজ্ঞ গবেষকের সাথে সম্মিলিতভাবে গবেষণা পরিচালনা করতে পারেন। এখানে উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, গতানুগতিক গবেষণায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী বহিরাগত বিশেষজ্ঞ গবেষকের তথ্যদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়; অপরদিকে কর্মসহায়ক গবেষণায় শিক্ষক নিজে গবেষকের ভূমিকা পালন করেন।

শিক্ষক এককভাবে এই গবেষণা করতে পারেন। আবার একাধিক শিক্ষক সহযোগিতার ভিত্তিতে সমষ্টিগতভাবে এ গবেষণা কাজ করতে পারেন। আরেকটি ধারা হলো, শিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞ গবেষক সম্মিলিতভাবে শিক্ষা সমস্যার সমাধানে কর্মসহায়ক গবেষণা করতে পারেন।

তবে এ-ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রে শিক্ষকের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক যদি মনে করেন সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণার প্রয়োজনই নেই, তাহলে যান্ত্রিকভাবে বা জোর করে কর্মসহায়ক গবেষণা করলেও কাঙ্ক্ষিত ফললাভ সম্ভব হবে না। অন্যদিকে, কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষকের গবেষণার দক্ষতা বাড়ানো যে মূল উদ্দেশ্য নয় তাও শিক্ষকের উপলব্ধি করা প্রয়োজন। শিক্ষককে সবসময়ই মনে রাখতে হবে, এই ধরনের গবেষণার মাধ্যমে একদিকে যেমন শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সম্ভব, তেমনি একইসাথে কর্মসহায়ক গবেষণা শিক্ষকের দক্ষতাবৃদ্ধিতে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। সুতরাং শিক্ষক যদি প্রতিনিয়ত তাঁর সমস্যার সমাধান পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমাধান করতে আগ্রহী হন, সেক্ষেত্রে কর্মসহায়ক গবেষণা একটি সহায়তাকারী পদ্ধতি হিসেবে কাজ করবে। নিচের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষকের অভিজ্ঞতা ও কাজের সাথে তথ্য ও প্রতিফলন যুক্ত হয়ে প্রতিনিয়তই তাঁর নিজের শিখনকে উন্নত করছে (Pelton, 2010)।

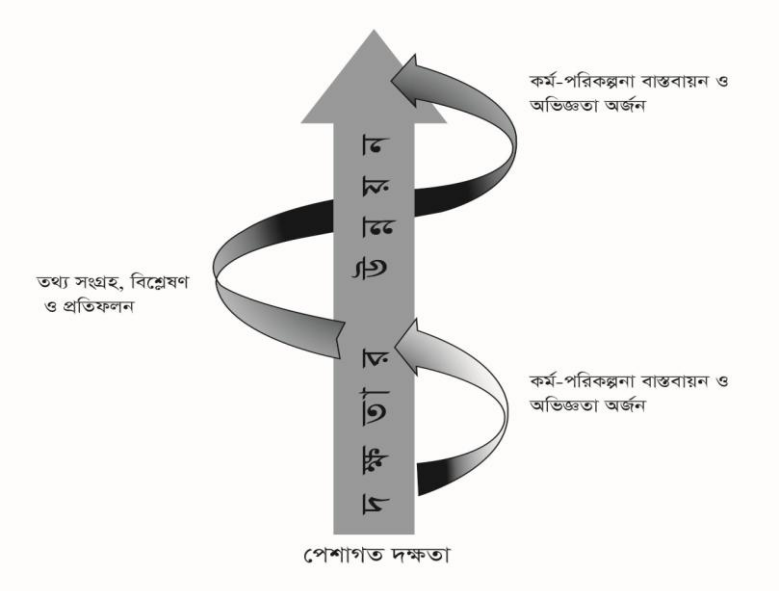


চিত্র ৪.৬: কর্মসহায়ক গবেষণা যেভাবে শিক্ষকের দক্ষতাবৃদ্ধিতে সহায়তা করে

**কর্মসহায়ক গবেষণার উদ্দেশ্য**

কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে দুই ধরনের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। প্রথমত, কোন ঘটনা, বিষয় বা পরিস্থিতিকে বিস্তারিতভাবে জানা ও বোঝা এবং দ্বিতীয়ত, উপযুক্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানো বা সমস্যার সমাধান করা। প্রচলিত গবেষণার ন্যায় কর্মসহায়ক গবেষণার উদ্দেশ্য শুধু নতুন জ্ঞানার্জন নয়, বরং উন্নয়নের পথ নির্দেশক হিসেবে এর ব্যবহার নিশ্চিত করা। কর্মসহায়ক গবেষণার উদ্দেশ্য হলো তত্ত্ব (theory)ও চর্চার (practice)সমন্বয় সাধন।

শিক্ষায় কর্মসহায়ক গবেষণার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো, শ্রেণিশিক্ষককে গবেষকের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা করা, যাতে সহকর্মীদের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিজ পেশার ক্রমাগতভাবে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। একজন শিক্ষক তখনই তার শিক্ষার্থীর শিখন মান নিশ্চিত করতে পারেন যখন তিনি একজন গবেষক এবং প্রতিনিয়ত নিজ কার্যের মূল্যায়ন করেন।

**কর্মসহায়ক গবেষণার বৈশিষ্ট্য**

গবেষণার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি কর্মসহায়ক গবেষণার বেশ কিছু ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা এর ভূমিকাকে সুস্পষ্টভাবে সমাধানমুখী ও উপকারী করে তোলে। বেগম ও অন্যান্য (২০০২) কর্মসহায়ক গবেষণার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করেছেন।

K. এই জাতীয় অনুসন্ধানের মাধ্যমে কমপক্ষে তিন ধরনের প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। যেমন– সমস্যা কী ধরনের, সম্ভাব্য কারণ কী, কীভাবে সমস্যার সমাধান সম্ভব। অর্থাৎ সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান উভয়ই এই গবেষণার লক্ষ্য।

L. কর্মসহায়ক গবেষণা অংশগ্রহণভিত্তিক (participatory)| অর্থাৎ গবেষণা বাস্তবায়ন বা প্রয়োগে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সকলেই (শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ব্যবস্থাপক) অংশগ্রহণ করেন।

M. শিক্ষাক্ষেত্রে এটিই একমাত্র গবেষণা যেখানে শিক্ষক নিজেই গবেষকের ভূমিকায় কাজ করেন আর বহিরাগত বিশেষজ্ঞ গবেষক সহায়কের (facilitator) ভূমিকা পালন করেন। তিনি শিক্ষকের ওপর তার মত বা পরিকল্পনা চাপিয়ে দেন না।

N. এটি সহযোগিতামূলক (collaborative)। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ গবেষক, শিক্ষক এবং সহকর্মী যৌথভাবে কাজ করেন। পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে অনুসন্ধান ও সমাধান প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যান।

O. এর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো পরিস্থিতিকেন্দ্রিক বা প্রেক্ষাপটকেন্দ্রিক (situaitonal)। অর্থাৎ স্থানীয় পরিবেশে সমস্যা চিহ্নিত করা এবং উক্ত পরিবেশেই সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী লব্ধ সম্পদ ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করা।

P. তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে একাধিক পদ্ধতির (যেমন– পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, নোট, ভিডিও বা অডিও) সমন্বয় সাধন করা হয়।

Q. নমনীয়তা (flexibility)এ গবেষণার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গবেষণার বিভিন্ন ধাপে উদ্ভূত অবস্থা অনুযায়ী পরিকল্পনা বা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা যায়। কোনো বিষয়ে অনড় (rigid) থাকার অবকাশ নেই।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায়, কর্মসহায়ক গবেষণা হলো পরিবর্তন এবং মানোন্নয়নের গবেষণা। কাজেই আমাদের দেশের শিক্ষা প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে শ্রেণি শিখন শেখানো কার্যাবলি ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়ার (teacher-student interactions) মানোন্নয়নের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণা একটি কার্যকর উপায় হতে পারে।

**কর্মসহায়ক গবেষণার সাথে অন্যান্য গবেষণার পার্থক্য**

কর্মসহায়ক গবেষণার কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য অন্যান্য গবেষণার মতো মনে হলেও এ গবেষণার বেশ কিছু ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কর্মসহায়ক গবেষণা গভীরভাবে সমস্যা-সমাধানমুখী এবং এটি সহজে প্রয়োগ করা যায়। কর্মসহায়ক গবেষণা অন্যান্য গবেষণা কীভাবে স্বতন্ত্র তা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো (বেগম ও অন্যান্য, ২০০২) অনুধাবন করা যায়:

K. কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে কমপক্ষে তিন ধরনের প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। যেমন– সমস্যা কী ধরনের, সম্ভাব্য কারণ কী, কীভাবে সমস্যার সমাধান সম্ভব। অর্থাৎ সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান উভয়ই এই গবেষণার লক্ষ্য। পক্ষান্তরে, শুধু সমস্যার ধরন অথবা সমস্যার কারণ অনুসন্ধানের জন্যই একেকটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে, যেখানে সমস্যার সমাধান মুখ্য বিষয় বলে গণ্য নাও হতে পারে। সমস্যার সমাধান বের করার জন্য হয়তো আরেকটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণারপ্রয়োজনীয়তা থাকে। একমাত্র কর্মসহায়ক গবেষণায়*একত্রে*সমস্যার ধরন, সমস্যার কারণ ও সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে।

L. কর্মসহায়ক গবেষণাকার্যটি *ভুক্তভোগী কর্তৃক অংশগ্রহণমূলকভাবে* সম্পাদিত। অর্থাৎ কোনো প্রতিষ্ঠানে (বিদ্যালয়/ শ্রেণিকক্ষ) সৃষ্ট সমস্যার অংশীজন (stakeholder)যারা, তাঁদের সকলের (শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ব্যবস্থাপক) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। অন্যান্য গবেষণায় অংশগ্রহণকারীগণ নিজেরা সরাসরি গবেষণার বিষয় সংশ্লিষ্ট সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত নাও থাকতে পারেন।

M. শিক্ষাক্ষেত্রে এটিই একমাত্র গবেষণা যেখানে শিক্ষক নিজেই গবেষকের ভূমিকায় কাজ করেন আর বহিরাগত বিশেষজ্ঞ গবেষক সহায়কের (facilitator)ভূমিকা পালন করেন। তিনি শিক্ষকের ওপর তার মত বা পরিকল্পনা চাপিয়ে দেন না। অন্যান্য গবেষণার সাধারণ চিত্রটি ঠিক এর বিপরীত হয়ে থাকে।

N. এর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো পরিস্থিতিকেন্দ্রিক বা প্রেক্ষাপটকেন্দ্রিক (situational)। অর্থাৎ স্থানীয় পরিবেশে সমস্যা চিহ্নিত করা এবং উক্ত পরিবেশেই সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী লব্ধ সম্পদ ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করা। অন্যান্য গবেষণা কর্মসহায়ক গবেষণার মতো এতটা পরিস্থিতিকেন্দ্রিক বা প্রেক্ষাপটকেন্দ্রিক নয়।

O. তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে একাধিক পদ্ধতির (যেমন– পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, নোট, ভিডিও বা অডিও) সমন্বয় সাধন করা হয়। অন্যান্য গবেষণায়ও তথ্য সংগ্রহে একাধিক পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়, তবে এক্ষেত্রে কথা হলো কর্মসহায়ক গবেষণা অনেক বেশি নমনীয়। গবেষণার বিভিন্ন ধাপে উদ্ভূত অবস্থা অনুযায়ী পরিকল্পনা বা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা যায়। কোনো বিষয়ে অনড় (rigid) থাকার অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে অন্যান্য গবেষণায় পরিকল্পনা বা পদ্ধতিতে বেশ কঠোরতা পরিলক্ষিত হয়।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বলা যায়, আমাদের দেশের শিক্ষা প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে শ্রেণি শিখন শেখানো কার্যাবলি ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়ার (teacher-student interactions) মানোন্নয়নের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণা একটি কার্যকর উপায় হতে পারে।

**কর্মসহায়ক গবেষণার গুরুত্ব**

শ্রেণিশিক্ষকের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণা কেন গুরুত্বপূর্ণ? কীভাবেই বা এই গবেষণা শ্রেণিশিক্ষককে সহায়তা করতে পারে? অন্য কথায়, একজন শ্রেণিশিক্ষক কেন কর্মসহায়ক গবেষণা করবেন?

কার্যকর শিখনের জন্য একজন শিক্ষককে তাঁর পেশাগত কাজের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হওয়া প্রয়োজন। হপকিনস (১৯৮৫)-এর মতে, একজন শিক্ষক তার শ্রেণি কার্যাবলি পরিচালনার জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল হতে পারেন না। শিক্ষার্থীর শিখন ত্বরান্বিত করার জন্য তাঁর স্বাধীনভাবে কাজ করার সামর্থ্য থাকা প্রয়োজন। সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি সক্ষম হবেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে তিনি শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিকল্পনা করতে পারবেন, পরিবর্তন করতে পারবেন, বিভিন্ন শিক্ষণ কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন। কিন্তু এর জন্য শিক্ষকের যেমন বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তেমনি বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগে আত্মবিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। আবার বিভিন্ন কৌশল ব্যবহারের দক্ষতা থাকার পাশাপাশি তা ব্যবহারের দৃষ্টিভঙ্গি থাকাও প্রয়োজন। আর এ ধরনের গুণাবলি অর্জনের জন্য একজন শিক্ষককে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন করা প্রয়োজন। কর্মসহায়ক গবেষণায় নিয়োজিত একজন শিক্ষক তার পেশাগত দক্ষতায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারেন।

পাশাপাশি কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে একজন শিক্ষক তাঁর দৈনন্দিন অনুশীলনের যৌক্তিকতা বুঝতে পারেন। নিজ পেশাগত জ্ঞান ও কার্যাবলি যাচাই করার (professional judgement)দক্ষতা অর্জন করেন। স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণে সক্ষমতা লাভ করেন।

কর্মসহায়ক গবেষণার একটি বিশেষ সুবিধা বা বৈশিষ্ট্য হলো, এটি শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ উপযোগী। এর উদ্দেশ্য হলো বিদ্যমান অবস্থায় পরিবর্তন এনে শিখনশেখানো চর্চার উন্নয়ন ঘটানো। এই গবেষণা শিক্ষককে তার অনুশীলন বা চর্চা সম্পর্কে সচেতন হতে উৎসাহিত করে; দৈনন্দিন শিক্ষাকার্য বা অনুশীলন সম্পর্কে সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে তার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ফলে শিক্ষক নিজ কার্যাবলি সম্পর্কে প্রতিফলনমূলক চিন্তায় নিয়োজিত হয়ে থাকেন। এ ছাড়া এই গবেষণা শিক্ষককে তার নিজ কার্যে পরিবর্তন আনার প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করে।

কর্মসহায়ক গবেষণায় নিয়োজিত শিক্ষক নিজ শিক্ষণ কাজ যাচাইয়ে ও উন্নয়নে সচেষ্ট থাকেন। শিক্ষক তার শ্রেণিকক্ষে কী কী ঘটছে সে সম্পর্কে নিজেকে প্রশ্ন করতে এবং একই সাথে সম্ভাব্য উত্তর খুঁজে পেতে প্রস্তুত থাকেন। এ ক্ষেত্রে সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য বারবার চেষ্টা করার দরকার হয়।

বাংলাদেশের একজন গবেষক শ্রেণিশিক্ষকদের সঙ্গে তাঁর অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, ‘সাধারণভাবে শিক্ষকগণ তাদের দৈনন্দিন শ্রেণি কার্যাবলি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন। অধিকাংশ শিক্ষক মনে করেন যে, তাঁরা যেভাবে বা যে পদ্ধতি বা

স্টুয়ার্ট তাঁর গবেষণা কাজের অংশ হিসেবে আফ্রিকার লেসোথোর পাঁচজন শিক্ষককে তাদের শ্রেণিকক্ষের সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য নির্দেশনা দেন। প্রথমবার শিক্ষকগণ তাঁকে জানান যে, তাঁদের শ্রেণিতে পাঠ দেয়ার সময় তাঁরা কোনো সমস্যা অবলোকন করেন

| | |
|---|---|
| কৌশল অনুসরণ করে প্রতিদিন পাঠ উপস্থাপন করেন তা ঠিকই আছে। এর মধ্যে তারা কোনো সমস্যা দেখেন না।' | না। স্টুয়ার্ট যখন তাঁদের আরো ভাবার সময় দিলেন, তৃতীয়বারে ঐ পাঁচজন শিক্ষকের প্রত্যেকে বেশ কিছু সমস্যার তালিকা তৈরি করেন। তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে, এসব সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। এভাবে গবেষকের (স্টুয়ার্ট) সহায়তায় একাধিকবার চেষ্টার পর শিক্ষকগণ সঠিক সমস্যা চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। |

শিক্ষক যখন গবেষণায় নিয়োজিত হন, তখন তিনি তার প্রচলিত শিখন শেখানো ব্যবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন না; বরং বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব জানার চেষ্টা করেন, যা প্রকারান্তরে শিক্ষককে আত্ম-প্রতিফলনের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষ চর্চায় পরিবর্তন আনার তাগিদ দেয়। শিক্ষক চিন্তা করতে পারেন যে, তিনি শ্রেণিতে যেভাবে বা পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপন করছেন তা কি শিক্ষার্থীদের শিখতে সহায়তা করছে? শিক্ষার্থীরা কি তাদের জন্য উপস্থাপিত বিষয়বস্তু বুঝতে পারছে? শিক্ষণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন আছে কি? কেনই এই পরিবর্তন আনা দরকার? কীভাবে এ পরিবর্তন আনা যায়? এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেতে হলে কিংবা উন্নয়ন ঘটাতে চাইলে শিক্ষককে অবশ্যই তার পেশাগত আদর্শ বা মান সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

শ্রেণিকক্ষের পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় শিক্ষককে জড়িত করার যৌক্তিক কারণ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে একজন শিক্ষকই কেবল তাঁর অবস্থানের কারণে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত এবং কার্যকর শিক্ষণ উপহার দিতে পারেন। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকই শিক্ষার্থীর সাথে প্রতিনিয়ত কথোপকথন বা মিথস্ক্রিয়ায় অংশ নেন, শিখন শেখানো কাজে পাঠ পরিকল্পনা করা আর শিক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালনায় তিনি সরাসরি জড়িত। সুতরাং শ্রেণিকক্ষ পরিস্থিতি, শিক্ষার্থীর চাহিদা, মনমানসিকতা সম্পর্কে শিক্ষক যতটা ভালোভাবে জানেন; বহিরাগত কোনো গবেষক বা বিশেষজ্ঞ ততটা অবগত নন। সে ক্ষেত্রে আশা করা যায় যে, শ্রেণি শিখন শেখানো এবং শিখন সম্পর্কে শিক্ষক যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য প্রশ্ন উত্থাপন করতে সক্ষম হবেন। অর্থাৎ বহিরাগত গবেষকের চেয়ে শ্রেণিশিক্ষক প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করে যথোপযুক্ত গবেষণানির্ভর সমাধান করতে সক্ষম হবেন।

কোনো নতুন ধারণা বা উদ্ভাবন, সমর্থন বা বর্জন করার মতো সামর্থ্য এবং ক্ষমতা উভয়ই শিক্ষকের থাকা প্রয়োজন। যে শিক্ষক পেশাগতভাবে স্বাধীন, তার পক্ষেই শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত শিখন উপহার দেয়া সম্ভব। হপকিনস (১৯৮৫)-এর মতে, শিক্ষক যখন গবেষক, গবেষণায় নিয়োজিত শিক্ষক স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারেন এবং স্বনির্ভরভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এ-ধরনের শিক্ষক গতানুগতিক ধারা থেকে বের হয়ে বিকল্প চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে তিনি নতুন কার্যকর শিক্ষণ কৌশল প্রয়োগের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেন। শিক্ষক স্ব-উদ্যোগে তার পেশাগত সমস্যা সমাধানের পথ বের করার প্রবণতা দেখাবেন। এতে শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ম্যাকনিফ (১৯৯৫) একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিকক্ষে কর্মসহায়ক গবেষণার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেছেন:

> "এটি এমন একটি গবেষণা প্রক্রিয়া, যা শ্রেণিকক্ষকেন্দ্রিক হতে পারে। শ্রেণিকক্ষের দৈনন্দিন কার্যাবলি, যেমন– শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়া, শিখন শেখানোকার্যাবলি, পদ্ধতি, উপকরণ

ইত্যাদি, যা শিক্ষার্থীদের শিখনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু গতানুগতিক গবেষণায় এধরনের বিষয় স্থান পেলেও তা শুধু অবস্থা জানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সমাধানের কোনো নির্দেশনা থাকে না, তা ছাড়া বহিরাগত গবেষক কাজ করেন।"

যেমন- একজন শিক্ষক শ্রেণিতে একতরফা বক্তৃতা পদ্ধতির ব্যবহারকে একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের স্মৃতিনির্ভর হতে সাহায্য করে। শিক্ষক কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে বিকল্প একটি পদ্ধতি (দলীয় আলোচনা) পদ্ধতি ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করতে পারেন। কাজেই শ্রেণিকক্ষ সমস্যা বিশ্লেষণে এর উপযোগিতা রয়েছে।

অপরদিকে, পেশাগত উন্নতির জন্যও একজন শিক্ষক কর্মসহায়ক গবেষণায় নিয়োজিত হতে পারেন। শিক্ষকের পেশাগত উন্নতি শিক্ষার্থীর শিখন উন্নয়নের জন্যও অপরিহার্য। তাহলে শিক্ষক শিক্ষকতাকে চাকরি নয় বরং একটি প্রফেশন বা পেশা হিসেবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

কার ও কেমিস (১৯৮৬) শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বিবেচনা করার কয়েকটি উপকারিতা আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, পেশাদার শিক্ষক তাত্ত্বিক ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করেন। কর্মসহায়ক গবেষণায় নিয়োজিত শিক্ষক গবেষণা ও জ্ঞান বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ্য অর্জন করেন, যার দ্বারা তিনি শিখনশেখানো চর্চা উন্নয়নে সফলতা অর্জন করতে। পেশাদার শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকেন, শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত শিখন উপহার দেয়ার জন্য এক ধরনের দায়বদ্ধতা অনুভব করেন। কোনো কাজের প্রতি দায়িত্ববান হওয়ার জন্য দরকার হয় সচেতনতার সাথে চিন্তা করা।

সম্প্রতি প্রশিক্ষণলাভকারী একজন শ্রেণিশিক্ষকের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে আপনি শ্রেণিকক্ষে 'দলীয় কাজ' (মৎড়ঁঢ় ড়িৎশ)উপস্থাপন করেন কি? তাঁর উত্তর ছিল, 'আসলে দলীয় কাজ করাতে হলে অনেক সময় লাগে। তাই এটা সচরাচর করা সম্ভব হয় না। তবে যখন প্রজেক্ট থেকে পরামর্শক পরিদর্শনে আসেন, তখন আমরা দলীয় কাজ বা অন্যান্য কৌশল ব্যবহার করি।' এ-ধরনের আচরণ শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের দায়িত্বশীলতা বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধতাকে প্রকাশ করে না। বরং এ শিক্ষক প্রশাসন বা ব্যবস্থাপকের সন্তুষ্টিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন।

শিক্ষক, দায়িত্ববান বা অঙ্গীকারবদ্ধ না হলে তিনি কোনো পরিবর্তন বা উন্নয়নের কথা চিন্তা করতে পারেন না, কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করেন না, বিদ্যমান অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন এবং প্রচলিত ব্যবস্থায় অনুগত বাহকের ভূমিকা পালন করেন। বিপরীতক্রমে, পেশার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক পুরোপুরি সচেতন, পরিবর্তনে আগ্রহী, প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন, বিদ্যমান অবস্থা উন্নয়নের প্রবণতা দেখান। এ ছাড়া শিক্ষক পেশাগতভাবে স্বয়ংক্রিয় এবং স্বাধীন। এর জন্য তার নিজ কাজ সম্পর্কে সমালোচনাত্মক মনোভাব গ্রহণ করেন, নিজের আগ্রহ থেকে গবেষণা কাজে নিয়োজিত হন এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা ফলাফল বাস্তবে প্রয়োগ ও যাচাই করেন (ম্যাকনিফ, ১৯৯৫)।

ব্যক্তিগত উন্নতির জন্যও একজন শিক্ষক কর্মসহায়ক গবেষণায় সম্পৃক্ত হতে পারেন। শিখন শেখানো কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একজন শিক্ষক নিজকে এবং তার শিক্ষার্থীকে যাচাই করার সামর্থ্য অর্জন

করা প্রয়োজন। ম্যাকনিফের পরামর্শ অনুযায়ী, একজন শিক্ষ ককে 'মানবিক শিক্ষক' (যঁসধহ ঃবধপযবৎ)-এর ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন। একজন মানবিক শিক্ষকের কাজ হলো নিজ জ্ঞান শিক্ষার্থীর ওপর চাপিয়ে দেয়ার পরিবর্তে শিক্ষার্থীকে জ্ঞান অন্বেষণে উৎসাহী করা, তার আগ্রহকে জাগ্রত করা। আর এ জন্য শিক্ষককে তার জ্ঞান সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে অভিযাত্রীর মতো অনুসন্ধান ও চিন্তন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত হওয়া দরকার। কর্মসহায়ক গবেষণায় জড়িত হয়ে শিক্ষক এসব গুণাবলি অর্জন করতে পারেন।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট করে বলা যায় যে, শ্রেণিশিক্ষকের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণার যৌক্তিকতা রয়েছে। শিক্ষক যখন নিজের শিখন শেখানো কার্যাবলি নিয়ে গবেষণা করেন তখন তার কার্যাবলি ও শিক্ষার্থীদের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। ফলে তিনি নিজ কার্যের সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করে তা উন্নয়নে সচেষ্ট হন। এই গবেষণার যথার্থতা নির্ভর করে শিক্ষকের বা অনুসন্ধানকারীর ওপর।

**কর্মসহায়ক গবেষণার বিষয় ও ক্ষেত্র নির্বাচন**

কর্মসহায়ক গবেষণার জন্য বিষয় কীভাবে নির্বাচন করতে হয়? এ-ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রই বা কতোটুকু? সব ধরনের সমস্যাই কি কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে সমাধান করা যায়? কর্মসহায়ক গবেষণার বিষয় ও ক্ষেত্র নির্বাচনের জন্য এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা দরকার। ছোট থেকে বড়, আর শিক্ষা বা ব্যবস্থাপনা চর্চা/অনুশীলনের সাথে সম্পর্কিত অনেক ক্ষেত্রেই কর্মসহায়ক গবেষণা প্রয়োগ করা যায়। যেমন– বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী মূল্যায়ন, পেশাগত চর্চার বিকাশ ও উন্নয়ন, শিক্ষণ পদ্ধতি, শিখন কৌশল, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আদর্শগত গুণাবলি, ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন, শ্রেণি/শিখন ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক বিষয়, ফলাবর্তন পদ্ধতি, প্রাকটিকাম, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ইত্যাদি (বেগম, ২০০৮)।

কর্মসহায়ক গবেষণার মূল উদ্দেশ্য নতুন কিছু আবিষ্কার করা নয় বরং কর্মসহায়ক গবেষণার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো, দৈনন্দিন শ্রেণি কার্যাবলি পরিচালনার সময় উদ্ভূত সমস্যা সমাধান করা, বিদ্যমান অবস্থার উন্নয়ন সাধন এবং এর মাধ্যমে শিক্ষকের দক্ষতার উন্নয়ন। শিক্ষার্থীদের শিখন মান উন্নয়নের জন্য একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের অনেক বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে পারেন। যেমন– একীভূত শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ; শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা; উন্নতমানের প্রশ্ন করা; শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। কিন্তু শিক্ষক যদি মনে করেন দৈনন্দিন শ্রেণিতে ব্যবহৃত পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের কার্যকর শিখনে সহায়তা করছে না, তাহলে তিনি এসব পদ্ধতি বা কৌশল পরিবর্তন করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, একজন শিক্ষক যদি অনুভব করেন যে, তিনি যেভাবে বক্তৃতা পদ্ধতির মাধ্যমে পড়াচ্ছেন, এতে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু ভালোভাবে বুঝতে পারছে না, তাহলে তিনি অন্য কৌশল (যেমন– ভূমিকাভিনয়, খেলা, গল্প বলা) ব্যবহার করতে পারেন। এর জন্য তিনি কর্মসহায়ক গবেষণা পরিচালনা করতে পারেন। সুতরাং, কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষক মূলত দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যাবলি উন্নয়ন সাধনে সচেষ্ট থাকবেন যা সরাসরি শিক্ষকের দক্ষতা বাড়াতে সহায়ক হবে।

শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করার জন্য শিক্ষককে বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশলের সমন্বয় সাধন করে ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। এর কিছু শ্রেণিকক্ষের মধ্যে এবং কিছু বাইরে সংঘটিত হতে পারে। কর্মসহায়ক

গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষক একাধিক কৌশলের মধ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য অধিকতর কার্যকর ও উপযুক্ত শিক্ষণ কৌশল নির্ধারণ করতে পারেন। পাশাপাশি তিনি প্রচলিত কৌশলের মধ্যে পরিবর্তন এনে তার উন্নয়ন সাধন করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের শিখন যাচাই/মূল্যায়ন করা হয়। শ্রেণিকক্ষের শিখনশেখানো প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মূল্যায়ন। মূল্যায়নের কার্যকারিতার ওপর শিক্ষার্থীর শিখনের সাফল্য নির্ভর করে। কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে শ্রেণিতে শিখন মূল্যায়নের কৌশল উন্নত করার পদক্ষেপ নিতে পারেন। এছাড়া বাড়ির কাজ, ফলাবর্তন পদ্ধতিসহ শ্রেণিকক্ষের অনেক বিষয়ই কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করা সম্ভব।

**কর্মসহায়ক গবেষণা প্রক্রিয়া**

কর্মসহায়ক গবেষণাকে সমস্যা সমাধানের কোনো একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করার চেয়ে একে কৌশল (strategy)হিসেবে অনেকে চিহ্নিত করে থাকেন (McNiff and Whitehead, 2011; Wilson, 2013)। এর কারণ হলো, এই গবেষণায় গবেষক নিজের সুনির্দিষ্ট কিছু চর্চার মাধ্যমে নিজের দক্ষতা বাড়ানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। ফলে কর্মসহায়ক গবেষণায় গবেষক তাঁর নিজের অবস্থার উন্নতির জন্য কিছু নিয়মকানুন অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই নিয়মকানুনগুলোকে বিভিন্ন গবেষক বা শিক্ষাবিদ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যাদের মধ্যে কার্ট লিউইন (১৯৪৬), স্টেনহাইজ (১৯৭৫), কার ও কেমিস (১৯৮৬), হপকিনস (১৯৮৬) ও এলিয়ট (১৯৯১)-এর মডেলসমূহ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখযোগ্য, অন্যান্য গবেষণার সঙ্গে তুলনা করলে বলা যায় যে, কর্মসহায়ক গবেষণার কোনো সর্বজনীন বা অপরিবর্তনীয় মডেল নেই কারণ এই ধরনের গবেষণা পরিবেশ ও চাহিদা অনুসারে পরিচালনা করা হয়। তবে উপর্যুক্ত ব্যক্তিবর্গের মডেল অনুসরণ করে কর্মসহায়ক গবেষণার কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব।

কর্মসহায়ক গবেষণার মূল ধাপ পাঁচটি। কার্ট লিউইন কর্মসহায়ক গবেষণার যে ধাপগুলো বর্ণনা করেছিলেন তা হলো:

ক. কোনো একটি সমস্যা চিহ্নিত করা যা শিক্ষক অর্থাৎ গবেষক সমাধান করতে চান;
খ. উক্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে গবেষণাটির সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করা;
গ. পরিকল্পনা অনুসারে তথ্য সংগ্রহ করা ও অন্যান্য কাজ বাস্তবায়ন করা;
ঘ. বাস্তবায়নকৃত কাজ পর্যবেক্ষণ করা, রেকর্ড করা ও ফিডব্যাক গ্রহণ ও
ঙ. পুরো প্রক্রিয়াটি পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনে নতুন করে এই চক্র অনুসারে প্রথম থেকে কাজ শুরু করা।

কার্ট লিউইনের মডেল অনুসারে কর্মসহায়ক গবেষণার ধাপগুলোকে নিচের চিত্রের মতো করে দেখানো যায় (চিত্র ৪.৭)[৩]।

[৩] ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে নেয়া

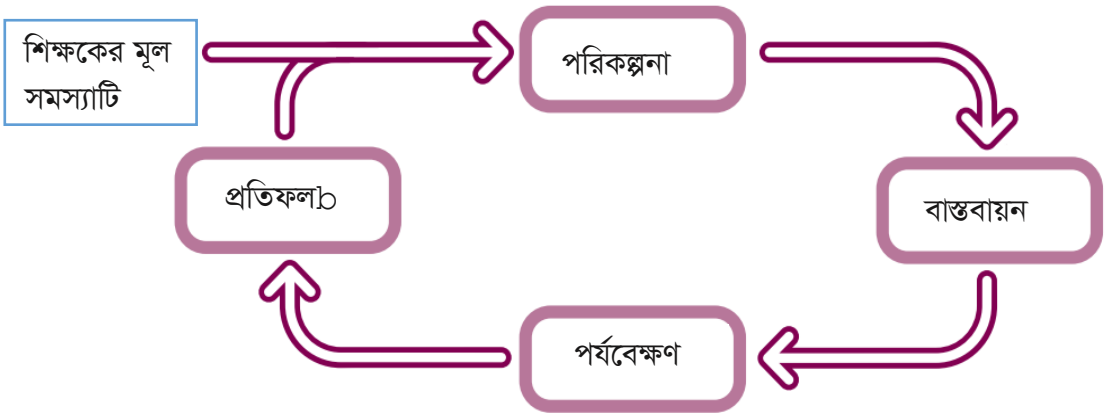


চিত্র ৪.৭: কর্মসহায়ক গবেষণারকার্ট লিউইনের মডেল

এই চিত্র অনুসারে শিক্ষক তাঁর সমস্যা চিহ্নিত করে সে অনুসারে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও প্রতিফলন ধাপের কাজগুলো সম্পন্ন করবেন। কোন ধাপে কী কী কাজ করা আবশ্যক, তা চিত্র ৪.৮-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

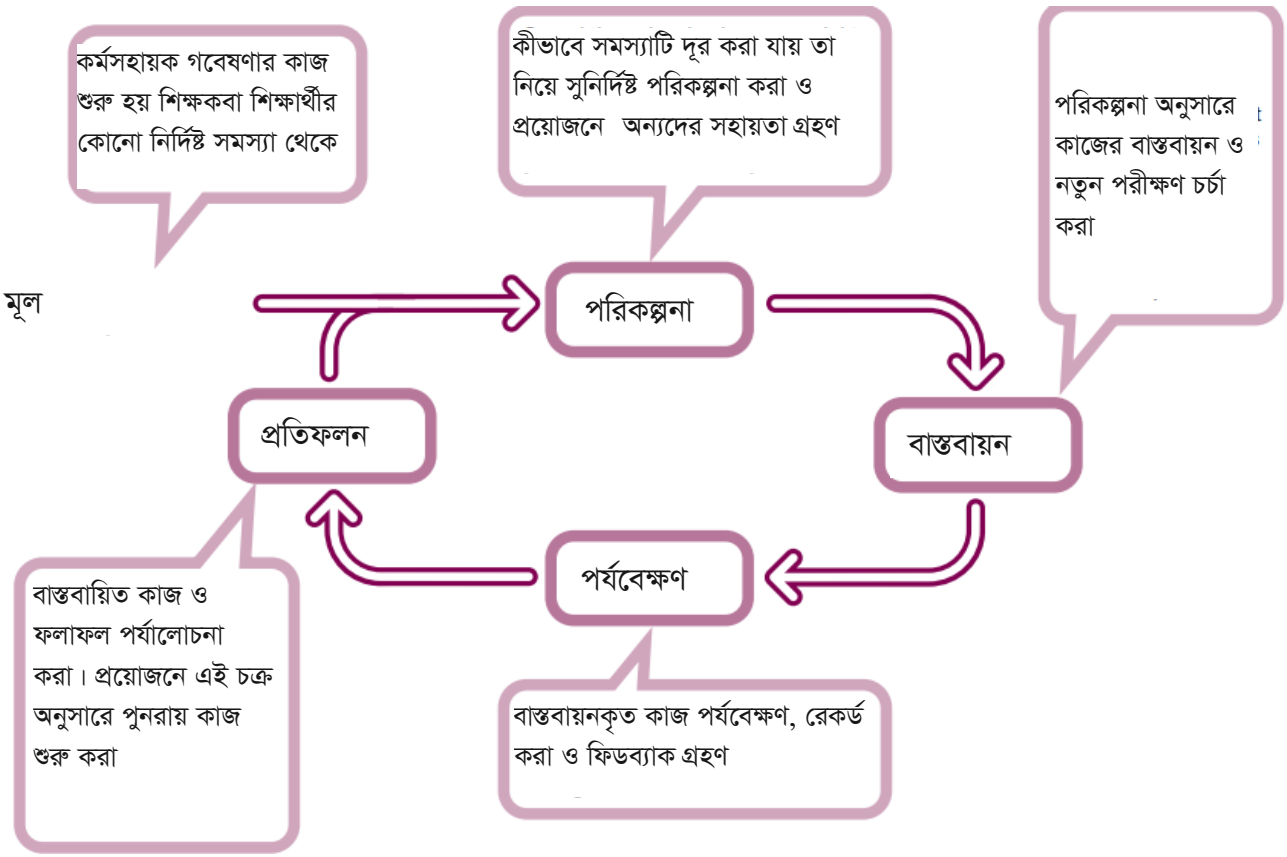


চিত্র ৪.৮: কার্ট লিউইনের মডেল অনুসারে বিভিন্ন ধাপে করণীয়

আপাতদৃষ্টিতে এই ধাপগুলো সরল মনে হলেও শ্রেণিকক্ষের বাস্তবতায় এগুলো বেশ জটিল হতে পারে (Waters-Adams, 2006)। কিংবা কোনো একটি নির্দিষ্ট ধাপ অন্যান্য ধাপের তুলনায় জটিলতর হতে পারে। সেজন্য সম্ভাব্য সব জটিলতাকে বিবেচনায় রেখে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সতর্কতার সঙ্গে কর্মসহায়ক গবেষণা করার

প্রয়োজন হয়। এমনও হতে পারে, গবেষণার প্রয়োজেনে ধাপগুলোর পুনরাবৃত্তি করে গবেষণা-কাজ পরিচালনা করতে হয়।

কর্মসহায়ক গবেষণায় শিক্ষকের সমস্যার প্রাথমিক সমাধান হলেই যে গবেষণার চক্র শেষ হয়ে যায় তা নয়; বরং প্রাথমিক সমস্যার সমাধান থেকে পরবর্তী সমস্যা বা প্রশ্নের সূত্রপাত ঘটতে পারে। কিংবা একই সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণার পুরো প্রক্রিয়াটি একাধিকবার পরিচালনার প্রয়োজন পড়ে (চিত্র ৪.৯)। যে কারণে কর্মসহায়ক গবেষণাকে একটি চলমান প্রক্রিয়া বলা হয়ে থাকে।

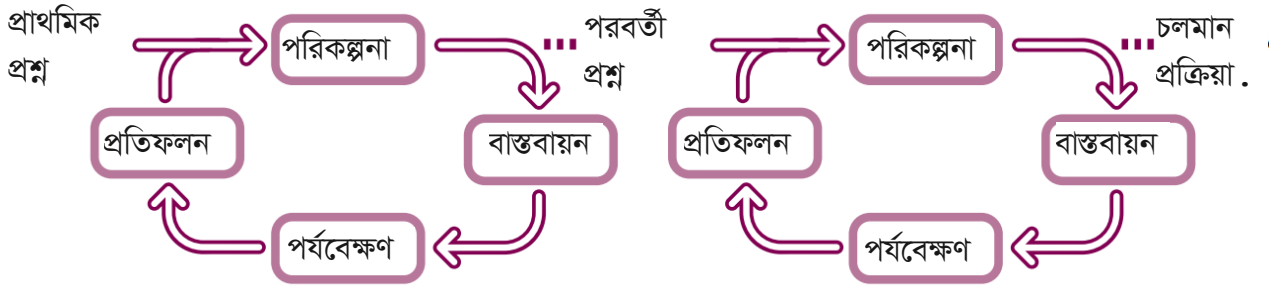


চিত্র ৪.৯: কর্মসহায়ক গবেষণার চলমান সর্পিলাকার প্রক্রিয়া

এভাবে কর্মসহায়ক গবেষণা পরিচালনা করার একটি প্রধান কারণ হলো, প্রতিটি চক্রে আগের চক্রের কাজ বা নতুন সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন হতে পারে। ফলে কর্মসহায়ক গবেষণার সম্পূর্ণ মডেলটি সর্পিলাকার (spiral) হয়ে থাকে।

**সমস্যা চিহ্নিতকরণ**

একটি কর্মসহায়ক গবেষণার শুরুতে শিক্ষক কী নিয়ে গবেষণা করবেন, তা নির্ধারণ করার পরবর্তী কাজই হচ্ছে পরিকল্পনা, যাকে এখানে প্রথম ধাপ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। সুতরাং, পরিকল্পনাটি তখনই ভালো হবে যখন সমস্যাটি ভালোভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। কীভাবে কর্মসহায়ক গবেষণার জন্য একটি সমস্যা চিহ্নিত করা যায়?

একজন শ্রেণিশিক্ষক একজন গবেষকের সাথে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন এভাবে– 'পাঠ দেয়ার সময় প্রায়ই কিছু শিক্ষার্থী নিজেদের মধ্যে কথা বলে। তখন আমি তাদের কথা বলতে বারণ করি। কখনো কখনো ধমক দিই। এতে তারা তাৎক্ষণিকভাবে কথা বলা বন্ধ করলেও পরক্ষণেই আবার কথা বলা শুরু করে।'

আপনি কি মনে করেন, এটি একটি সমস্যা, যা সমাধান করা প্রয়োজন? কেন? এর সমাধান শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর জন্য কোনো উপকার বয়ে আনবে কি? এর সমাধানই বা কী হতে পারে? বার বার নিষেধ করা? শাস্তি? নাকি শিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তন?

মনে রাখা প্রয়োজন, সব সমস্যাই কিন্তু গবেষণার মাধ্যমে সমাধান করা যায় না বা সবক্ষেত্রেই কর্মসহায়ক গবেষণার প্রয়োজন নেই। গবেষণার বিষয় বা সমস্যাটির সমাধান যেন শিক্ষণ বা শিখন প্রক্রিয়ার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে, সেই বিষয়টিকে সামনে রেখে সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে। একজন শিক্ষকের মূল লক্ষ্য হলো তার পেশাগত চর্চার (যেমন– শিক্ষণ পদ্ধতি, প্রশ্ন করার কৌশল, প্রশ্ন বা কাজের

মান উন্নয়ন ইত্যাদি) উন্নতি সাধন করা এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন মানের উন্নয়ন ঘটানো। ফলে শিক্ষক তাঁর দৈনন্দিন শ্রেণি কার্যাবলি থেকেই গবেষণার জন্য এক বা একাধিক বিষয় নির্বাচন করতে পারেন।

সমস্যা নির্বাচনের আগে শিক্ষককে নিজেকেই নিজে বেশ কিছু প্রশ্ন করতে হবে। যেমন– সমস্যাটি কেন তাঁর কাছে গুরুত্বপুর্ণ, এ বিষয়ে কর্মসহায়ক গবেষণা করা কতোটুকু জরুরি, সমস্যাটি যাচাইয়ের জন্য কী ধরনের তথ্য-উপাত্ত রয়েছে, এসব তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করা যাবে, সমস্যাটি সম্পর্কে গবেষকের যে ধারণা কতোটুকু, সমস্যাটি কতোটুকু সমাধানযোগ্য ইত্যাদি। এসব প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক উপযুক্ত সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবেন যা শিক্ষককে গবেষণার পুরো পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতন হতে সহায়তা করবে। নিচের সারণি থেকে এ বিষয়ে আরও পরিষ্কার বুঝা যাবে।

সারণি ৪.১: গবেষণার সমস্যা চিহ্নিত করা

| **সমস্যা: উদ্বিগ্নতার বিষয় কী?** | **শিখন-শেখানো কার্যে শিক্ষার্থীদের অনেকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করে নিষ্ক্রিয় থাকে।** |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীরা কি আসলেই নিষ্ক্রিয়?** | – পর্যবেক্ষণের সময় শিক্ষার্থীরা শোনে কিন্তু প্রশ্ন করতে উৎসাহী হয় না;<br>– শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দিতেও উৎসাহী নয়;<br>– শ্রেণিতে কোনো কাজ দিলে তা সহজে করতে চায় না ইত্যাদি। |
| **কেন সমস্যা? নিষ্ক্রিয়তা কি শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো সমস্যা?** | – শিক্ষার্থীদের শিখনের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে;<br>– শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে চিন্তা করতে সক্ষম হয় না;<br>– শিক্ষার্থী মনোযোগ হারাতে পারে;<br>– বিষয়বস্তু নাও বুঝতে পারে;<br>– মুখস্থ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়;<br>– পাঠে মনোযোগ বিঘ্নিত হতে পারে ইত্যাদি। |
| **সমস্যার সম্ভাব্য কারণ কী?** | – শিক্ষণ পদ্ধতি: শিক্ষক কর্তৃক বক্তৃতা পদ্ধতির ব্যবহার?<br>– শিক্ষার্থীর সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষকের উদাসীনতা?<br>– প্যাশের শ্রেণি থেকে আগত শব্দ? |
| **বাস্তব উপযোগী সম্ভাব্য সমাধান** | – শিক্ষণ কৌশল বা পদ্ধতির পরিবর্তন?<br>– শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতির ব্যবহার?<br>– দলগত আলোচনা?<br>– একক চিন্তা বা স্ব-মূল্যায়ন পদ্ধতির ব্যবহার? |

এভাবে বিভিন্নভাবে নিজেকে প্রশ্ন করার পরই কেবল একজন শিক্ষক গবেষণার জন্য উপযুক্ত সমস্যা নির্বাচন করবেন। সমস্যা নির্বাচনের পর এর সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে চিন্তা করবেন এবং সে অনুসারে পরিকল্পনা করবেন।

শ্রেণিতে শিখনশেখানো কার্য চলাকালে একজন শিক্ষক সচরাচর যে ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হন বা উপলব্ধি করতে পারেন তার একটি সম্ভাব্য তালিকা হতে পারে নিম্নরূপ (মুত্তাকী ও বেগম, ২০০৮):

- কিছু কিছু শিক্ষার্থীর শ্রেণিতে অনিয়মিত উপস্থিতি;
- শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ না করা;
- শিক্ষার্থীদের পাঠে অমনোযোগিতা;
- শ্রেণিতে বেপরোয়া স্বভাবের শিক্ষার্থীদের অনভিপ্রেত আচরণ;
- শ্রেণিতে শৃঙ্খলা বজায় না রাখা;
- শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতির ব্যবহার;
- শ্রেণি মূল্যায়নের কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে অপারগতা;
- কিছু শিক্ষার্থীর বাড়ির কাজ ঠিকমতো করতে অসমর্থ হওয়া;
- বৈচিত্র্যহীন শ্রেণিকক্ষ;
- শিক্ষার্থীদের মানসম্মত প্রশ্ন করা বা কাজে নিয়োজিত করায় অপারগতা;
- অনুপযুক্ত শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবহার ইত্যাদি।

একটি উদাহরণ থেকে বিষয়টি আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে। একজন শ্রেণিশিক্ষক উপলব্ধি করলেন যে, গতানুগতিক বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিখনশেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করাতে শ্রেণির শিক্ষার্থীরা পাঠের বিষয়বস্তু ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারছে না, ফলে মুখস্থ করছে। মুখস্থ করার ফলে শিক্ষার্থী কার্যকর শিখন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের বাস্তবসম্মত শিখনে উৎসাহিত করতে চান। নিজের কাছেই তাঁর প্রশ্ন ছিল, 'আমি কী করতে পারি? বক্তৃতা না দিয়ে দলগত আলোচনার (মৎড়ঁঢ় ফরংপঁংংরড়হ) ব্যবস্থা করলে কি শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে?'

এভাবে বাস্তব প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে একজন শ্রেণিশিক্ষক তার দৈনন্দিন শিক্ষণ কার্যাবলি থেকে প্রথমে সমস্যা ও তার কারণ চিহ্নিত করতে পারেন এবং পরে এর সম্ভাব্য সমাধান চিহ্নিত করতে পারেন। তবে শিক্ষক যে কর্মসহায়ক গবেষণাটি করতে চাচ্ছেন সেটি পরিকল্পনার আগে নিচের ছক অনুসারে তাঁর সমস্যাটিকে যাচাই করে নিতে পারেন। এই চেকলিস্ট থেকেই শিক্ষক বুঝতে পারবেন তিনি পরিকল্পিত উপায়ে কর্মসহায়ক গবেষণাটি সংগঠিত করতে পারবেন কিনা।

সারণি ৪.২: কর্মসহায়ক গবেষণার সিদ্ধান্তগ্রহণ চেকলিস্ট

| প্রশ্ন | হ্যাঁ | না |
|---|---|---|
| যে বিষয়টি নিয়ে আমি গবেষণা করতে চাচ্ছি, সেটি কি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিষয়টির প্রতি আমার কি আগ্রহ আছে? | | |
| যে সমস্যাটি নিয়ে কাজ করতে চাই সেটি সমাধানের জন্য ও বর্তমান অবস্থা পরিবর্তন করার জন্য যথেষ্ট সময় কি আমার আছে? | | |
| এই সমস্যাটি নিয়ে গবেষণা করার মতো উপযুক্ত উপকরণ ও উপাদান কি আছে? | | |
| গবেষণা চলাকালীন অন্যদের সহায়তা কি পাবো? | | |

| | | |
|---|---|---|
| গবেষণার পর কতোটুকু পরিবর্তন আসতে পারে এবং সেগুলো আদৌ করতে পারবো কিনা এ ব্যাপারে কি আমার স্বচ্ছ ধারণা আছে? | | |

**কর্মসহায়ক গবেষণার প্রথম ধাপঃ পরিকল্পনা**

পূর্ববর্তী ইউনিটে আমরা কর্মসহায়ক গবেষণার মৌলিক ধাপসমূহের একটি সামগ্রিক ধারণা উপস্থাপন করেছি। এ ছাড়া প্রথম ধাপটি, অর্থাৎ সমস্যা শনাক্ত করা ধাপটি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেছি। এই ইউনিটে সমস্যার সমাধান চিহ্নিত করা এবং উক্ত সমাধান কীভাবে বাস্তবে প্রয়োগ করা যায়, এর জন্য কীভাবে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন তা বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পরিকল্পনার ধাপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ উপযুক্ত পরিকল্পনার ওপর পরবর্তী কাজের সাফল্য নির্ভর করে। একটি ভালো পরিকল্পনা গবেষণার কাজ অনেকটাই এগিয়ে দেয়। পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্পূর্ণ গবেষণা কর্ম ধারাবাহিকভাবে বা ধাপে ধাপে কী উপায়ে, কখন, কার দ্বারা এবং কেন সংঘটিত হবে তার একটি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় (বেগম, ২০০৮)। সমস্যা বা বিষয় চিহ্নিত করার পর যে কাজটি করা অপরিহার্য তা হলো, সমস্যার একটি প্রেক্ষাপট উপযুক্ত সমাধান স্থির করা এবং এই সমাধান কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তা পরিকল্পনা করা। সমাধান বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করার পূর্বে শিক্ষক-গবেষক সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানগুলো সম্পর্কে চিন্তা করবেন। নিরীক্ষা করে একটি উপযুক্ত সমাধান বাস্তবায়ন বা প্রয়োগের জন্য নির্বাচন করবেন। এ ক্ষেত্রে মূল প্রশ্ন হতে পারে নিম্নরূপ:

- নির্বাচিত সমস্যার সম্ভাব্য কারণগুলো কী?
- বাস্তবতার নিরিখে কী কী উপায়ে এর সমাধান হতে পারে বা সম্ভাব্য সমাধানগুলো কী কী?

এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করার পর উপযুক্ত সমাধান নির্বাচনের জন্য আরো কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজ করা প্রয়োজন (বেগম, ২০০৮)। যেমন–

- এই সমাধান কি সর্বোত্তম? যেমন– শিক্ষার্থীরা কি এই সমাধান থেকে উপকৃত হবে?
- এই সমাধান কি শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগযোগ্য?
- বিদ্যালয় বা শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ এবং রিসোর্স কি এই সমাধানের জন্য উপযুক্ত?
- কীভাবে এই সমাধান শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করা যায়?
- এই প্রয়োগের জন্য কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হবে? যেমন– শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, খালি জায়গা, আলোর ব্যবস্থা, চক/হোয়াইট বোর্ড, শিক্ষার্থীর সংখ্যা, তাদের বসার ব্যবস্থা, সময় বা শ্রেণির পিরিয়ড ইত্যাদি।
- এ ছাড়া সমাধান প্রয়োগের পর সে সম্পর্কে কী তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, কীভাবে বা কী পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে, সংগৃহীত তথ্য কীভাবে বিশ্লেষণ করা যাবে (মুত্তাকী ও বেগম, ২০০৮) এবং পরিবর্তন বা উন্নতির জন্য কাজে লাগানো যাবে?

গবেষণার পরিকল্পনা করার সময় এ ধরনের কিছু প্রশ্ন ও এর উত্তর বিবেচনা করা একান্ত প্রয়োজন। এ ধরনের প্রশ্ন গবেষক বা শিক্ষ ককে বাস্তব প্রেক্ষাপটের উপযোগী পরিকল্পনা করতে সাহায্য করবে।

সারণি ৪.৩: গবেষণা পরিকল্পনার ছক

| ধাপ | কার্যাবলির বর্ণনা | সময় |
|---|---|---|
| **সমস্যা বা বিষয়বস্তু** | শ্রেণিতে অনুষ্ঠিত শিখন শেখানো কার্যে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করা<br>গবেষণা প্রশ্ন:<br>– কেন শিক্ষার্থীরা শ্রেণি কার্যাবলিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে না?<br>– কেন শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে প্রশ্ন করতে অনীহা দেখায়?<br>– কেন ... (এভাবে শিক্ষক নিজেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করবেন) | |
| **সমস্যার সম্ভাব্য কারণ** | – গতানুগতিক শিখন শেখানো পদ্ধতির ব্যবহার<br>– শিখন পরিবেশ ভালো নয়<br>– ... (এভাবে শিক্ষক কারণসমূহ উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন) | |
| **সমাধান** | – সক্রিয় অংশগ্রহণ<br>– দলীয় কাজ<br>– জোড়া আলোচনা<br>– ... (এভাবে সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে চিন্তা করবেন) | |
| **পরিস্থিতি বিশ্লেষণ** | – শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কেমন? বেশি নাকি কম?<br>– শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ কি শিখন-শেখানো কার্যক্রমের অনুকূল?<br>– বিষয়বস্তু ও কাজের ধারা নির্ধারণ কি যথাযথ?<br>– দলীয় কাজের জন্য বরাদ্দকৃত সময় কি যথাযথ?<br>– ... (এভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করবেন) | |
| **পরিকল্পনা বাস্তবায়ন** | – শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করা;<br>– শিক্ষার্থীদের কাজ দেয়া বা কাজের ধারা বুঝিয়ে দেয়া;<br>– পর্যাপ্ত সময় দেয়া<br>– ... (এভাবে ধাপে ধাপে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবেন) | |
| **তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণ: কৌশল ও প্রক্রিয়া** | – তথ্যগুলোকে নির্দিষ্ট ভাগ বা থিম অনুসারে সাজানো;<br>– সংখ্যাগত বা গুণগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে সাজানো;<br>– ... (এভাবে বিশ্লেষণের জন্য কাজ করবেন) | |
| **প্রতিফলন** | – প্রতিফলনের বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় রেখে কাজ করবেন | |

## সাহিত্য পর্যালোচনা

কর্মসহায়ক গবেষণায় সাহিত্য পর্যালোচনা বলতে গবেষক যে বিষয়ে গবেষণা করছেন, সেই বিষয় বা সমস্যা-সম্পর্কিত পূর্বের গবেষণা প্রতিবেদন, বই, দলিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনাকে বোঝানো হয়। সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে গবেষক নানাভাবে উপকৃত হতে পারেন। যেমন–

- এতে গবেষকের জানাশোনার পরিধি বৃদ্ধি পায়;
- গবেষকের উপলব্ধি ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়;
- গবেষকের নিজস্ব সমস্যাটিকে পূর্বের কর্মসহায়ক গবেষণার সমস্যার সাথে মেলানো সম্ভব হয়। এতে দুটো সমস্যার মিল ও অমিল বের করে সমস্যার পরিসরকে ছোট করে আনা যায়;
- সমস্যাটিকে আরও নির্দিষ্টকরণ বা সুস্পষ্টকরণ করা যায়;
- গবেষককে সঠিকভাবে গবেষণা পরিচালনা করতে সহায়তা করে;
- একই ধরনের গবেষণা যদি আগে হয়ে থাকে, তাহলে ওই গবেষণার ফলাফল নিজস্ব ক্ষেত্রে আগে প্রয়োগ করে দেখা যায়। এতে অনেক সময় গবেষণার পরিসর কমিয়ে আনা সম্ভব হয়;
- গবেষণার উদ্দেশ্য, প্রশ্নমালা ইত্যাদির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়;
- তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত গবেষণা থেকে ধারণা পাওয়া যায়;
- নিজের গবেষণার সীমাবদ্ধতাসমূহ উপলব্ধি করা যায় এবং সর্বোপরি,
- গবেষণার গুণগত মান বাড়াতে সহায়তা করে।

সাহিত্য পর্যালোচনার সময় যেসব প্রতিবেদন, বই বা ডকুমেন্টস পাওয়া যাবে, সেগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে পর্যালোচনা করলে তা থেকে ভালো ফলাফল পাওয়া সম্ভব। যেমন–

**ক. সংশ্লিষ্ট নীতি ও আইন:** একক শিক্ষক বা গবেষক যখন কর্মসহায়ক গবেষণা করেন, তখন তার সাথে দেশের ও বিদ্যালয়ের কতোগুলো নীতিমালা ও আইন সম্পর্কিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিয়ে কোনো গবেষণা করা হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপস্থিতি-সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতিমালা ও আইন পর্যালোচনা করা যেতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর বা সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে বিভিন্ন নির্দেশনা আসে। সেগুলো গবেষণার সাথে সম্পর্কিত হলে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

**খ. তাত্ত্বিক দিক-সম্পর্কিত:** শিক্ষার নানা তাত্ত্বিক দিক রয়েছে। সেগুলোর কিছু কিছু সরাসরি শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগযোগ্য; কিছু কিছু শিক্ষকের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, দলভিত্তিক লেখাপড়ার সুবিধা কী– এই বিষয়টি সম্পর্কে একজন শিক্ষক যদি পূর্বে থেকেই জানতে পারেন, তাহলে কোনো একটি কর্মসহায়ক গবেষণায় তিনি এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করতে পারবেন। এরকম তাত্ত্বিক দিকসমূহ পর্যালোচনা কর্মসহায়ক গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

**গ. বিভিন্ন গবেষণার প্রতিবেদন:** কর্মসহায়ক গবেষণা শেষ করার পর একজন গবেষক কী করলেন, কীভাবে করলেন ইত্যাদি বিষয় নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসারে লেখা হয়ে থাকে। এই প্রতিবেদন লেখার একটি বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে ভবিষ্যতে যদি অন্য কোনো শিক্ষক একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন, তাহলে যেন

তাৎক্ষণিকভাবে উপকৃত হতে পারেন। তাছাড়া প্রতিবেদনটি একজনের শিক্ষকের কাজের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত না হলেও যদি সেখানে আংশিক দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়, তাহলেও গবেষক উপকৃত হতে পারেন। শুধু তাই নয়, শিক্ষা-সম্পর্কিত অন্যান্য গবেষণার প্রতিবেদনও কর্মসহায়ক গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

**ঘ. গবেষণার পদ্ধতিঃ** গবেষক, বিশেষত নবীন গবেষক, প্রায়ই দ্বিধায় থাকেন যে, একটি কর্মসহায়ক গবেষণা কীভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভালোভাবে সম্পন্ন করা যায়। বিভিন্ন গবেষণার পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে একজন গবেষক সেই বিষয়গুলো সহজেই আত্মস্থ করতে পারেন। এতে গবেষক নিজ সমস্যা অনুসারে যেমন পদ্ধতি নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন, তেমনি তিনি দ্রুততম সময়ে গবেষণা কাজটি করতে সক্ষম হবেন। (কড়ংযু, ২০০৫)

**কর্মসহায়ক গবেষণার দ্বিতীয় ধাপঃ বাস্তবায়ন**

কর্মসহায়ক গবেষণায় পরিকল্পনার পরবর্তী ধাপ বাস্তবায়ন। এই ধাপে শিক্ষক তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। তিনি শ্রেণিকক্ষের যে পরিস্থিতিতে সমাধান বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা করেছেন সে অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষে অনুরূপ পরিবেশ তৈরি করবেন। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের দলগত আলোচনায় নিয়োজিত করার পরিকল্পনা করেন, তাহলে শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করবেন বা হতে সহায়তা করবেন, দলের বসার স্থান ঠিক করে দেবেন, দলীয় আলোচনার জন্য নির্ধারিত কাজ বুঝিয়ে দেবেন, দলের কাজের ধারা কী হবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দেবেন, দলীয় কাজ উপস্থাপনার জন্য নির্দেশনা দেবেন, প্রতি ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ করে দেবেন, দলের মধ্যে এবং দলের ভেতরে পারস্পরিক আচরণের নিয়ম জানিয়ে দেবেন।

গবেষককে শ্রেণিকক্ষ পরিবেশে চিহ্নিত সমস্যার নির্বাচিত সমাধান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পদ্ধতিগত কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। যেমন– শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য বক্তৃতা পদ্ধতির পরিবর্তে দলগত আলোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করতে চান তাহলে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো শিক্ষককে বাস্তব দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

- শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত?
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের কী ধরনের বসার ব্যবস্থা রয়েছে?
- শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কয়টি দলে ভাগ করা সম্ভব?
- দলে ভাগ করার পর শিক্ষার্থীদের কীভাবে বসাতে হবে?
- দলে বসার পর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কী কী নির্দেশনা/পরামর্শ দেবেন?
- দলীয় কাজ উপস্থাপনার জন্য পোস্টার পেপার, মার্কার, কলম ইত্যাদি সরবরাহ করা হবে কি?
- দলীয় কাজ করা এবং উপস্থাপন করার জন্য শিক্ষার্থীদের কত সময় দেয়া সম্ভব?
- শিক্ষার্থীরা কীভাবে দলীয় কাজ উপস্থাপন করবে?
- শিক্ষার্থীরা দলীয় কাজ শুরু করার পর শিক্ষকের ভূমিকা কী হবে?
- শিক্ষার্থীদের কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করার পর তা কীভাবে লিপিবদ্ধ করা হবে? অর্থাৎ কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হবে?

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি ক্লাসে হয়তো ৪০ জন শিক্ষার্থী আছে। শিক্ষক ৪০ জন শিক্ষার্থীকে মোট ছয় থেকে সাতটি দলে ভাগ করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই পড়তে না দিয়ে বা বক্তৃতা না দিয়ে তাদের বিষয়টি দলের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন এবং দলীয় কাজের সাফল্য লাভের জন্য প্রতি দলকে দলীয় কাজের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন। দলগত আলোচনার জন্য ১৫-২০ মিনিট সময় বেঁধে দিতে পারেন এবং উপস্থাপনার জন্য আরও ১০ মিনিট সময় দিতে পারেন। শিক্ষক তার পরিকল্পনানুযায়ী একটি সমাধান নির্ধারিত সময় ধরে ব্যবহার করবেন। এরপর প্রয়োজন হলে নতুন সমাধান পরিকল্পনা করবেন।

**কর্মসহায়ক গবেষণার তৃতীয় ধাপঃ পর্যবেক্ষণ**

কর্মসহায়ক গবেষণার ধাপগুলোর তৃতীয় স্থানে রয়েছে পর্যবেক্ষণ। মূলত এই ধাপেই কর্মসহায়ক গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এখানে গবেষক তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে তথ্য সংগ্রহের উপযুক্ত কৌশল প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করেন।

কর্মসহায়ক গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ করা হয় গবেষণার মূল ক্ষেত্র বা সমস্যাটিকে কেন্দ্র করে। যে সমস্যাটি নিয়ে গবেষক কাজ করছেন, ঠিক সেটিকে ফোকাস করে তথ্য সংগ্রহের যাবতীয় কৌশল প্রয়োগ করা হয়। ফলে একক কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করে যেমন তথ্য সংগ্রহ করা যায়, তেমনি সমস্যাটি সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজন অনুসারে একাধিক পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের সুযোগ এ গবেষণায় রয়েছে (O'Brien, 1998)। তথ্য সংগ্রহের জন্য কী কী পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে, কয়টি পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে ইত্যাদি সিদ্ধান্ত গবেষক সমস্যাটির প্রকৃতি অনুসারে গ্রহণ করেন। তবে তথ্য সংগ্রহের কৌশল এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে বিশ্লেষণযোগ্য বা কাজের উপযোগী ও ব্যবহারযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়(Waters-Adams, 2006)।

তথ্য সংগ্রহের পূর্বে কী তথ্য সংগ্রহ করা হবে এবং কেন করা হবে সে সম্পর্কে গবেষকের পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক। পাশাপাশি তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনার সময়ে কীভাবে ও কোন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হবে তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। মনে রাখা প্রয়োজন, কর্মসহায়ক গবেষণার সময়ে ঘটে যাওয়া সমস্ত তথ্যকেই বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করা হয় না কিংবা সমস্ত ঘটনাকেই তথ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয় না; বরং গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত তথ্যগুলো বিশ্লেষণের জন্য বিবেচিত হয়। সুতরাং তথ্য সংগ্রহের সময় প্রয়োজনীয় তথ্যের পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় তথ্যও চলে আসতে পারে। গবেষককে এজন্য বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। অপ্রয়োজনীয় তথ্য যতটুকু সম্ভব কম আনা যায় ততো ভালো। তাতে তথ্য বিশ্লেষণের সময় সহজেই অপ্রয়োজনীয় তথ্য বাদ দেয়া সম্ভব হয়।

**তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা**

তথ্য সংগ্রহের শুরুতে কীভাবে তথ্য নেয়া হবে, কার কাছ থেকে তথ্য নেয়া হবে, কতো সময়ের প্রয়োজন হবে এসব নানা দিক বিবেচনায় নিয়ে তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা করতে হয়। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মূলত দুই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়– (১) পরিমাণগত(quantitative) ও (২) গুণগত (qualitative)। সাধারণত যেসব তথ্যে সংখ্যা থাকে, সেগুলোকে পরিমাণগত তথ্য বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছে, কোন শ্রেণিতে কতোজন শিক্ষার্থী রয়েছে, ক্লাস চলাকালীন শিক্ষার্থীরা কতবার ক্লাসের

বাইরে যায় ইত্যাদি হলো সংখ্যাগত তথ্যের উদাহরণ। নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলোর দ্বারা সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়-

- আদর্শায়িত অভীক্ষা;
- রুব্রিক;
- রেটিং স্কেল;
- বিদ্যালয়ের রেকর্ড বা দলিলপত্র;
- পর্যবেক্ষণমূলক চেকলিস্ট;
- জরিপ ইত্যাদি।

অন্যদিকে যেসব তথ্যকে সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ না করে বরং বর্ণনা আকারে প্রকাশ করা হয়, সেগুলোকে সাধারণভাবে গুণগত তথ্য বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার্থীরা ক্লাসে কীভাবে শিক্ষকের সাথে কথা বলছে, শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি বা বক্তব্য ইত্যাদি গুণগত তথ্যের উদাহরণ। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা যায়-

- সাক্ষাৎকার;
- দলীয় আলোচনা;
- পর্যবেক্ষণ;
- ফিল্ড নোট;
- বিদ্যালয়ের বিভিন্ন রেকর্ড বা ডকুমেন্ট;
- শিক্ষার্থীদের খাতা বা নোট বা ডায়েরি;
- শিক্ষকের খাতা বা নোট বা ডায়েরি;
- অডিও, ফটোগ্রাফিক ও ভিডিও তথ্য ইত্যাদি।

একটি কর্মসহায়ক গবেষণায় কী কী পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হবে, তা চূড়ান্ত করার পূর্বে গবেষক নিজেকে নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহ করতে পারেন। এক্ষেত্রে গবেষক নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করবেন ও সঠিক উত্তর খুজবেন। প্রয়োজনে সহকর্মীদের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তরে সন্তুষ্ট হওয়ার পরই কেবল তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করা যেতে পারে।

ক. এই পদ্ধতিতে যে ধরনের তথ্য আসবে তা কি গবেষণার উদ্দেশ্যের সঙ্গে মানানসই?

খ. সংগৃহীত তথ্য দিয়ে কি গবেষণার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা সম্ভব হবে?

গ. এই পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ কী কী?

ঘ. এই পদ্ধতির চেয়ে অন্য কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করলে তা কি অধিক কার্যকর হতো?

(The Open University, 2005)

**নৈতিক বিষয়াবলি**

প্রতিটি গবেষণাতেই কিছু নৈতিক বিষয়াবলি মেনে চলতে হয়। কর্মসহায়ক গবেষণাতেও কিছু কিছু নৈতিক দিক রয়েছে যা একজন গবেষকের মেনে চলা অবশ্য করণীয়। এসব নৈতিক বিষয়াবলির মধ্যে রয়েছে–

ক. তথ্য সংগ্রহের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ;

খ. তথ্যদাতার পরিচয় গোপন রাখা; এবং

গ. তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখা।

**ক. তথ্য সংগ্রহের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ:** কর্মসহায়ক গবেষণা যদি একজন শিক্ষক দ্বারা সংগঠিত হয়, তবে তথ্য সংগ্রহের পূর্বে গবেষণার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সরাসরি অনুমতি গ্রহণ করা যায়। যদি দুই বা ততোধিক শিক্ষক গবেষণাটি পরিচালনা করেন, সেক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীদের কাছে গবেষণার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে যথাযথভাবে অনুমতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। যে কোনো কর্মসহায়ক গবেষণার ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। সাধারণত শিক্ষার্থী বা যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে তারা তথ্য প্রদান করতে অনীহা প্রকাশ করেন না, কিন্তু গবেষণার স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য ও নৈতিকতার মানদন্ড মেনে চলার জন্য তথ্য সংগ্রহের পূর্বে তথ্যদাতার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করা উচিত।

**খ. তথ্যদাতার পরিচয় গোপন রাখা:** একজন শিক্ষার্থী তথ্যদাতা হিসেবে শিক্ষককে যেসব তথ্য প্রদান করবেন, শিক্ষক সেই তথ্যদাতার পরিচয় অন্যের কাছে প্রকাশ করবেন না। বিশেষ করে, একজন তথ্যদাতার কোনও তথ্য যদি অন্য তথ্যদাতার কাছে প্রকাশের প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে তিনি ছদ্মনাম বা ভিন্ন নাম ব্যবহার করতে পারেন; কিন্তু কোনও অবস্থাতেই তথ্যদাতার পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না। পাশাপাশি তথ্য সংগ্রহের সময় শিক্ষার্থী বা তথ্যদাতার ব্যক্তিগত তথ্য প্রশ্নপত্র বা অন্য কোথাও লিপিবদ্ধ করা যাবে না। বিশেষ করে যেসব তথ্য দিয়ে শিক্ষার্থী বা তথ্যদাতাকে সহজেই চিহ্নিত করা যাবে, সেসব তথ্য কোনোভাবেই উন্মুক্তভাবে লিপিবদ্ধ করা যাবে না। কর্মসহায়ক গবেষণায় গবেষককে এই বিষয়টির দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।

**গ. তথ্যের গোপনীয়তা বজায় রাখা:** তথ্য সংগ্রহের সময় শিক্ষার্থী বা তথ্যদাতা যেসব বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন বা মত প্রদান করেছেন, সেগুলোর গোপনীয়তা বজায় রাখা গবেষকের একান্ত কর্তব্য। কর্মসহায়ক গবেষণা শেষ হওয়ার পর একটি নির্দিষ্ট সময় পর (যেমন, চার বছর) সংগৃহীত তথ্য নষ্ট করে ফেলাই বাঞ্ছনীয়।

**তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া**

কর্মসহায়ক গবেষণায় গবেষক পরিমাণগত বা গুণগত যে কোনও ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। গবেষক কী ধরনের তথ্য সংগ্রহ করবেন তা নির্ধারণ করা হয় তিনি কী সমস্যা সমাধান করতে চাচ্ছেন তার ওপর। তবে অনেক কর্মসহায়ক গবেষণায় উভয় পদ্ধতিতেই তথ্য সংগ্রহ করা যায়। একে মিশ্র পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে গবেষণার উদ্দেশ্য অনুসারে কোনওকোনওক্ষেত্রে পরিমাণগত এবং অপরাপর ক্ষেত্রে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন কৌশল রয়েছে। একজন শিক্ষক গবেষক তার গবেষণার জন্য উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ কৌশল নির্বাচন করবেন। তথ্যপুস্তকের একাধিক অধ্যায়ে বহুল ব্যবহৃত তথ্য সংগ্রহ কৌশলগুলোর কয়েকটি আলোচনা করা হয়েছে।

কর্মসহায়ক গবেষণার তথ্য এমন হবে, যেন তা সমস্যার সমাধান বা অবস্থার উন্নতির জন্য কাজে লাগানো যায়। তথ্য যেখান থেকে সংগ্রহ করা হয় তাই তথ্যের উৎস। গবেষণা সমস্যার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী

তথ্যের উৎস হতে পারে শ্রেণিকক্ষের শিখন শেখানো কার্যাবলি, শিক্ষার্থীর কথোপকথন, পারস্পরিক আচরণ, পাঠ্য বই, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাক্রম, মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি।

**তথ্য সংগ্রহের নীতিমালা**

একজন শিক্ষক-গবেষককে তথ্য সংগ্রহের সময় কিছু বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যেমন– কোন তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন (যিধঃ), কেন এই তথ্য সংগ্রহ করা দরকার (why), কোথা থেকে (যিবৎব), কখন (when)এবং কত সময়ে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব, কে তথ্য সংগ্রহ করবে (who)এবং কীভাবে সংগৃহীত হবে (how)। পাশাপাশি কীভাবে তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করা হবে তাও গবেষকের বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। তথ্য সংগ্রহের পূর্বে শিক্ষক নিম্নের চার্ট অনুসারে পরিকল্পনা করে নিলে তা শিক্ষককে সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে সহায়তা করবে (Jenny and Snyder, 2010)।

| | |
|---|---|
| আপনার গবেষণা-প্রশ্ন বিবৃত করুন। | শিক্ষার্থী ও শ্রেণিকক্ষ পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য ও উপাত্ত চিহ্নিত করুন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, জেন্ডার, শ্রেণি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শহর/গ্রাম প্রভৃতি চিহ্নিত করুন। |
| আপনার নির্ধারিত গবেষণা প্রশ্নটি/গুলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করুন। | শিক্ষার্থীর শিখন অথবা শিক্ষকের দক্ষতার কোন দিকটি আপনার গবেষণা প্রশ্ন নির্ধারণ করতে উৎসাহিত করেছে তা ব্যাখ্যা করুন। |
| বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, গবেষণা প্রবন্ধ, বই, সাহিত্য ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উৎস হতে চিহ্নিত ধারণা ও প্রত্যয়সমূহ লিপিবদ্ধ করুন যা আপনার গবেষণার সাথে ওতপ্রতোভাবে সম্পর্কিত। | প্রয়োজনীয় তথ্যের ধরন, কীভাবে এই তথ্যসমূহ সংগ্রহ করবেন এবং তথ্য সংগ্রহের সময়কাল নির্ধারণ করুন। |
| | সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন। যেমন, গ্রাফ, সারণি, চার্ট, শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার বিবরণ ইত্যাদি যা আপনার গবেষণা প্রশ্নের সর্বোৎকৃষ্ট উত্তর প্রদান করবে। |

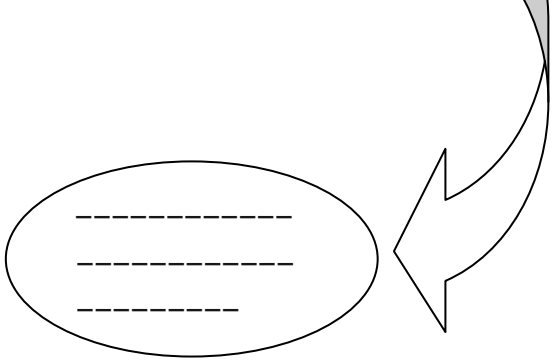

চিত্র ৪.১০: তথ্য সংগ্রহের পূর্ব পরিকল্পনা

**তথ্য সংগ্রহের কৌশল বা পদ্ধতি**

কর্মসহায়ক গবেষণায় বিভিন্ন কৌশল বা পদ্ধতি প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সাধারণভাবে একজন কর্মসহায়ক গবেষক একাধিক কৌশলের সমন্বয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। এখানে প্রাথমিক পর্যায়ের শ্রেণিকক্ষ গবেষণার জন্য উপযুক্ত কৌশলগুলোর কয়েকটি আলোচনা করা হলো।

– **পর্যবেক্ষণ**

কর্মসহায়ক গবেষণায় পর্যবেক্ষণ একটি সাধারণ পদ্ধতি, যা শিক্ষক প্রায়ই ব্যবহার করেন। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর আচরণ শিখনের প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। তাই শ্রেণিকক্ষ বা কর্মসহায়ক গবেষণায় অধিকাংশ সময়ই শিখন-শেখানো কার্যাবলি চলাকালীন শিক্ষার্থীর আচরণ (শিখন শেখানো কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ) পর্যবেক্ষণ করা হয়। এর ওপর ভিত্তি করে শিক্ষক শিখন শেখানো প্রক্রিয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। শিক্ষার্থীদের আচরণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ একটি উপযুক্ত কৌশল। গবেষক কী উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণ করবেন, কোন আচরণ পর্যবেক্ষণ করবেন, কীভাবে, কোথায়, কখন, কত সময় ধরে পর্যবেক্ষণ করবেন, কীভাবেই বা পর্যবেক্ষণকৃত তথ্য সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করবেন এবং সবশেষে পর্যবেক্ষণকৃত তথ্য কী করবেন– এ বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। শ্রেণিকক্ষের গবেষণায় সাধারণত প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, যা সংগঠিত বা অসংগঠিত যেকোনো উপায়ে সংঘটিত হতে পারে। সংগঠিত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য 'পর্যবেক্ষণ চেক লিস্ট' (observation checklist) ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে, অসংগঠিত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে ঘটনা বা আচরণের সবটাই পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং বিস্তারিত নোট নেয়া হয়। এ ধরনের পর্যবেক্ষণ থেকে গুণগত তথ্য আহরণের জন্য উপযুক্ত। এ ক্ষেত্রে সাধারণত 'ফিল্ড নোট' (field note) ব্যবহার করে তথ্য রেকর্ড করা হয়। এ ক্ষেত্রে গবেষক তাৎক্ষণিকভাবে সংঘটিত আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। এ ছাড়া গবেষক পর্যবেক্ষণের সময় তার অনুভূতি বা মন্তব্য বিবৃত করেন।

– **সাক্ষাৎকার**

সাক্ষাৎকার হলো ব্যক্তির (গবেষক এবং অংশগ্রহণকারী) মধ্যে কথোপকথন। এই কথোপকথন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অনুযায়ী সংঘটিত হয় এবং সাক্ষাৎকার উদ্দেশ্যবিহীন বা এলোমেলো হওয়া উচিত নয়। গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী সাক্ষাৎকার কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমন, কাঠামোবদ্ধ ও উন্মুক্ত কিংবা আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ইত্যাদি। কাঠোমোবদ্ধ সাক্ষাৎকারে গবেষক কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। অন্যদিকে উন্মুক্ত সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকার দানকারীর মত প্রকাশের সুযোগ থাকে।

অপরদিকে, আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সাক্ষাৎকারের স্থান, বিষয়, সময় সবই পূর্বনির্ধারিত। এ ধরনের সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার ব্যবহার করা হয়। অনানুষ্ঠানিক

সাক্ষাৎকারের মূলে রয়েছে নমনীয়তা। গবেষক এবং অংশগ্রহণকারী উভয়ই নমনীয়। এক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের সুযোগ রয়েছে। তবে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদি বা সময় বেশি লাগে।

– **প্রশ্নমালা**

কর্মসহায়ক গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা (questionnaire) একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল ব্যবহৃত কৌশল বা পদ্ধতি। শিক্ষক-শিক্ষার্থী বা অংশগ্রহণকারীর কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রশ্নের সমন্বয়ে যে উপকরণ তৈরি করা হয় তাকে প্রশ্নমালা বলা হয়। প্রশ্নমালা অপেক্ষাকৃত সাশ্রয়ী এবং একটি জনপ্রিয় তথ্য সংগ্রহ কৌশল। প্রশ্নমালা সহজেই প্রায় সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ করার কাজে ব্যবহার করা যায়। তবে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী প্রশ্নমালার ধরন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।প্রশ্নের ধরনের ওপর ভিত্তি করে প্রশ্নমালাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

ক. নির্দিষ্ট উত্তরমূলক প্রশ্নমালা (closed questions)
খ. উন্মুক্ত প্রশ্নমালা (open-ended questions)
গ. মিশ্র প্রশ্নমালা (mixed questions)

– **ফিল্ড নোট**

একজন গবেষক গবেষণা চলাকালীন তাঁর নোট বইতে যা কিছু টুকে রাখেন সেটিই তাঁর ফিল্ড নোট। যে কোনো গবেষকের বিশেষত কর্মসহায়ক গবেষণার জন্য ফিল্ড নোট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গবেষক যখন পর্যবেক্ষণ করেন বা সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করেন, তখনও ফিল্ড নোট নানাভাবে গবেষককে সহায়তা করে। সুতরাং, ফিল্ড নোটের মাধ্যমে যেমন তথ্য সংগ্রহ করা যায় তেমনি অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতিতেও ফিল্ড নোট সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কোনো কোনো গবেষক কাজ চলাকালীন তথ্য বা নোট তাঁর ডায়েরিতে টুকে নেন। অপরদিকে কোনো কোনো গবেষক সারাদিন কাজ শেষে প্রয়োজনীয় নোট লিপিবদ্ধ করেন। একটি ফিল্ড নোটের উদ্দেশ্য হচ্ছে গবেষক যে যে বিষয় নিয়ে কাজ করছেন সেগুলো সংরক্ষণ করা যাতে পরবর্তীকালে তিনি সেগুলোর সাহায্যে তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারেন ও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে পারেন।

ফিল্ড নোটে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে:

- তারিখ-সংক্রান্ত উপাত্ত (দিন, মাস, বছর ইত্যাদি)
- সময়-সংক্রান্ত উপাত্ত (কখন শুরু হয়েছে, বিরতি, শেষে হয়েছে কখন, কে কতক্ষণ কাজ করেছ ইত্যাদি)
- স্থান-সংক্রান্ত উপাত্ত (দেশের নাম, তথ্য সংগ্রহের স্থান, নিকটবর্তী বিদ্যালয় ইত্যাদি)
- অবস্থা ও অবস্থানগত উপাত্ত (নির্দিষ্ট পরিবেশ আছে কিনা, মানচিত্র ইত্যাদি)
- মন্তব্য (কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষকের তাৎক্ষণিক অনুভূতি বা মন্তব্য)

**কর্মসহায়ক গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ**

তথ্য সংগ্রহের পরের কাজ হচ্ছে তথ্য যাচাই-বাছাই করা এবং উপাত্ত বিশ্লেষণ (data analysis)করা। উপাত্ত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উপাত্ত কী নির্দেশ করছে তা বুঝতে চেষ্টা করা হয়। McNiff (১৯৯৫)-এর ভাষায়, তথ্য

বা উপাত্ত বিশ্লেষণ মানে making sense of data'। উপাত্ত বা তথ্য বিশ্লেষণ একটি জটিল কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত প্রক্রিয়া।

একজন শিক্ষক তাঁর শ্রেণির ৪৫ জন শিক্ষার্থীর নাম, প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর সংগ্রহ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কত ভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ বা অনুত্তীর্ণ হয়েছে। যারা অনুত্তীর্ণ হয়েছে তাদের কারণ জানা এবং পরবর্তী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সাহায্য করা। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে লব্ধ তথ্য সারণি ৪.৪-এর মতো করে সাজালেন (মুত্তাকী ও বেগম, ২০০৮, পৃ. ৯৫)। এখান থেকে দেখতে পেলেন কতজন শিক্ষার্থী অনুত্তীর্ণ হয়েছে এবং অনুত্তীর্ণদের মধ্যে কারা বেশি ও কেন? এই অনুত্তীর্ণ ছেলে বা মেয়েদের সংখ্যা কী নির্দেশ করছে? শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার মান, জেন্ডারের পার্থক্য নাকি অন্য কিছু? এসব আনুষঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দেয়ার যে প্রক্রিয়া তাই তথ্য বিশ্লেষণের ফল।

সারণি ৪.৪: প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর

| শিক্ষার্থী | পরীক্ষার নম্বর | | মোট |
|---|---|---|---|
| | উত্তীর্ণ | অনুত্তীর্ণ | |
| ছেলে | ১৯ | ০৬ | ২৫ |
| মেয়ে | ১৪ | ০৬ | ২০ |
| মোট | ৩৩ | ১২ | ৪৫ |

**গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ**

আমরা জানি, কর্মসহায়ক গবেষণায় দুই ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। গুণগত এবং পরিমাণগত তথ্য। তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতিকেও দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ (য়ঁধহঃরঃধঃরাব ফধঃধ ধহধষুংরং)এবং অপরটি পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ (য়ঁধষরঃধঃরাব ফধঃধ ধহধষুংরং)। বলা হয়ে থাকে, কর্মসহায়ক গবেষণার অধিকাংশ উপাত্তই গুণগত। তাই প্রথমে গুণগত এবং পরে সাংখ্যিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

– **গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ**

গুণগত উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য যে টেক্স, বর্ণনা, শব্দ বাক্য লিপিবদ্ধ করা হয় তা বার বার পাঠ করা হয়। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত করে বিভিন্ন আচরণ বা ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নিরূপণ করা হয়, যা গবেষণাধীন ঘটনা বা আচরণ সম্পর্কে অর্থপূর্ণ ধারণা প্রদান করে। MilesGes Huberman (১৯৯৪)-এর মতে, প্রথমত গুণগত তথ্য বাছাই করা, সংশ্লিষ্ট নয় এমন তথ্য বাদ দেয়া, তথ্য সংগঠিত করে উপস্থাপন করা এবং উপসংহার টানা।

তথ্য বিশ্লেষণের সময় সংগৃহীত তথ্য বার বার পাঠ করে সেখান থেকে তথ্যের শ্রেণিবিভাগ করা বা থিম চিহ্নিত করা হয়। প্রতিটি থিম কয়েকটি শ্রেণি নিয়ে সংঘটিত হতে পারে। অতঃপর চিহ্নিত থিমসমূহ বাস্তবতা এবং অন্যান্য তথ্যের আলোকে ব্যখ্যা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর মনোযোগহীনতা নিয়ে কোনো গবেষণা করা হলে যদি শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের উত্তদাতার (যেমন,

শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ইত্যাদি) কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়, তাহলে তাদের সবার এই বিষয়ের উত্তর বা তথ্যসমূহ এক জায়গায় জড়ো করে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। তাতে একনজরে শিক্ষার্থীর লেখাপড়া বিষয়ে কে কী তথ্য দিচ্ছেন বা বলেছেন তা জানা ও সে অনুসারে তথ্য বিশ্লেষণ করা সহজতর হয়।

– **পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ**

পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ফ্রিকোয়েন্সি গণনা, শতকরা হার নির্ণয় থেকে শুরু করে অনেক জটিলতর কৌশল ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের বিশ্লেষণ কৌশল (যেমন–পরিসংখ্যান) সুনির্দিষ্ট এবং গবেষকের পরিবর্তন করার সুযোগ নেই। বর্ণনামূলক পরিসংখ্যাতা এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গড়, আদর্শ বিচ্যুতি, সহ-সম্পর্ক ইত্যাদি। এ ছাড়া গ্রাফ বা লেখচিত্রের মাধ্যমের সাংখ্যিক উপাত্তের বিশ্লেষণ দেখানো হয়।

প্রতিটি সাংখ্যিক বিশ্লেষণের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমন–গড় মান বা আদর্শ বিচ্যুতির অর্থ সব ক্ষেত্রে একই। কর্মসহায়ক গবেষক কোনো বিষয়ে, যেমন–শ্রেণির শিক্ষার্থী দলের পারফরম্যান্স সার্বিক ধারণা লাভের জন্য সাংখ্যিক বিশ্লেষণের সাহায্য নিতে পারেন। তবে কোনো বিষয়ের নিগূঢ় অর্থ বা ব্যাখ্যা জানার জন্য কর্মসহায়ক গবেষককে অবশ্যই গুণগত তথ্য/উপাত্ত ও এর বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করতে হয়। উপাত্ত বিশ্লেষণের সময় গবেষককে নিচের প্রশ্নগুলো বিবেচনায় রাখতে হবে:

- তথ্যে বা উপাত্তের প্রকৃতি কেমন? বর্ণনামূলক বা গুণগত নাকি পরিমাণগত?
- কোনো নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তরের জন্য কোন কৌশল ব্যবহার করা দরকার?
- নির্বাচিত কৌশল বা পদ্ধতি নির্দিষ্ট গবেষণা প্রশ্নের উত্তরদানের জন্য যথেষ্ট কি?
- এ কৌশলের কোনো সীমাবদ্ধতা আছে কি?
- উপাত্ত বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল কি গবেষণার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট?
- আরো তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন আছে কি?
- প্রাপ্ত তথ্য পুনর্বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে কি?
- উপাত্ত বিশ্লেষণের ব্যবহৃত পদ্ধতি বা কৌশল ফলাফলের সত্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কি?

গবেষণার সময় শিক্ষকের মনে রাখা প্রয়োজন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই তথ্য একাধিক জায়গা বা একাধিক উত্তরদাতার কাছ থেকে সংগ্রহ করার প্রয়োজন হতে পারে। কারণ, অনেক সময় কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা একজন নির্দিষ্ট উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হলে তা গবেষককে পূর্ণাঙ্গ চিত্র নাও দিতে পারে। অপরদিকে, একাধিক পদ্ধতির মাধ্যমে ও একাধিক উত্তরদাতার কাছ থেকে একই তথ্য সংগ্রহ করা হলে তা তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়। তথ্যটুকু যে শুদ্ধ ও এতে বাস্তব অবস্থা ফুটে উঠেছে– এটি নিশ্চিত করতে হবে তথ্য সংগ্রহের সময়।

## কর্মসহায়ক গবেষণার চতুর্থ ধাপ: প্রতিফলন

কর্মসহায়ক গবেষণায় তথ্য বিশ্লেষণের পরবর্তী কাজ এবং সর্বশেষ ধাপ হলো প্রতিফলন।প্রতিফলন প্রক্রিয়ায় গবেষক গবেষণার কাজের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন। তথ্য বিশ্লেষণের পর গবেষক প্রয়োগকৃত পুরো প্রক্রিয়াটির প্রতিফলন করবেন। বিশ্লেষণকৃত তথ্য কী নির্দেশ করছে, সমস্যাটি যেভাবে সমাধান করতে বলা

হচ্ছে তা কতোটুকু উপযুক্ত বা যথার্থ ইত্যাদি নানা বিষয় গবেষক বুঝতে চেষ্টা করেন। পাশাপাশি বাস্তব সুবিধা ও অসুবিধাও চিহ্নিত করা হয় এই ধাপে। পরিশেষে কর্মসহায়ক গবেষক উদ্দেশ্য অর্জনে তার পরিকল্পনা/ধারণা এবং এর বাস্তবায়ন কতটা কার্যকর হয়েছে বা হচ্ছে তা যাচাই করা হয়। প্রয়োজন হলে গবেষক তাঁর চিহ্নিত সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধানের জন্য পুনরায় পরিকল্পনা করবেন এবং নতুন পরিকল্পনা অনুসারে আগের ধাপগুলোর কাজ পুনরায় করবেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত একটি সন্তোষজনক সমাধানে তিনি পৌঁছান। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, প্রতিফলন গবেষককে নিজ কাজের বিশ্বাসযোগ্যতা বিচারপূর্বক পরবর্তী পদক্ষেপের দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

অনেক সময় দেখা যায়, একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষক যে উপসংহারে পৌঁছালেন এবং সেটি প্রয়োগ করলেন তা ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত ও স্থায়ী সমাধান দিতে পারছে না। অপরদিকে, এটাও দেখা যায় যে, কর্মসহায়ক গবেষণা থেকে সমস্যার আংশিক সমাধান করা যাচ্ছে কিংবা যে পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে, তা নতুন আরেকটি সমস্যা সৃষ্টি করছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই গবেষককে পুনরায় কর্মসহায়ক গবেষণার ধাপগুলো পুনরাবৃত্তি করতে হবে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা নিশ্চিত করার জন্য দলীয় আলোচনা প্রয়োগ করলেন। কাজেই এখানে শিক্ষকের লক্ষ্য হচ্ছে দলগত আলোচনায় নিয়োজিত হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না সেটি পর্যবেক্ষণ করা এবং যদি ইতিবাচক ফল পাওয়া যায়, তাহলে সেটি নিয়মিত ব্যবহার করা। তিনি বেশ কয়েকদিন দলগত আলোচনা পর্যবেক্ষণ করলেন এবং তাঁর নোট বই থেকে দেখা গেল যে, শিক্ষার্থীরা বেশ সক্রিয়ভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে। এই তথ্য থেকে বলা যেতে পারে যে, শুধু বক্তৃতার চেয়ে দলগত আলোচনা শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করে। অর্থাৎ সক্রিয়তার জন্য দলগত আলোচনা পদ্ধতিটি অধিক কার্যকর।

কিন্তু শিক্ষকের ফিল্ড নোটের এক জায়গায় লেখা আছে, পাঁচটি দলের তিনটিতে কিছু কিছু শিক্ষার্থী আলোচনার অধিকাংশ সময়ই নিষ্ক্রিয় থেকেছে। তাদের নিষ্প্রভ মনে হয়েছে বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিতে দেখা যায়নি। এ ক্ষেত্রে গবেষক নিজেকে প্রশ্ন করতে পারেন- এই নীরবতার কারণ কী? শিক্ষার্থীরা কি লাজুক, দ্বিধান্বিত, চিন্তায় জড়তা, নাকি প্রথম অভিজ্ঞতা? নাকি নির্দেশনায় অসম্পূর্ণতা? শিক্ষকের এই যে প্রশ্ন সেটিই হচ্ছে প্রতিফলন। এই প্রতিফলনের কারণে শিক্ষক পরবর্তী দলগত আলোচনাগুলোতে যেসব শিক্ষার্থী আলোচনায় নিষ্ক্রিয় থাকে, তাদেরকে কীভাবে সক্রিয় করা যেতে পারে, সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবেন। প্রয়োজনে সব শিক্ষার্থীকে একসাথে সক্রিয় করার জন্য নতুন কোনো পন্থা উদ্ভাবন করবেন।

এছাড়া শিক্ষকের নোট বইতে এটিও লেখা আছে যে, দলীয় আলোচনার সময় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর সাথে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনাও চলে এসেছে। শিক্ষকের প্রশ্ন– কেন? এর কী কারণ রয়েছে? এ বিষয়গুলো কি পুনরায় পরীক্ষা করা প্রয়োজন? নাকি অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা মাঝেমধ্যে দলকে একঘেয়েমি থেকে রেহাই দেয়? শিক্ষক যদি নিজেকে এসব প্রশ্ন করেন, তাহলে প্রতিফলন অংশে সম্ভাব্য বাধাগুলো দূর করা সম্ভব হয় এবং গবেষণার ফলাফলটিকে স্থায়ী ও কার্যকর করা যায়।

উপরের উদাহরণ থেকে দেখা গেল যে, গবেষক কীভাবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অংশে তাঁর কাজের ওপর প্রতিফলন করেছেন এবং এই প্রতিফলন তাকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। প্রতিফলন ও

মূল্যায়ন সব সময়ই কর্মসহায়ক গবেষণার একটি অংশ। প্রতিফলন প্রক্রিয়ার সাথে মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট। প্রতিফলন শেষে গবেষক কোনো কার্যাবলির ভালো-মন্দ বিচার করেন এবং পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কোনো কার্যের ভালো-মন্দ সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়াই মূল্যায়ন। কর্মসহায়ক গবেষণায় একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে (যেমন– সপ্তাহ, মাস ইত্যাদি) একটি চক্র চলতে পারে। গবেষক প্রতিফলন ও মূল্যায়ন ধাপে যে সমস্যা চিহ্নিত করবেন তা ক্রমান্বয়ে দূর করার চেষ্টা করতে পারেন তার দৈনন্দিন পরিকল্পনায় রদবদল করে।

মনে রাখা প্রয়োজন, এই মূল্যায়ন শুধু যে সর্বশেষ ধাপে এসে করতে হবে তা নয়; বরং পরিকল্পনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপেই স্ব-মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিক্ষক নিজেকে প্রশ্ন করবেন– আমি যেভাবে কাজটি করছি, তা যথাযথ কি? এতে নতুন কী সমস্যা হতে পারে? এসব প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর গবেষণাটিকে আরও কার্যকর করে তুলতে পারেন। যদি কোনো সীমাবদ্ধতার কারণে বা নতুন হওয়ায় গবেষক নিজে নিজেকে মূল্যায়ন না করতে পারেন, সেক্ষেত্র সহশিক্ষকদের সহায়তা করতে পারেন। কর্মসহায়ক গবেষণাকে আরও কার্যকর করতে একাধিক শিক্ষক মিলে গবেষণা করতে পারেন, তাহলে পারস্পরিক আলোচনা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে গবেষণায় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে ও গবেষণার ফলাফল হবে অধিক কার্যকর ও স্থায়ী।

প্রতিটি ধাপ বা চক্রেও আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। একটি চক্র (মনে করুন চার সপ্তাহের) শেষ হলে শিক্ষক দ্বিতীয় চক্র (আরো চার সপ্তাহ) শুরু করতে পারেন। দ্বিতীয়টিতে একইভাবে প্রতিটি ধাপ তিনি অতিক্রম করবেন এবং প্রয়োজন হলে তিনি গবেষণার তৃতীয় চক্রও পরিচালনা করতে পারেন। প্রতি চক্রে গবেষণার ফোকাস বা সমস্যা ভিন্ন হতে পারে। প্রথম চক্রের শেষে যে সমস্যা দেখা দেবে তা দ্বিতীয় চক্রের ফোকাস হবে; আবার দ্বিতীয় চক্রের শেষে যে সমস্যা দেখা দেবে তা তৃতীয় চক্রে সমাধানের প্রয়াস পাবেন শিক্ষক। প্রতিটি চক্র নতুন সমস্যা নিয়ে ধাপগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এ জন্য চক্রগুলো সর্পিলাকারে একটির সাথে অপরটি সম্পর্কিত (Stuart, 1994)। শিক্ষক যদি মনে করেন একটি ধাপে কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে, তাহলে প্রয়োজনে তিনি পূর্বের ধাপের মূল্যায়ন করে সেখানে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে পুনরায় বর্তমান ধাপে ফেরত আসতে পারেন। মনে রাখা দরকার, কর্মসহায়ক গবেষণায় প্রচলিত গবেষণার মতো দৃঢ়তা (ৎরমরফরঃু) দেখানোর সুযোগ নেই, বরং সমস্যাটির সমাধান করা এখানে মূল বিবেচ্য বিষয়।

প্রথমিক স্তরের শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট অন্য কর্মকান্ডে তাদের নিজ পেশার উন্নয়নের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণা কৌশল প্রয়োগ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। পেশাগত অনুশীলনের সময় উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করে কাজের উৎকর্ষ সাধনের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং উপযুক্ত কৌশল। গবেষণার কাজ সাবলীল এবং ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য এসব ধাপ চক্রাকারে সমন্বয় সাধন করে যথাযথ পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।

**কর্মসহায়ক গবেষণার প্রতিবেদন প্রণয়ন**

কর্মসহায়ক গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে গেলে তা উপস্থাপন ও প্রকাশ করা গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গবেষককে প্রতিবেদন তৈরির সময় সবসময়ই মনে রাখতে হবে যে, কর্মসহায়ক গবেষণার মূল উদ্দেশ্য তাঁর ফলাফলের সাধারণীকরণ করা নয়; বরং একটি নির্দিষ্ট সমস্যাকে কীভাবে গবেষণার আলোকে সমাধান করা হয়েছে, সেটি অন্যদের যথাসম্ভব সহজ উপায়ে জানানো। এতে অন্য শিক্ষকবৃন্দ,

বিশেষ করে যারা একই ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করছেন, তাঁরা উক্ত গবেষণার সমাধান তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে পারবেন।

কর্মসহায়ক গবেষণা শুরুর পূর্বে যেমন গবেষণা প্রস্তাবনা প্রণয়ন করতে হয়, তেমনি গবেষণা শেষ করার পরও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা আবশ্যক। তবে প্রতিবেদন প্রণয়নের পূর্বে নিচের দুটো প্রশ্নের উত্তর গবেষকের নিজের জানা থাকা আবশ্যক–

ক. গবেষণার প্রতিবেদনটি কার জন্য তৈরি করা হচ্ছে?

খ. গবেষণা প্রতিবেদনের জন্য গবেষকের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্দিষ্ট কোনও গাইডলাইন বা ফরম্যাট রয়েছে কি?

উক্ত দুটো প্রশ্নের উত্তরের ওপর নির্ভর করবে গবেষণার প্রতিবেদনটি কীরকম হওয়া উচিত। তবে গবেষণার প্রতিবেদন যেহেতু আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়, তাই প্রতিবেদন প্রণয়নের যেসব স্বীকৃত কাঠামো রয়েছে, সেগুলো অনুসরণ করেই প্রতিবেদন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। একটি গবেষণা প্রতিবেদনের মূল অংশে কী কী থাকে তা নিচের চিত্র থেকে দেখা যেতে পারে। এটি একটি উদাহরণ মাত্র, একেক প্রতিষ্ঠানের কাঠমো একেক রকম হতে পারে।

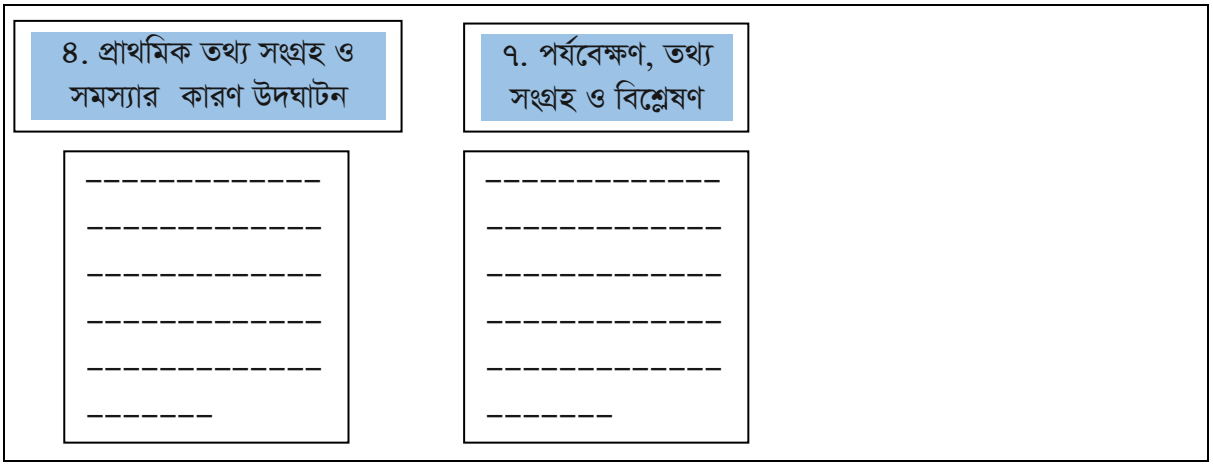


চিত্র ৪.১১: গবেষণা প্রতিবেদনের লে-আউট

তবে শিক্ষকের বা গবেষকের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিবেদন লেখার নির্দিষ্ট কোনো গাইডলাইন বা ফরম্যাট না থাকলে একটি কর্মসহায়ক গবেষণার প্রতিবেদনে নিচের বিষয়গুলো থাকতে পারে।

**প্রথম পৃষ্ঠা**

গবেষণার শিরোনাম, গবেষকের নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম, প্রতিবেদন প্রণয়নের তারিখ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ থাকবে।

**সূচিপত্র**

প্রথম অংশে অধ্যায় ও প্রতিটি অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর মূল শিরোণামসমূহ পৃষ্ঠা নম্বরসহ উল্লেখ করতে হবে।

দ্বিতীয় অংশে সারণি ও চিত্রের একটি তালিকা পৃষ্ঠা নম্বরসহ উল্লেখ করতে হবে।।

**সমস্যার বিবরণ**

গবেষণার মূল সমস্যাটিকে কেন্দ্র করে সমস্যাটির বর্ণনা, সমস্যার উৎপত্তি, সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াবলির বর্ণনা ও বিশ্লেষণ থাকে। সমস্যাটির ব্যাপ্তি বিবেচনা করে ভূমিকা অংশটি কত বড় হবে তা নির্ধারণ করা হয়। তবে কর্মসহায়ক গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্য কী, তা এই অংশে থাকতে হবে।

গবেষক যে বিষয়ে গবেষণা করছেন বা যে সমস্যাটি দূর করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সে বিষয়ে যদি অন্য কেউ পূর্বে কাজ করে থাকেন, তাহলে সেগুলোর গবেষকের ধারণা ও চিন্তাকে আরো পরিষ্কার ও সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে। সেকারণে কোন একটি গবেষণা কর্মের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত গবেষণা সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট সাহিত্য, বই, গবেষণা প্রতিবেদন, গবেষণা প্রবন্ধ ও অন্যান্য ডকুমেন্টসমূহ পর্যালোচনা করা দরকার। সমস্যার বিবরণ প্রদানের ক্ষেত্রে কিংবা সম্ভাব্য সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সাহিত্যসমূহ সহায়তা করতে পারে।

**প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ ও সমস্যার কারণ উদঘাটন**

কর্মসহায়ক গবেষণায় নির্বাচিত সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বেই সমস্যাটিকে পরিপূর্ণভাবে বোঝার জন্য সমস্যাসম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা জরুরি। এটি আপনাকে সমস্যাটিকে বুঝতে, সমস্যার

গভীরে প্রবেশ করতে এবং সমস্যার কারণসমূহ উদ্ঘাটন করতে সাহায্য করবে। এজন্য দরকার সমস্যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ক্ষেত্র হতে বাস্তবভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ। এক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি আপনার অভিজ্ঞতা ও সংশ্লিষ্ট সাহিত্যসমূহ সহায়তা করবে।

**পরিকল্পনা প্রণয়ন**

কর্মসহায়ক গবেষণায় একটি বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। গবেষক নির্বাচিত সমস্যাটিকে কীভাবে অনুসন্ধান করবেন, সমস্যা সমাধানের জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, তথ্য অনুসন্ধানের পদ্ধতিসমূহ কী কী হবে, সেখানে কতজনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে, তথ্যসমূহ কীভাবে বিশ্লেষণ করা হবে ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ থাকবে এই অংশে। তাছাড়া গবেষক কোন কাজটি কবে ও কখন করবেন, কতজনের সাথে সম্পন্ন করবেন, এক্ষেত্রে কার নিকট হতে কী সহায়তা নিবেন তাও উল্লেখ থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে গবেষণার পরিকল্পনাটি অবশ্যই নিজ নিজ প্রেক্ষাপট সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবসম্মত হতে হবে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী গবেষণা ও সংশ্লিষ্ট সাহিত্যসমূহের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

**পরিকল্পনা বাস্তবায়ন**

পূর্বের ধাপেই গবেষক বর্ণনা করেছেন তিনি গবেষণা কাজটি কীভাবে সম্পাদন করবেন। এই ধাপে গবেষণা তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি কাজ কীভাবে বাস্তবায়ন করেছেন তা বর্ণনা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, অনেকক্ষেত্রে গবেষক তাঁর পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বাঁধার সম্মুখীন হতে পারেন। সেক্ষেত্রে এই ধাপে গবেষক তাঁর সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ উল্লেখ করবেন। নির্ধারিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কোনোরূপ পরিবর্তন বা পরিমার্জন প্রয়োজন হয়েছে কি-না তাও উল্লেখ করবেন।

**পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ**

কোনো সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করলে প্রচলিত প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন আসা শুরু করে যা গবেষকের বোঝা অত্যন্ত জরুরি। আর কর্মসহায়ক গবেষণার একটি উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্যই হলো বাস্তব প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন আনার মাধ্যমে বিরাজমান সমস্যার সমাধান করা। এজন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের সাথে সাথে প্রচলিত প্রেক্ষাপটে কী পরিবর্তন হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই পরিবর্তন যে শুধু গবেষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই বুঝতে পারবেন তা নয়, এর পাশাপাশি সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও (যেমন- শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শ্রেণিকক্ষ প্রভৃতি) তা অনুধাবন করতে পারবেন। তাই গবেষক নিজের পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হতেও আলোচনা বা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করবেন।

এই ধাপে গবেষক কার কার নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং সংগৃহীত তথ্য কীভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা বর্ণনা করতে হবে। এছাড়া বিশ্লেষণকৃত তথ্য সারণি বা চিত্রের (গ্রাফ) মাধ্যমে উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, গবেষণার যাবতীয় ফলাফল এই অধ্যায়ে দিতে হবে। যেসব ফলাফল সরাসরি গবেষণার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, শুধু সেগুলোই এই অধ্যায়ে থাকবে।গবেষণার ব্যাপ্তি বিচারে এই অধ্যায়টিকে একাধিক ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

**প্রতিফলন**

কর্মসহায়ক গবেষণায় প্রতিফলন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর মাধ্যমে গবেষক বুঝতে পারেন যে, তিনি যে সমস্যা সমাধানের জন্য যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা সমস্যা সমাধানে কতটা ভূমিকা রেখেছে বা সমস্যাটির সমাধান হয়েছে কি-না। এই ধাপে গবেষক সমস্যার শুরুর অবস্থা এবং সমাধানের জন্য গৃহীত

পদক্ষেপের ফলে পরিবর্তিত বর্তমান অবস্থার মধ্যে একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরবেন। এই তুলনামূলক চিত্র হতে নির্বচিত সমস্যাটি কতটুকু সমাধান করতে পেরেছেন, কেনইবা পুরোপুরি সমাধান করতে পারেননি এবং সমস্যাটি সমাধানের জন্য আরও কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার কি-না তা চিহ্নিত করবেন। এই ধাপে নির্বাচিত সমস্যাটি পুরোপুরি সমাধানের জন্য গবেষক যদি পরবর্তী কোনো গবেষণা চক্রে নিয়োজিত হতে চান তারও একটি দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

**রেফারেন্স**

গবেষণাটি করার সময় গবেষক যেসব বই, প্রতিবেদন, দলিল, ওয়েব সাইট ইত্যাদি থেকে ধারণা বা তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সেগুলোর তালিকা রেফারেন্স হিসেবে দেয়া হয়।নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করে এই রেফারেন্স দিতে হবে।

**পরিশিষ্ট**

প্রতিবেদনে প্রদত্ত তথ্য ও উপাত্তের বাইরেও যদি এমন কিছু তথ্য, উপাত্ত, বিষয়, ছবি ইত্যাদি থেকে যায় যা পাঠকের জানার প্রয়োজন কিংবা গবেষক পাঠককে জানাতে চান, সেগুলো পরিশিষ্টে দেয়া হয়। সাধারণত গবেষক কী কী প্রশ্নোত্তর ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করলেন, তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ের ছবি ইত্যাদি বিষয়াদি পরিশিষ্টে থাকে।

**কর্মসহায়ক গবেষণা প্রতিবেদন এর নমুনা**

**শিরোনাম**

**চতুর্থ শ্রেণির চারজন শিক্ষার্থীর বাংলা গদ্য পাঠে শুদ্ধ উচ্চারণ করতে না পারার কারণ ও তার প্রতিকার**


**গবেষক**
নাম:.....
শ্রেণি রোল:.....
শিক্ষাবর্ষ: .....
প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট
লক্ষ্মীপুর।

**তত্ত্বাবধায়ক**
নাম:.....
ইনস্ট্রাক্টর (সাধারণ)
প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট
লক্ষ্মীপুর।


২০১৭

**গবেষণার শিরোনাম**

চতুর্থ শ্রেণির চারজন শিক্ষার্থীর বাংলা গদ্য পাঠে শুদ্ধ উচ্চারণ করতে না পারার কারণ ও তার প্রতিকার

## সমস্যার বিবরণ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাংলা শুদ্ধ উচ্চারণ করতে না পারার বিষয়টি ইতঃপূর্বে আমি আমার অনেক সহকর্মীর কাছ থেকে অবগত হয়েছি। শিক্ষার্থীদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য সহকর্মীগণ বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কিন্তু আশানুরূপ ফল পাননি  বিধায় তাদের মধ্যে শিক্ষার্থীদের শুদ্ধ উচ্চারণে বাংলা পড়তে না পারার বিষটি নিয়ে একধরনের হতাশা কাজ করছে।

ঠিক একই রকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই যখন আমি মধ্যবাঞ্জারামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্সের অংশ হিসেবে অনুশীলনী পাঠ পরিচালনা করি। এই বিদ্যালয়ে আমি চতুর্থ শ্রেণির বাংলা বিষয়ের ওপর পাঠ পরিচালনা করি। পাঠ উপস্থাপন ও পরিচালনা করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে যেসকল সমস্যার মুখোমুখি হই সেগুলোর মধ্যে শিক্ষার্থীদের বাংলা শুদ্ধ উচ্চারণ করতে না পারার বিষয়টি ছিল বেশ প্রকট। গুরুত্ব বিচারে এই সমস্যাটিকেই আমি কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে দ্রুত সমাধান করার চেষ্টা করি।

প্রকৃত পক্ষে, শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ের বেইজলাইন মূল্যায়নের সময় এবং পরবর্তীতে পাঠ উপস্থাপন করতে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করি যে, ৪৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ২০ জন শিক্ষার্থীরই শুদ্ধ উচ্চারণে বাংলা পড়তে সমস্যা হয়। এই শিক্ষার্থীদের শুদ্ধ উচ্চারণে বাংলা পড়তে না পারার কারণ অনুসন্ধান করা এবং কীভাবে তাদেরকে সমস্যাটি থেকে উত্তরণ করা যায়–সেটিই আমার গবেষণার মূল লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করি। এই গবেষণার জন্য আমি উদ্দেশ্যগুলো নির্ধারণ করেছি:

- শনাক্তকৃত শিক্ষার্থীদের বাংলা পাঠে শুদ্ধ উচ্চারণ করতে না পারার কারণ অনুসন্ধান করা;
- শনাক্তকৃত শিক্ষার্থীদের বাংলা গদ্য পাঠে শুদ্ধ উচ্চারণ করার প্রতি আগ্রহী ও মনোযোগী করে তোলা;
- কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে শনাক্তকৃত শিক্ষার্থীদের বাংলা গদ্য পাঠে শুদ্ধ উচ্চারণ শেখানো;

## প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ ও সমস্যার কারণ উদঘাটন

প্রাথমিক পর্যায়ে সমস্যার কারণ উদঘাটনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। আমার পর্যবেক্ষণটি কতটুকু সঠিক সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরবর্তী কয়েকটি ক্লাসে তাদেরকে কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি এবং তাদের সমস্যার মূল জায়গাসমূহ চিহ্নিত করার চেষ্টা করি। পাশাপাশি তৃতীয় শ্রেণিতে যে শিক্ষক তাদেরকে বাংলা বিষয়টি পড়াতেন, তাঁর সঙ্গেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে নিশ্চিত হই যে– শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীদের তুলনায় চারজন শিক্ষার্থীর সমস্যা অনেক তীব্র যা দ্রুত সংশোধন করা প্রয়োজন। এই চারজন শিক্ষার্থী হচ্ছে– রনি, রাইমা, সীমা ও জামাল (শিক্ষার্থীদের ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে)।

প্রথমেই গবেষণার আওতাভুক্ত চার শিক্ষার্থীর বাংলা বিষয়ের দক্ষতা জানার জন্য তাদের তৃতীয় শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা এবং চতুর্থ শ্রেণির প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ফলাফল যাচাই করি। সাধারণত দেখা যায় যে যেসকল শিক্ষার্থীর উচ্চারণ ত্রুটি থাকে তাদের বানান ভুলের প্রবণতা বেশি থাকে যা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিষয়টির ফলাফলের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কাজেই এই বিশ্লেষণ থেকে আমার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীরা বাংলায় কতটুকু দক্ষতা অর্জন করেছে, সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। চারজন শিক্ষার্থীর কারোই তৃতীয় শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ের ফলাফল সন্তোষজনক নয়। সবাই ৫০% এর নিচে নম্বর পেয়েছে এবং তাদের গড় নম্বর ৪০%-এর একটু বেশি। এই চার শিক্ষার্থী ছাড়া শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীর ফলাফলের গড় ৫৫%-এর উপরে। চারজন শিক্ষার্থীর মধ্যে সীমা ও জামালের ফলাফলের অবস্থা তুলনামূলকভাবে বেশি

খারাপ। চতুর্থ শ্রেণিতে উঠার পর প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় তাদের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি বরং রনি, রাইমা ও সীমা আগের চেয়ে খারাপ ফলাফল করেছে। জামালের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও তা সন্তোষজনক পর্যায়ে যেতে পারেনি। এছাড়া উল্লেখ্য যে, তৃতীয় শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় তারা ৪০%-এর বেশি নম্বর পেলেও চতুর্থ শ্রেণির প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় তারা গড়ে ৩৭% নম্বর পেয়েছে, অর্থাৎ সার্বিকভাবে অবস্থার অবনতি হয়েছে।

গবেষণা কার্যক্রম শুরুর প্রথম দিকে এই চার জন শিক্ষার্থীকে বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল তাদের শ্রেণি কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, তারা ক্লাসের বেশিরভাগ সময়েই অমনোযোগী থাকে। রনি ও রাইমা সুযোগ পেলেই পাশের শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে। অন্যদিকে সীমা ও জামাল প্রায় প্রতিদিনই পেছনের বেঞ্চে বসে ও চুপচাপ থাকে। এই দুজন শিক্ষার্থী যদিও পাশের শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে না কিন্তু অন্যমনস্ক থাকে এবং জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের হাজিরা খাতা পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, সীমা ও জামাল প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। অন্যদিকে রনি এবং রাইমা'র বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা কম।

শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের কাজটি করা হয়েছে শ্রেণি কার্যক্রম শেষে। চারটি ভিন্ন দিনে চারজনের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে ভয়ভীতিহীন পরিবেশে। সাক্ষাৎকার থেকে যা পাওয়া গেছে তা হলো, তাদের চারজনের কাছেই বাংলা বিষয়টি খুব একটা আকর্ষণীয় লাগে না। তবে যেসব ক্লাসে শিক্ষক কোনো ছবি বা পোস্টার নিয়ে আসেন, সে ক্লাসগুলো তাদের ভালো লাগে।

বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষকদের সাথে সাক্ষাৎকারে জানা যায় যে, তাদের ক্লাসেও উল্লিখিত চার শিক্ষার্থী অমনোযোগী থাকে। তবে বিজ্ঞান ও গণিত ক্লাসে রনি যথেষ্ট মনোযোগী এবং এ দুটি বিষয়ে তার ফলাফলও বাকি তিনজনের তুলনায় ভালো। বাংলা শিক্ষকের সাথে সাক্ষাৎকারে জানা যায়, বাংলা পাঠ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বক্তৃতা পদ্ধতিতে হয়েছিল। উপকরণ খুব একটা ব্যবহার হয়নি। বর্ণক্রমিক পদ্ধতিতে বাংলা বর্ণ, শব্দ ও বাক্য শেখানো হয়েছিল।

শিক্ষার্থীদের বাংলা বিষয়ে বিশেষ করে উচ্চারণে বর্তমান অবস্থা কেমন তা যাচাইয়ের জন্য একটি মৌখিক অভীক্ষা নেই। এ অভীক্ষায় বিভিন্ন মাত্রার শব্দ সংবলিত একটি তালিকা, বাংলা পাঠ্য বইয়ের দু'টি প্রবন্ধ থেকে নেয়া চারটি অনুচ্ছেদ এবং দুটি কবিতা। নিম্নে মৌখিক অভীক্ষার ফলাফল দেয়া হলো:

সারণি ১: প্রথম মৌখিক অভীক্ষার ফলাফল

| নং | শিক্ষার্থীর নাম | মোট প্রাপ্ত নম্বর (২০) | শতকরা হার |
|---|---|---|---|
| ১ | রনি | ৯ | ৪৫% |
| ২ | রাইমা | ৮ | ৪০% |
| ৩ | সীমা | ৮ | ৪০% |
| ৪ | জামাল | ৭ | ৩৫% |

প্রথম মৌখিক অভীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যায়, চারজনের ফলাফলই ৫০% এর নিচে। এর মধ্যে জামালের প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা হার সবচেয়ে কম। মৌখিক অভীক্ষার সময় আরও লক্ষ্য করা যায় যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই কথায় আঞ্চলিকতার বেশ টান রয়েছে।

## সমস্যার কারণ

বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, বাংলা পাঠে শনাক্তকৃত চারজন শিক্ষার্থীর শুদ্ধ উচ্চারণ করতে না পারার কারণ অনেক (সারণি ২)। শ্রেণিতে বক্তৃতা পদ্ধতির ব্যবহার, বর্ণক্রমিক পদ্ধতির ব্যবহার, শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়ের আঞ্চলিকতার প্রভাব ইত্যাদি কারণে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে অমনোযোগী থাকে এবং ফলস্বরূপ তাদের এই উচ্চারণগত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

**সারণি ২: শনাক্তকৃত কারণসমূহ**

| সমস্যার কারণ | তথ্যের উৎস | যে শিক্ষার্থীর জন্য প্রযোজ্য |
|---|---|---|
| শ্রেণিতে অমনোযোগী থাকা | পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা ও শিক্ষকদের সাক্ষাৎকার | সীমা, জামাল, রনি ও রাইমা |
| শিখন-শেখানো কার্যক্রম: গতানুগতিক বক্তৃতা পদ্ধতি ও বর্ণক্রমিক পদ্ধতির ব্যবহার | শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাক্ষাৎকার | সীমা, জামাল, রনি ও রাইমা |
| কথায় আঞ্চলিকতার প্রভাব | মৌখিক অভীক্ষা, পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাক্ষাৎকার | সীমা, জামাল, রনি ও রাইমা বিশেষভাবে উল্লেখ্য: রনি ও রাইমা |
| যুক্তবর্ণ পড়তে না পারা | বেইজলাইন মূল্যায়ন, মৌখিক অভীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা | সীমা ও জামাল |
| কোনো কোনো কারচিহ্ন ঠিকমত চিনতে না পারা | বেইজলাইন মূল্যায়ন, মৌখিক অভীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা | সীমা ও জামাল |
| কোনো কোনো শব্দের অর্থ না জানা | বেইজলাইন মূল্যায়ন, মৌখিক অভীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা | সীমা ও জামাল |

এছাড়াও বেইজলাইন মূল্যায়ন, মৌখিক অভীক্ষার ফলাফল ও পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায়, এই চারজনের মধ্যে সীমা ও জামালের উচ্চারণ সঠিক না হওয়ার কারণ হলো যুক্তবর্ণ পড়তে না পারা, কিছু কারচিহ্ন ঠিকমত চিনতে না পারা এবং কিছু শব্দের অর্থ না জানা। রনি ও রাইমার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তারা একটু চেষ্টা করলেই সঠিক উচ্চারণ করতে পারছে কিন্তু যখনই তারা স্বাভাবিক কথাবার্তা বলছে তখন তাদের মধ্যে আঞ্চলিকতার টান চলে আসছে এবং সেটাই মূলত তাদের সঠিক উচ্চারণ করতে না পারার অন্যতম কারণ।

## পরিকল্পনা

অন্যান্য সহকর্মী শিক্ষকদের সাথে আলোচনা এবং নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষার্থীদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমি বাংলা পাঠ উপস্থাপন কৌশলে পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিলাম। গতানুগতিক বক্তৃতা পদ্ধতির পরিবর্তে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে পাঠ দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিলাম এবং উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম (সারণি ৩)।

প্রতিদিনের বাংলা পাঠের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা, জামাল, রনি ও রাইমাকে আলাদা ছোট দলে বসাবো বলে ঠিক করি।প্রতিদিনের পাঠ পরিকল্পনায়উল্লিখিত চারজন শিক্ষার্থীকে জন্য বিশেষ৫ মিনিট সময় বরাদ্দ রাখবো

বলে পরিকল্পনা করি, যেখানে তাদেরকে বিভিন্ন কঠিন শব্দের অর্থ ও শুদ্ধ উচ্চারণ অনুশীলন করানো হবে।প্রথম পাক্ষিকে তাদেরকে পর্যায়ক্রমে বাক্য, শব্দ, বর্ণ, যুক্তবর্ণ বলা ও পড়ার অনুশীলন করাবো বলে সিদ্ধান্ত নেই। এজন্য বর্ণ কার্ড, শব্দ কার্ড, বাক্য কার্ড ও সংশ্লিষ্ট ছবি ব্যবহারের ব্যবস্থা করি।এক্ষেত্রে বাক্য ও শব্দগুলো চতুর্থ শ্রেণির বর্তমান পাঠ্য বইয়ের যে অবস্থানে আছে সেখান থেকেই নির্বাচন করা হয়। প্রতি মঙ্গলবার টিফিনের ফাঁকে উল্লিখিত চারজন শিক্ষার্থীদেরকে ৫-৭ মিনিট উচ্চারণ অনুশীলন করাবো বলে ঠিক করি। এছাড়া যেহেতু সীমা ও জামাল যুক্তবর্ণ উচ্চারণ করতে পারে না তাই প্রতি বৃহস্পতিবার টিফিনের ফাঁকে সীমা ও জামালকে ৫ মিনিট যুক্তবর্ণ উচ্চারণ অনুশীলন করাবো বলে পরিকল্পনা করি ।

সারণি ৩: বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

| প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা/কাজ | প্রয়োগের স্থান | যে শিক্ষার্থীর জন্য প্রযোজ্য |
|---|---|---|
| অংশগ্রহণমূলক শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে পাঠ দেয়া | শ্রেণিকক্ষ | সীমা, জামাল, রনি ও রাইমাসহ শেণির সকল শিক্ষার্থী |
| পাঠ পরিকল্পনায় প্রতিদিন বিশেষ ৫ মিনিট সময় বরাদ্দ রাখা | শ্রেণিকক্ষ | সীমা, জামাল, রনি ও রাইমা |
| বাক্যক্রমিক কৌশলে পাঠদান করবো | শ্রেণিকক্ষ | সীমা, জামাল, রনি ও রাইমাসহ শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী |
| বর্ণ কার্ড, শব্দ কার্ড, বাক্য কার্ড ও সংশ্লিষ্ট ছবি ব্যবহার করবো | শ্রেণিকক্ষ | সীমা, জামাল, রনি ও রাইমাসহ শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী |
| প্রতি মঙ্গলবার টিফিনের ফাঁকে ৫-৭ মিনিট উচ্চারণ অনুশীলন করানো | শ্রেণিকক্ষের বাইরে | সীমা, জামাল, রনি ও রাইমা |
| প্রতি বৃহঃস্পতিবার টিফিনের ফাঁকে ৫ মিনিট যুক্তবর্ণ উচ্চারণ অনুশীলন করানো | শ্রেণিকক্ষের বাইরে | সীমা ও জামাল |

এখানে উল্লেখ্য যে, নতুন কৌশল বাস্তবায়নের সময় শিক্ষার্থীর পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের জন্য ডায়রিতে পর্যবেক্ষণ নোটের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করেছিলাম। প্রথম পাক্ষিকে এই কৌশলে পাঠ উপস্থাপন করে দ্বিতীয় মৌখিক অভীক্ষা এবং দ্বিতীয় পাক্ষিকে একই কৌশল অনুসরণ করে তৃতীয় মৌখিক অভীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচাই করার পরিকল্পনা করেছিলাম।

## বাস্তবায়ন

বাস্তবায়ন পর্যায়ের প্রথম পাক্ষিকে পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠ উপস্থাপনে কিছু সমস্যা হয়েছিল। যেমন- সময় ব্যবস্থাপনা, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। যেহেতু নতুন পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপনে নিজেই অভ্যস্ত নই তাই এই সমস্যাগুলো হয়েছিল। দ্বিতীয় পাক্ষিকে একই কৌশলে পাঠ উপস্থপন করি এবং এবার পূর্বোক্ত সমস্যাগুলো আর খুব একটা হয়নি। প্রথম পাক্ষিকের শেষ দিন তাদের জন্য প্রথম মৌখিক অভীক্ষার অনুরূপ দ্বিতীয় মৌখিক অভীক্ষা নেই। একইভাবে দ্বিতীয় পাক্ষিকের শেষ দিনেও আরেকটি মৌখিক অভীক্ষা নেই।

## পর্যবেক্ষণ

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মৌখিক অভীক্ষার ফলাফল ছিল নিম্নরূপ:

সারণি ৪: দ্বিতীয় মৌখিক অভীক্ষার ফলাফল

| নং | নাম | মোট প্রাপ্ত নম্বর (২০) | শতকরা হার |
|---|---|---|---|
| ১ | রনি | ১১ | ৫৫% |
| ২ | রাইমা | ১০ | ৫০% |
| ৩ | সীমা | ১২ | ৬০% |
| ৪ | জামাল | ১৩ | ৬৫% |

সারণি ৫: তৃতীয় মৌখিক অভীক্ষার ফলাফল

| নং | নাম | মোট প্রাপ্ত নম্বর (২০) | শতকরা হার |
|---|---|---|---|
| ১ | মীর | ১৩ | ৬৫% |
| ২ | রাইমা | ১২ | ৬০% |
| ৩ | সীমা | ১২ | ৬০% |
| ৪ | জামাল | ১৩ | ৬৫% |

সারণি ৪ থেকে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় মৌখিক অভীক্ষায় চারজনই আগের তুলনায় ভাল ফল করেছে অর্থাৎ তাদের উচ্চারণের উন্নতি সাধিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়েছে জামালের। তৃতীয় মৌখিক পরীক্ষায় তাদের সবারই ফলাফল সন্তোষজনক (সারণি ৫)। সীমা ও জামালের নম্বর অপরিবর্তিত থাকলেও এবার রনি ও রাইমা উন্নতি করেছে। এই অভীক্ষায় রনি ও জামালের সমান নম্বর পেয়েছে।

তাছাড়া শ্রেণি পাঠ উপস্থাপনের সময় পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, চারজন শিক্ষার্থীই নতুন কৌশলে পাঠ উপস্থাপনের সময় আগের তুলনায় অনেক বেশি মনোযোগী। এমনকি তারা কোন জায়গায় সমস্যায় পড়লে বা অনুশীলনের সময় পরস্পর সহায়তা করছে যা আগে দেখা যায়নি। দ্বিতীয় পাক্ষিকে দেখা গেছে তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় একজন কোন একটি শব্দ সঠিক উচ্চারণ না করলে অন্যকেউ তা ধরিয়ে দিচ্ছে।

## প্রতিফলন

অংশগ্রহণমূলক ও যথাযথ উপকরণের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন শিক্ষার্থীদেরকে পাঠের প্রতি মনোযোগী করে তুলেছে এবং এর ফলে শিক্ষার্থীরা বাংলা পাঠে শুদ্ধ উচ্চারণ করতে না পারার দুর্বলতা অনেকাংশে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে এবং অনিয়মিত শিক্ষার্থীরা নিয়মিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই করে তাকে তার জ্ঞান, দক্ষতা ও চাহিদা অনুযায়ী পাঠ দিতে পারলে তারা পাঠের প্রতি আকর্ষিত হয়। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর অন্যান্য পারিপার্শ্বিক সমস্যাবলি (যেমন– দরিদ্রতা, অভিভাবকের অসচেতনতা ইত্যাদি) যেগুলো তার শিখনে বাধা সৃষ্টি করে সেগুলো কাটিয়ে উঠতে অনেকাংশেই সহায়তা করে।

এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের সময় সময় ব্যবস্থাপনা ও শ্রেণি শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টিতে আগের তুলনায় আরও বেশি দক্ষ হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। মূলত শিক্ষার্থীর পারগতার স্তর অনুযায়ী তাদেরকে কাজ করতে দিলে শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়টি সহজ হয়ে যায়।

উপরিউক্ত গবেষণার আলোকে শিক্ষার্থীদের বাংলা পাঠে শুদ্ধ উচ্চারণ না পারার প্রতিকারস্বরূপ নিম্নোক্ত কৌশল বা উপায় ভবিষ্যতে চর্চা করার চেষ্টা করবো:

- এখন থেকে পাঠ উপস্থাপনের পূর্বে অবশ্যই শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই করে নিয়ে সেই অনুসারে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া পরিচালনা করবো।
- বাংলা পাঠে বর্ণক্রমিক নয় বাক্যক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ করবো।
- বাংলা পাঠে বর্ণ কার্ড, শব্দ কার্ড ও বাক্য কার্ড ব্যবহার করবো।
- শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে আঞ্চলিকতার প্রভাব দূর করতে অভিভাবকদের আরও সচেতন করার প্রয়াস গ্রহণ করবো। বিশেষ করে প্রতিটি অভিভাবক সভায় এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো। শিক্ষার উচ্চারণ দক্ষতায় পরিবর্তন আনতে পারলে এটি কীভাবে একইসাথে লেখার দক্ষতায় পরিবর্তন আনতে পারে, সেই বিষয়টি তাদেরকে ব্যাখ্যা করে বাড়িতে অল্প করে হলেও শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার চর্চা করার অনুরোধ জানাবো।
- সঠিক উচ্চারণ করার জন্য শিক্ষার্থীদের নিয়মিত অনুশীলন করার সুযোগ করে দিবো। পাঠ পরিকল্পনায় এজন্য একটি নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ করবো।

## পরিশিষ্ট

**ক. শিক্ষার্থীদের জন্য সাক্ষাৎকারপত্র**

1. তোমার নাম কী?
2. তোমার শখ কী?
3. তোমার বাবা ও মা কী করেন?
4. বাড়িতে তোমার পড়াশোনায় কে কে সহায়তা করে?
5. তোমার পছন্দের বিষয় কোনটি? এই বিষয়টি পছন্দের কারণ কী?
6. তোমার অপছন্দের বিষয় কোনটি? এই বিষয়টি পছন্দ না হওয়ার কারণ কী?
7. বাংলা বিষয়টি তোমার কেমন লাগে?
8. বাংলা পড়তে তোমার কেমন লাগে?
9. বাংলা পড়তে তুমি কোনো অসুবিধা বোধ কর কি? করলে কী কী অসুবিধা বোধ কর? এসব অসুবিধার কারণ কী বলে তোমার মনে হয়?

**খ. শিক্ষকের জন্য সাক্ষাৎকারপত্র (পূর্বশ্রেণির/শ্রেণিশিক্ষক)**

1. আপনার শ্রেণিতে রনি, রাইমা, সীমা ও জামাল এর পারফরম্যান্স কেমন? তারা কতটুকু মনোযোগী?
2. বাংলা বিষয়ের প্রতি তাদের মনোভাব কেমন?
3. কথা বলার সময় তাদের মধ্যে ভাষাগত বা উচ্চারণগত কোন সমস্যা হয় কি? হলে সেটা কী রকম? কীভাবে এই সমস্যা থেকে উত্তরণ পাওয়া যেতে পারে?

**গ. মৌখিক অভীক্ষা কাঠামো**

১. পাঠের মধ্য থেকে ৫ লাইন পড়তে দেয়া। ৫

২. পাঠ্যাংশের ৫ টি নতুন শব্দ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়া। ৫

৩. যুক্ত বর্ণ ভেঙে পড়া (৫টি)। ৫
৪. ছবি দেখে শব্দ বলা (৫টি)। ৫

## কেস স্টাডি

সাধারণত কোন একটি স্বতন্ত্র বা বিশেষ বিষয় বা কেস সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে কারণ উদঘাটন প্রক্রিয়াই হচ্ছে কেস স্টাডি। কোন কোন ক্ষেত্রে একাধিক 'কেস' নিয়েও অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে। সামাজিক বা শিক্ষা গবেষণায় বিভিন্ন কেস নিয়ে গবেষণা করে ঐ ধরনের কেস/বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে জানার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। কেস বা কেসগুলি হয়ে থাকে বিশেষ ধরনের অর্থাৎ সাধারণ বিষয়সমূহ বা ঘটনাসমূহ থেকে আলাদা বা ব্যতিক্রম।

**কেস স্টাডি কী?**

শিক্ষা খাতের উন্নয়নে বিদ্যালয় ভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার একটি সহজ পন্থা হচ্ছে এই কেস স্টাডি। এর সাহায্যে বিদ্যালয়ের চলমান নানা বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। কেস স্টাডির যেমন বিভিন্ন ধরন রয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে নানা উপায়ে এই কেস স্টাডি করা যায়। ডিপিএড শিক্ষার্থীদের জন্য কেস স্টাডি অনুশীলনের ব্যবস্থা রয়েছে। এক্ষেত্রে কেস স্টাডিকে মূলত পেশাগত উন্নয়নের একটি কৌশল হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক তাঁর পেশাগত জীবনে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয়ে থাকেন। এর মধ্যে কিছু সমস্যা বিশেষ ধরনের অর্থাৎ অন্য কোন সমস্যার সাথে তার মিল নেই। অন্য কোন সমস্যার সাথে মিল না থাকায় তিনি বা তার সহকর্মীরা এ সমস্যার সমাধানও জানেন না। তখন তিনি ঐ বিশেষ সমস্যার কারণ নিয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধান করতে পারেন। এরকম একটি বিশেষ সমস্যার পদ্ধতিগত গভীর অনুসন্ধান প্রক্রিয়াই কেস স্টাডি। এরকম একটি বা একাধিক কেসকে স্টাডি বা অনুসন্ধান করার মাধ্যমে একজন শিক্ষক এধরনের বিষয়কে গভীরভাবে বুঝতে পারেন যা তার শিক্ষকতায় পরবর্তীতে কাজে লাগবে।

বিদ্যালয় পর্যায়ে সাধারণত কোন একজন বা একদল শিক্ষার্থীর শিখন ও আচরণগত সমস্যা নিয়ে কেস স্টাডি করা হয়ে থাকে। কখনও কখনও কোন বিশেষ সাফল্যকেও গভীরভাবে অনুসন্ধান করে তা থেকে শিক্ষকরা মূল্যবান জ্ঞান ও উপলব্ধি অর্জন করতে পারেন। একটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার তা হলো কেস স্টাডির বিষয় বা সমস্যা সাধারণত শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট হয়। শিক্ষকের নিজের সমস্যা বা কোন দক্ষতা নিয়ে কাজ করা হয় সাধারণত কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে।

## কেস স্টাডি প্রক্রিয়া

কেস স্টাডি সম্পন্ন করার জন্য পদ্ধতিগতভাবে অগ্রসর হওয়া দরকার। নিচের ধাপগুলি অনুসরণ করে কেস স্টাডি করা যেতে পারে।

**ক. কেস বা সমস্যা নির্ধারণ:** কেস স্টাডির প্রথম ধাপ কেস নির্ধারণ। শিক্ষক বোঝার চেষ্টা করবেন তার শিক্ষকতা পেশায় বিশেষ কোন সমস্যা লক্ষ্য করছেন কিনা। যেমন- কোন শিক্ষার্থী হয়তো অন্য বিষয়গুলি ভাল করছে কিন্তু আপনার গণিত ক্লাসে তার মনোযোগ নেই। অথবা একজন শিক্ষার্থী গত বছর নিয়মিত ক্লাস

করেছে কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ক্লাসে নিয়মিত নয়। তাকে সাথে কথা বলেও বোঝা যাচ্ছে না সমস্যাটা কোথায়? এখানে উল্লেখিত দুটো সমস্যার যে কোন একটিকে নিয়ে অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

**খ. সমস্যার কারণ উদঘাটন:** এ ধাপে সমস্যাটি কারণ উদঘাটন করতে হবে। এ জন্য কেস এর সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থীর অভিভাবক ও সহপাঠী, সহকর্মী শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সমস্যাটির কারণ নির্ণয় করতে হবে। তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার। উপরে উল্লেখিত সমস্যার মত কোন শিক্ষার্থীর শিখন সংক্রান্ত সমস্যা হলে শিক্ষার্থীর ঐ বিষয়ের পূর্বের পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করা যেতে পারে বা নতুন করে প্রশ্ন তৈরি করে তার পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষার্থীর পরীক্ষার উত্তরপত্র বিশ্লেষণ করে বোঝা যেতে পারে তার সমস্যা কোথায় হচ্ছে।

**গ. প্রতিফলন:** এ পর্যায়ে কেসটি অনুসন্ধানের মাধ্যমে অনুসন্ধানকারী শিক্ষক কী শিখতে পারলেন বা তিনি এ শিক্ষা কীভাবে পরবর্তীতে কাজে লাগাতে পারবেন সে সম্পর্কে চিন্তা করবেন।

**ঘ.ফল প্রকাশ ও শেয়ার করা:** অনুসন্ধানকারী শিক্ষক তার অনুসন্ধানের ফল বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের সাথে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে শেয়ার করতে পারেন। কেস স্টাডিটির ফল তাৎপর্যপূর্ণ মনে হলে তা পত্রিকায় লিখে বা শিক্ষকদের পেশাগত কোন প্লাটফরমে উপস্থাপন করে প্রকাশ করতে পারেন।

**ডিপিএড কার্যক্রমে শিক্ষার্থী পরিচালিত কেস স্টাডিতে শিক্ষার্থী ও ইনস্ট্রাক্টরদের ভূমিকা:**

ডিপিএড কার্যক্রমে শিক্ষার্থী যখন বিদ্যালয়ে শিক্ষণ অনুশীলন করেন সে সময়ে তিনি কেস স্টাডি সম্পন্ন করবেন। কেস স্টাডির প্রতিটি ধাপে শিক্ষার্থী দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনস্ট্রাক্টরদের সাথে পরামর্শ দেবেন। শিক্ষার্থী প্রতি ধাপে কাজ ও সিদ্ধান্তগুলো নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখবেন। কেস স্টাডির রিপোর্টটি লেখার সময় শিক্ষার্থী নিজেই তা লিখবেন।

**কেস স্টাডি রিপোর্ট**

একটি কেস স্টাডি রিপোর্টে সাধারণভাবে নিম্নের কয়েকটি অংশ থাকবে।

**কেস এর বর্ণনা:** অনুসন্ধানের জন্য নির্ধারিত কেস বা সমস্যাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সমস্যা বা শিক্ষার্থীর বিদ্যমান/বর্তমান অবস্থাকে সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে।

**সমস্যার কারণ উদঘাটন:** সমস্যাটির কারণ উদঘাটনের জন্য কীভাবে কী তথ্য সংগ্রহ করা হল ও তা থেকে কী কারণ বের করা গেল সেটির বর্ণনা থাকবে এ অংশে। তথ্য সংগ্রহের জন্য টুল বা প্রশ্নমালা বেশি বড় হলে রিপোর্টের শেষে তা পরিশিষ্ট হিসেবে দিতে হবে।

**প্রতিফলন:** কেসটি অনুসন্ধানের মাধ্যমে অনুসন্ধানকারী শিক্ষক কী শিখতে পারলেন বা তিনি এ শিক্ষা কীভাবে পরবর্তীতে কাজে লাগাতে পারবেন সে সম্পর্কে এ অংশে আলোচনা করে রিপোর্টটি শেষ করবেন।

**কর্মসহায়ক গবেষণা ও কেস স্টাডির পার্থক্য**

অনেকেই কেস স্টাডিকে কর্মসহায়ক গবেষণার সাথে গুলিয়ে ফেলে বা এ দু'টি ধারণার মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করতে পারে না। বস্তুত কেস স্টাডি ও কর্মসহায়ক গবেষণার প্রকৃতি একেবারে ভিন্ন। নিম্নে কেস স্টাডি ও কর্মসহায়ক গবেষণার পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো:

| প্রশ্ন | কর্মসহায়ক গবেষণা | কেস স্টাডি |
|---|---|---|
| কী নিয়ে কাজ | • কোন একটি সমস্যা যেটি সমাধান | • কোন একটি কেস যা ব্যতিক্রমী এবং |

| | | |
|---|---|---|
| করে? | করতে চাই। যেমন আমি গণিত ক্লাসে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করাতে পারছিনা। আমি এর সমাধানের উপায় চাই।<br>• নতুন আইডিয়া যেটি আমার শিক্ষণে প্রয়োগ করতে চাই। যেমন, শিক্ষার্থীদের ছোট দলে কাজ করানো আমি শ্রেণিকক্ষে বাস্তবায়ন করতে চাই। | যা বুঝতে চাই। |
| লক্ষ্য কী? | • সমস্যা সমাধানের উপায় বের করা<br>• নতুন আইডিয়া প্রয়োগ করার সর্বোত্তম উপায় বের করা। | • সমস্যা/কেসের কারণ বের করা (মূল ফোকাস) এবং এ থেকে ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা গ্রহণ |
| মূল ফোকাস | • সমস্যা সমাধান করার পদক্ষেপ নেওয়া এবং সে পদক্ষেপ কাজ করছে কিনা তা বোঝা<br>• নতুন আইডিয়া বাস্তবায়ন করে তা ফল দিচ্ছে কিনা তা বোঝা | • ক্ষেত্রেই সমস্যাটা/কেসটি/ ঘটনাটি বোঝা। নিরাময়মূলক পদক্ষেপ নেওয়া মূল ফোকাস নয়। |
| বিষয়ের/সমস্যার ধরন কী? | • আমার শিক্ষণ পরিচালনা বিষয়ক কোন সমস্যা - যেমন শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগী রাখা যাচ্ছে না।<br>• শ্রেণির শিখন শেখানো কাজে কোন সমস্যা যেখানে অনেক শিক্ষার্থী জড়িত। যেমন - শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা কথা বলে ও দুষ্টুমি করে।<br>• নতুন কোন শিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ | • সমস্যাটি ব্যতিক্রমী। একজন বা কয়েকজন শিক্ষার্থীর কোন সমস্যা (শিখন বা আচরণগত)।<br>• শিক্ষকের শিক্ষণ পরিচালনা বিষয়ক সমস্যা নিয়ে কেস স্টাডি নয়।<br>• অনেক শিক্ষার্থীর একই রকম সমস্যা থাকলে সেটিও কেস স্টাডি না করে কর্মসহায়ক গবেষণা করা ভাল কারণ এক্ষেত্রে সমস্যাটি শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক না হয়ে শিখন শেখানো কাজ বা শিক্ষকের দক্ষতা বিষয়ক হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি<br>• কখনও কখনও সফল কোন ঘটনাও কেস স্টাডি করা যেতে পারে। যেমন একজন শিক্ষার্থী বরাবরই গণিতে দূর্বল ও অমনোযোগী ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে পঞ্চম শ্রেণিতে এসে সে গণিতে বেশ মনোযোগী এবং |

| | | |
|---|---|---|
| | | পরীক্ষাগুলোতেও ভাল করছে। এটি অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে কী কী কারণে তার এ পরিবর্তন এসেছে। এ অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত ফল পরবর্তীতে অন্য অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। |
| পদ্ধতিগত মিল ও অমিল কোথায়? | • সমস্যার কারণ উদঘাটন গুরুত্ব কম পায়। গুরুত্ব বেশি সমাধানের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ এর প্রতি।<br>• বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ ধাপ অবিচ্ছেদ্য অংশ।<br>• পর্যবেক্ষণ ধাপে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা হয়।<br>• এক্ষেত্রে গবেষণা চক্রের পুনরাবৃত্তি করতে হয়। | • সমস্যার/ঘটনার কারণ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। তাই বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয় এ ধাপে।<br>• নিরাময়মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ কেস স্টাডিতে আবশ্যক নয়।<br>• এখানে ধাপসমুহ চক্রাকারে পুনরাবৃত্তি করার দরকার নেই। |

## মেন্টরিং (Mentoring)

**মেন্টরিংএর ধারণা**

মেন্টরিং-কে সম্পর্ক স্থাপনভিত্তিক একটি প্রক্রিয়া হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যেখানে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি একজন নবীন ব্যক্তিকে পরামর্শ ও পথ প্রদর্শনে সাহায্য করেন। মেন্টরিং প্রক্রিয়াটি প্রধানত একজন পরিচিত ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির মাধ্যমে শুরু হয় এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ধাপে ধাপে তা আবর্তীত হয়। বর্তমানে অন্যকেসঠিক পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি প্রতিশব্দ হিসাবে মেন্টরিং ব্যবহার করা হয়। মেন্টর আপাতদৃষ্টিতে মেন্টিকে তার রক্ষণাবেক্ষণে রাখেন। মেন্টরিং এর বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়-

- মেন্টরিং হল একটি পারস্পরিক সম্পর্ক যার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে অর্জিত প্রজ্ঞাকে একজন হতে অপরের মধ্যে নির্ভরযোগ্য উপায়ে স্থানান্তর করা যায়।
- মেন্টরিং দু'জন ব্যক্তির মধ্যকার একটি দীর্ঘকালীন সম্পর্ক যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট ব্যক্তির (মেন্টি) চাহিদা পূরণ করে তাঁর সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে উন্নয়ন সাধিত হয়। ফলশ্রুতিতে মেন্টর, মেন্টি ও প্রতিষ্ঠানসহ সকলের কল্যাণ সাধিত হয়।

- মেন্টরিং প্রতিষ্ঠানের প্রবীন ও নবীন সদস্যদের মাঝে একটি কর্মকেন্দ্রিক প্রগাঢ় সম্পর্ক। প্রতিষ্ঠানটিতে মেন্টর একজন অভিজ্ঞ ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্ব যিনি ব্যক্তিগতভাবে মেন্টির পেশাগত উন্নয়নে পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন।
- মেন্টরিং দুজনের মাঝে একটি সহায়ক ও যত্নশীল শিক্ষণ সম্পর্ক, যেখানে একজন তাঁর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা অপর জনের সাথে ভাগ করে থাকেন। সর্বোপরি এই জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা গ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তির পেশাগত উন্নয়নের পথ সুগম হয়।

কাজেই বলা যায়, মেন্টরিং শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও কর্মক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের একটি সফল পদ্ধতি যার মধ্যমে একজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি একজন নবীন ব্যক্তিকে তাঁর দক্ষতা উন্নয়নে নিরন্তর সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন। উল্লেখ্য যে, মেন্টরিং-কে খবরদারিমূলক কার্যক্রমের পরিবর্তে একটি সম্পর্ক স্থাপনভিত্তিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করাই শ্রেয়। ঐতিহ্যগতভাবে কোনো প্রতিষ্ঠানের মেন্টর, যিনি অন্যান্য সদস্যদের থেকে অধিক জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতার অধিকারী, তাঁর গুণাবলি অপেক্ষাকৃত নবীন বা কম দক্ষতাসম্পন্ন সদস্যদের মাঝে সঞ্চালনের মাধ্যমে তাঁদের উন্নয়নকে ধরে রাখেন। সর্বোপরি, মেন্টরিং হলো নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও সমালোচনার উর্ধ্বে একটি সম্পর্ক যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন করা।

পরবর্তী আলোচনার সুবিধার্থে 'মেন্টর' ও 'মেন্টি' ধারণা দু'টির কার্যকরী সংজ্ঞা নির্ধারণ করা জরুরী। নিম্নে উদাহরণের মাধ্যমে ধারণা দু'টি তুলে ধরা হলো:

**মেন্টর:** মেন্টর হলেন এমন ব্যক্তি যিনি অপেক্ষাকৃত প্রবীন, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও ক্ষমতাবান এবং যিনি তার প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও বিজ্ঞতা নবীন ব্যক্তির মাঝে সঞ্চালন করে থাকেন। যেমন: প্রধান শিক্ষক।

**মেন্টি:** অপেক্ষাকৃত নবীন, কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি যিনি মেন্টরের নিকট হতে পরামর্শ ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিজের পেশাগত উন্নয়নের পথ সুগম করেন তিনি হলেন মেন্টি। যেমন: সহকারী শিক্ষক।

**মেন্টরিং এর উদ্দেশ্য**

মেন্টরিং এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গেলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক বিবেচনা করতে হয়। মেমন: সর্বদা মেন্টিকে পরিবর্তনে সাহায্য করা, তার দক্ষতার উন্নয়ন করা, নেতৃত্বের গুণাবলি তৈরি করা, অংশীদারিত্বের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তন ক্ষমতাসম্পন্ন হতে সাহায্য করা।

মেন্টরিং এর প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

- বিশেষ ও গভীর জ্ঞান ও দক্ষতা স্থানান্তরের মাধ্যমে ব্যক্তির উন্নয়ন ঘটানো ।
- পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নবীন সদস্যদেরকে যোগ্য করে তোলার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরি করা।
- মেন্টরিং এর মাধ্যমে মেন্টর ও মেন্টি উভয়কে তাঁদের স্বতন্ত্র দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে অবগত করা এবং তাঁরা প্রত্যেকে কীভাবে ভূমিকা পালন করবে তার ধারণা প্রদান করা।
- মেন্টর- মেন্টির সম্পর্কের মধ্যদিয়ে সকল সদস্যদের জন্য উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এর মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে পেশাগত সন্তুষ্টি সৃষ্টি করা ও তাঁদের উক্ত পেশাতে ধরে রাখা।

- মেন্টর ও মেন্টির মধ্যে একটি ইতিবাচক ও বিশ্বস্ত সম্পর্ক গড়ে তোলা। মেন্টর ও মেন্টি উভয়ের আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক সংঘবদ্ধতা বৃদ্ধি করা।
- জটিল কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার মধ্য দিয়ে মেন্টিকে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে সক্ষম করা। সমস্যা সমাধানে মেন্টির ক্ষমতায়নে সাহায্য করা। মেন্টির কাজের গঠনমূলক সমালোচনা করার মাধ্যমে তার উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- কাজ ও জীবনের মধ্যকার ভারসাম্য কীভাবে রক্ষা করা যায় তা মেন্টিকে শিখতে সাহায্য করা।
- মেন্টিকে সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে যেতে সাহায্য করা যেখানে সে তার পেশা নিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনা করার সুযোগ পায়।

মেন্টরিং প্রধানত পেশাগত ও ব্যক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলোকে ভিত্তি করে কাজ করে। মেন্টরিং এর প্রধান লক্ষ্য হল মেন্টিকে তার নিজের দক্ষতা, কৌশল ও যোগ্যতার উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করা যাতে তিনি পরবর্তী প্রতিকূলতাকে নিজে নিজেই ভালভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।

**শিক্ষায় মেন্টরিং**

মেন্টরিং শিক্ষকদের মাঝে পারস্পরিক অভিজ্ঞতার বিনিময়, তাঁদের নিজেস্ব যোগ্যতার ওপর বিশ্বাস এবং শিক্ষকতা পেশায় প্রেষণা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নবীন শিক্ষকগণ সাধারণত শিক্ষকতার প্রথম বছরগুলোতে নানা ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। শুরুর শিক্ষকগণ যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হোন তা হলো- শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁদের প্রত্যাশা কী হওয়া উচিত তা বুঝতে না পারা, বিদ্যালয়ের প্রত্যাশা সম্পর্কে অসচেতনতা এবং শিক্ষার্থীদের সংখ্যার সাথে কীভাবে মানিয়ে চলতে তা বুঝতে না পারা। অনেক ক্ষেত্রে নবীন শিক্ষকগণের কাছে বিদ্যালয় কিংবা অভিভাবক শুরু থেকেই অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ন্যায় দায়িত্ব পালন করবে বলে প্রত্যাশা করে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই উচ্চ প্রত্যশা ও কঠিন দায়িত্বগুলোই নবীন শিক্ষকগণের শিক্ষকতা পেশায় অনীহা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাড়ায়। তাই শিক্ষকতার প্রথম দিকে মেন্টরিং একটি কার্যকর কৌশল হিসাবে বিবেচ্য, যার মাধ্যমে তাদের সমস্যা সমাধানের দক্ষতা উন্নয়ন করে শিক্ষকতা পেশার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা যায়। মেন্টরিং এর মাধ্যমে শিক্ষকগণ যেভাবে উপকৃত হন তা হলো-

**১। পেশাগত দক্ষতা:**মেন্টর শিক্ষক মেন্টির শিক্ষকতার উন্নয়নে কাজ করেন যার মধ্য দিয়ে তারা নিজদের পেশাগত দক্ষতারও উন্নতি সাধন করে থাকে।

**২। প্রতিফলনমূলক অনুশীলন:** এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষকগণ তাঁদের নিজেদের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ পান। তাঁরা তাদের বিভিন্ন দক্ষতা যেমন: শিখন শেখানো কৌশল, পাঠ পরিকল্পনা, শ্রেণি ব্যবস্থাপনা, ভাব-বিনিময় কৌশল, শিক্ষার্থীদের সাথে আন্তঃসম্পর্ক প্রভৃতি সম্পর্কে প্রতিফলনমূলক শিখনের সুযোগ পান।

**৩। নবজীবন:** বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, জ্যেষ্ঠ শিক্ষক মেন্টরিং এর মাধ্যমে নিজেকে বিদ্যালয়ের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে সম্মানবোধ করেন এবং পুনরায় শিক্ষকতা পেশায় নিজেকে উজ্জীবিত করেন। মেন্টরিং প্রক্রিয়ায় নিজের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে উজার করে দিয়ে তিনি নবোদ্দ্যমের সাথে নবীন শিক্ষককে শিক্ষকতার প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলেন।

৪। **মনস্তাত্ত্বিক উপকারঃ** মেন্টরিং এর পেশাগত ও মনস্তাত্ত্বিক উভয় ধরনের উপকারিতা রয়েছে। মেন্টরিং শিক্ষকতা পেশায় মেন্টর ও মেন্টি উভয়ের আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মতৃপ্তি বৃদ্ধি করে। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সহকর্মীকে পরামর্শক হিসেবে পাশে পেয়ে নবীন শিক্ষক যেমন তাঁর দক্ষতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হন তেমনি সব সময় এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক প্রশান্তি অনুভব করেন।

৫। **সহযোগিতাঃ**মেন্টরের সাথে মেন্টির অব্যাহত যোগাযোগ তাঁদের মাঝে এক ধরনের সহযোগিতামূলক আন্তসম্পর্ক সৃষ্টি করে যা মেন্টর ও মেন্টি উভয়ের মধ্যে শিক্ষকতা পেশায় আগ্রহ বর্ধনে ভূমিকা রাখে।

৬। **শিক্ষক নেতৃত্বে অবদানঃ** মেন্টরের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চালনের মাধ্যমে মেন্টির পেশাগত নেতৃত্বদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

**শিক্ষায় মেন্টরিং এর কৌশল**

ইতিবাচকভাবে মেন্টরিং চর্চার জন্য বিভিন্ন ধরনের মডেল রয়েছে। নিম্নে জনসন ও জনসন (২০১২) কর্তৃক প্রদেয় মেন্টরিং এ উৎকৃষ্টতা অর্জন মডেলটি আলোচনা করা হল-

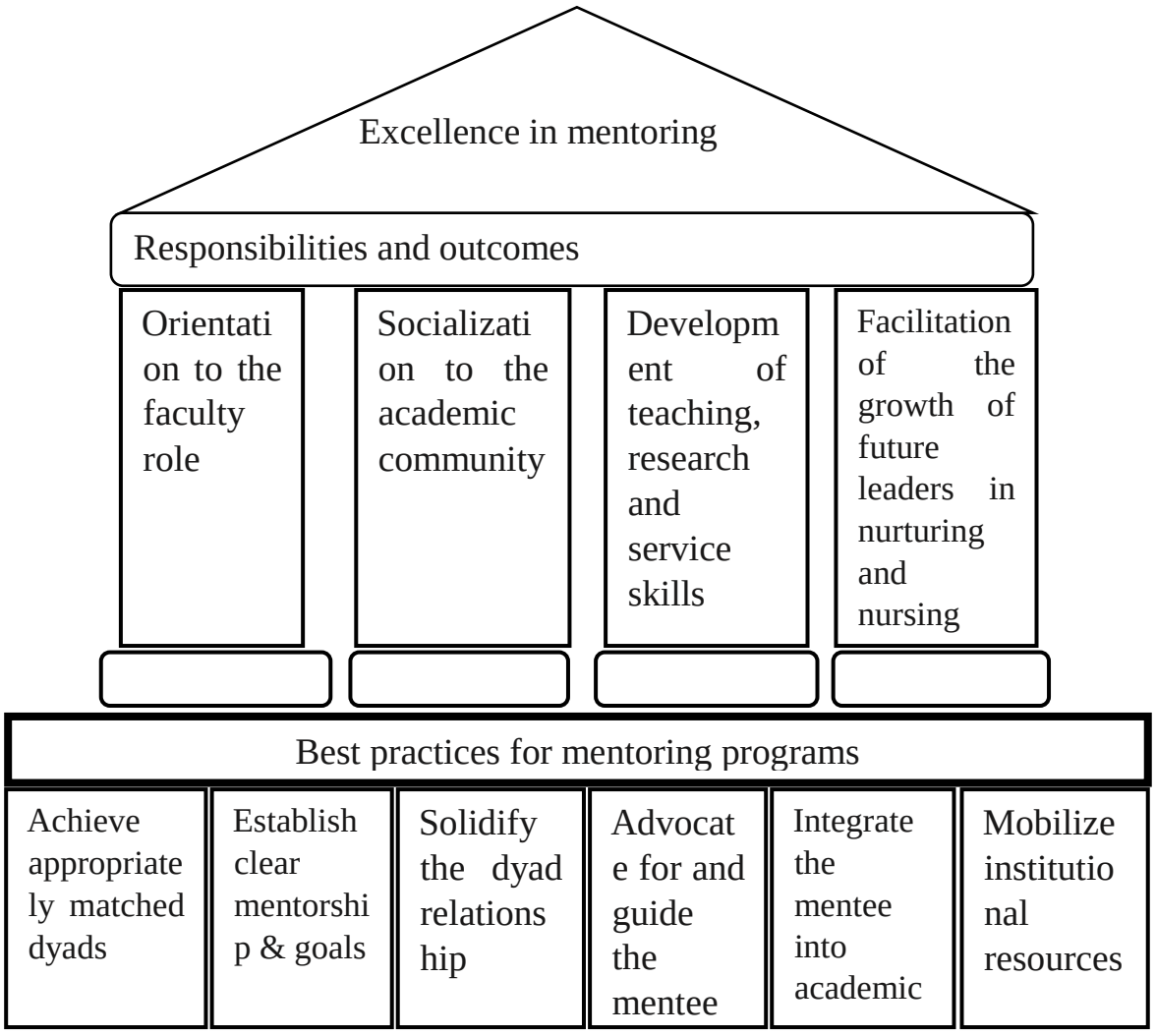

Figure 4.12: Best Practices in Academic Mentoring: A Model for Excellence. (Johnson & Johnson, 2012)

এই মডেলটিতে মেন্টরিং এর জন্য ৬ ধরনের অনুশীলনকে ভিত্তি মনে করা হয়েছে। মেন্টরিং এর উৎকৃষ্টতা লাভের ক্ষেত্রে; আর এই ভিত্তিকেই আবলম্বন করে মেন্টরিং এর চারটি স্তম্ভ গড়ে উঠেছে যা অনুশীলনের ফলাফলকে প্রকাশ করে এবং এই ভিত্তি ও স্তম্ভের সুষম গঠনের ভেতর দিয়ে মেন্টরিং এর উৎকৃষ্টতা অর্জিত হয়। পরবর্তী আলোচনায় কীভাবে এই অনুশীলন সামগ্রিকভাবে শিক্ষকতাকে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে ধাবিত করে তা তুলে ধরা হবে।

**প্রথম ভিত্তিঃ উপযুক্ত জোড়া গঠন**

উপযুক্ত জোড়া গঠন সফল মেন্টরিং সম্পর্কের জন্য গুরত্বপূর্ণ। তাই সঠিক মেন্টর ও মেন্টির দল গঠন নীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিৎ। দল গঠন বিভিন্ন পদ্ধিতিতে হয়ে থাকে যা নিচে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কোন নীতিটি সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ তা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা হয়নি।

এখানে মেন্টর-মেন্টি জোড়া গঠনের ৬টি নীতি অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে। যথা:

১. প্রশাসনিক মানদণ্ড অনুসারে
২. বিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে
৩. মেন্টি কর্তৃক নির্বাচিত মেন্টরের মাধ্যমে
৪. মেন্টর কর্তৃক নির্বাচনের ওপর ভিত্তি করেঃ যেখানে মেন্টর তাঁর মেন্টির যোগ্যতা ও আগ্রহকে কেন্দ্র করে দল গঠন করেন
৫. মেন্টর-মেন্টি একে অপরকে আবিষ্কার করার মাধ্যমে
৬. প্রশাসন মেন্টরের লভ্যতা/ প্রাপ্যতা বিবেচনা করার মাধ্যমে।

আনুষ্ঠানিক মেন্টরিং কর্মসূচির ক্ষেত্রে মেন্টর-মেন্টির অসম জোড়া একটি সাধারণ সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। প্রেক্ষাপট, বয়স, ব্যক্তিত্ব বা আগ্রহের ভিন্নতা একটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ জোড়া তৈরির প্রভাবক হিসাবে কাজ করে। যখন মেন্টরকে জোড়া তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানানো হয় তখন তাঁরা অধিক দায়িত্বশীল হন এবং মেন্টরিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করেন।

**দ্বিতীয় ভিত্তিঃ মেন্টরিং এর সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা**

জোড়া গঠনের পর অবশ্যই তাঁরা তাঁদের মেন্টরিং- এর উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবেন এবং প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রাথমিক লক্ষ্য স্থির করবেন ও ভবিষ্যৎ দায়িত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন। মেন্টির ব্যক্তিগত ও পেশাগত লক্ষ্য নির্ধারণে সাহায্য করার পাশাপাশি মেন্টর প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যগুলোও সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করবেন।

মেন্টরিং- এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় প্রত্যাশা করা হয়:

ক) পারস্পরিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা
খ) সময়ের প্রতি দায়িত্বশীলতা
গ) উন্নতির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিকল্পনা

**তৃতীয় ভিত্তিঃ সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ**

একটি সফল মেন্টরিং- এর জন্যমেন্টর ও মেন্টির মধ্যে একটি সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন অপরিহার্য। সম্পর্কের মাঝে কোনো প্রকার জটিলতা দেখা দিলে বা প্রত্যাশা সুস্পষ্ট হয়ে না ওঠলে জোড়াকে অবশ্যই সম্পর্ক জোরদারকরণের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত।

মেন্টরিং সম্পর্ক সমৃদ্ধ করার জন্য নিম্নোক্ত চারটি কৌশল বিবেচনা করা যেতে পারে-

ক) বসিং নয় বরং সহকর্মীসুলভ সম্পর্ক গঠন
খ) নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন
গ) মেন্টর-মেন্টির ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া বিনিময়এবং
ঘ) একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি।

**চতুর্থ ভিত্তিঃ মেন্টিকে সমর্থনদান ও দিক-নির্দেশনা প্রদান**

ভালো মেন্টরিং এর জন্য চতুর্থ ভিত্তিতে মেন্টিকে দিক-নির্দেশনা ও তাঁকে সমর্থন প্রদান করাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নিম্নে সমর্থনের বিভিন্ন কৌশল উল্লেখ করা হল:

সমর্থন প্রাথমিকভাবে তিনটি কৌশলে প্রদান করা হয়–

ক) মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান
খ) কর্মজীবনে ভারসাম্যতা অর্জনে সহায়তা ও
গ) পেশাগত উন্নয়নে উপদেশ প্রদান ।

**পঞ্চম ভিত্তিঃ শিখন সংস্কৃতিতে মেন্টিকে অন্তর্ভুক্তকরণ**

মেন্টরিং এর পঞ্চম ভিত্তিকে দুটি পৃথক অংশে ভাগ করা হয়েছে। এদু'টি অংশ চর্চার মাধ্যমে মেন্টিকে প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়-

ক) নেটওয়ার্কিং দক্ষতা লাভে সাহায্য ও
খ) শিখন সংস্কৃতিতে সামাজিকিকরণে সহায়তা প্রদান।

মেন্টিকে শিখন সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্য হল তাকে প্রতিষ্ঠানটির বুদ্ধিবৃত্তিক মূলধন ও মনস্তাত্ত্বিক বুদ্ধিমত্তায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। মেন্টরের উচিৎ এটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নেওয়া, কারণ এই সুযোগটি পরবর্তিকালে মেন্টিকে তাঁর যোগ্যতার উন্নয়নের মাধ্যমে শিখন সমাজের একজন কার্যকর সদস্য হতে সাহায্য করে থাকে।

**ষষ্ঠ ভিত্তিঃ প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ সংহতকরণ**

মেন্টরিং -এর সর্বোত্তম অনুশীলনের ক্ষেত্রে ষষ্ঠ ভিত্তির মূল কথা হল, প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ সংহতিকরণ যা দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। এখানে চারটি কৌশল চিহ্নিত করা হয়েছে যা প্রশাসনিক, সহকর্মীসুলভ ও আর্থিক বিনিয়োগকে প্রতিফলত করে।

ক) প্রশাসনিক সহায়তা লাভ

খ) পদোন্নতি ও কাজের চাপের ক্ষেত্রে মেন্টরিং এর প্রত্যাশাকে আওতায় আনা

গ) মেন্টর প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম প্রদান ও

ঘ) অবসর সময় জ্ঞাপন।

মেন্টরিং মেন্টর-মেন্টির উভয়েরপারস্পরিক সহযোগিতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে গড়ে উঠে। মেন্টরিং নতুন সহকর্মীকে সহযোগিতা প্রদান, দায়বদ্ধতা সৃষ্টি ও সামাজিকিকরণের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের একটি অভিনব পদ্ধতি। তাই শিক্ষকতা পেশায় মেন্টরিং- কে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

**প্রধান শিক্ষক যখন মেন্টর**

একটি বিদ্যালয়ের ভালো-মন্দ অনেকটাই নির্ভর করে প্রধান শিক্ষকের ওপর। তাই ভালো মেন্টরিং প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখা প্রয়োজনঃ

১. **অনুকরণ নয় অনুসরণঃ**মনে রাখতে হবে আপনি মেন্টির পেশাগত উৎকর্ষ সাধন করছেন, কাজেই তাঁর মতামত বা পছন্দ-অপছন্দের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। অনেক মেন্টর নিজের জ্ঞান, অভিজ্ঞতার বাইরেও যে জানার অনেক কিছু থাকতে পারে তা ভাবতে পারেন না। সেক্ষেত্রে তিনি মেন্টিকে তাঁর প্রতিলিপি বানিয়ে ফেলেন যা ভালো মেন্টরিং নয়। যদি আপনি মেন্টির জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিক উন্নয়নে নিজেকে সহায়তাকারী হিসাবে কাজে লাগাতে পারেন মেন্টিকে তার পছন্দ মতো কাজ করার সুযোগ প্রদানে সক্ষম হবেন।

২. **স্বতন্ত্রতা গুরুত্বপূর্ণঃ**প্রতিটি মেন্টরিং সম্পর্কেরএকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তি স্বতন্ত্রতায় বিশ্বাস করা। একজন মেন্টর হিসেবে এই স্বতন্ত্রতা বজায় রাখা আপনার কর্তব্য।

৩. **সংগতি প্রয়োজনীয়ঃ**একটি সম্পর্ক গঠিত হয় নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগের মাধ্যমে। মেন্টর হিসেবে আপনি এই যোগাযোগ অক্ষুন্ন রাখুন। কাজ করার জন্য একটি নিদিষ্ট সময় বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। আপনার মেন্টিকে প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে এক ঘন্টা থেকে দেড় ঘণ্টা করে সময় দিন। কী কাজ করবেন এবং তা কীভাবে করবেন সে সম্পর্কে দুজনকেই সম্মত হতে হবে। নিয়মিত এবং অবিরত কাজ করার মাধ্যমে মেন্টি আশ্বস্ত হন যে আপনি প্রকৃতপক্ষেই তার উন্নয়নে আগ্রহী এবং আপনার ওপর তিনিনির্দ্বিধায় নির্ভর করতে পারেন।

৪. **সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করাঃ** মেন্টরিং সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রকৃত ও বস্তুনিষ্ঠ প্রতিক্রিয়াই একমাত্র কাজে দেয়। কোনো বিষয় সম্পর্কে আপনার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থাকতেই পারে। মেন্টির কোনো প্রশ্নের জবাব অজানা থাকলে অস্বস্তি অনুভব না করে তাঁকে বলুন এই বিষয়টি জেনে পরে জানাবেন। এটি মেন্টির কাছে আপনার সম্মান কমাবে না বরং অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলবে। কারণ মনুষ কখনোই সবজান্তা হতে পারে না।

৫. **সমাধানের পরিবর্তে ক্ষমতায়নঃ** মেন্টরগণ সাধারণত নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকার কারণে নিজেই সমস্যা সমাধানকারী হয়ে ওঠেন। একজন মেন্টরের উচিত মেন্টিকে তার নিজস্ব সমাধানে পৌঁছাতে সাহায্য করা।

চীনের একটি প্রবাদে রয়েছে, কাউকে একটা মাছ ধরে দিলে সে এক দিন খাবে, তবে তাকে মাছ ধরা শিখিয়ে দিলে সারাজীবনই খেতে পারবে।

৬. **দায়ী নয় আপনি দায়িত্ব ভাগ করছেন:** আপনাকে মেন্টির প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে। তবে মেন্টির সব ভুলের জন্য আপনি দায়ী থাকবেন বিষয়টি তা নয়। একইভাবে মেন্টির সফলতার জন্য নিজেকে প্রধান অংশীদার মনে করাটা ঠিক নয়। মেন্টি তাঁর মেন্টরের কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করেছে বলেই সফল হয়েছে। কাজেই এটি একটি যৌথ দায়িত্ব এবং সাফল্যের অংশীদার দু'জনই।

৭. **আপনার অবদান উপলব্ধি করুন:**মেন্টির প্রতি আপনার সহায়তার প্রচেষ্টা যথেষ্ট ছিল কি না তা অনুভব করুন। আপনি কতটুকু সহায়ক ছিলেন তা উপলব্ধি না করলে আপনি মেন্টরিং -এর প্রকৃত ফললাভে সক্ষম হবেন না। আপনার অবদান সম্বন্ধে জানার সবচেয়ে ভালো উপায় হল মেন্টিকে সরাসরি জিজ্ঞেস করা। যা আপনাকে দুটি বিষয়ে জানতে সাহায্য করবে। প্রথমত, আপনাকে আপনার অবদান সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য প্রদান করবে। দ্বিতীয়ত, মেন্টিকে আপনার অবদান সম্পর্কে সচেতন করবে।

৮. **এটা কোচিং নয় মেন্টরিং:**প্রশিক্ষক সাধারণত কোচিং -এর মাধ্যমে বিভিন্ন দক্ষতার উন্নয়নে কাজ করেন কিন্তু মেন্টরিং এর থেকে আরও বেশি কিছু। এটা মেন্টির সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক যা কোচিং এর ঊর্ধ্বে; এর মাধ্যমে মেন্টি কে, তাঁর স্বপ্ন ও প্রত্যাশা কী এগুলো আলোচনা করা। প্রকৃত মেন্টরিং হলো মেন্টির স্বপ্ন যাত্রায় একজন উদ্যোমী অংশগ্রহণকারী হওয়া। তাঁর এই সফরে প্রকৃত পরামর্শ দিতে ভুলবেন না।

৯. **পরস্পরের সীমাবদ্ধতা ও গণ্ডিকে সম্মান করুন:**প্রত্যেকেরই কিছু সীমাবদ্ধতা ও নির্দিষ্ট গণ্ডি থাকে। তাই মেন্টির কাছে আপনার সীমানা স্পষ্টভাবে তুলে ধরুন যাতে সে আপনাকে সম্মান করে এবং তাঁর সীমাবদ্ধতাগুলো আপনাকে বলে। আপনি আপনার মেন্টির গণ্ডিও জেনে নিন যাতে আপনারা পারস্পরিক সমঝোতার মধ্য দিয়ে সম্পর্কটি গড়ে তুলতে পারেন।

১০. **ধৈর্য সহকারে শুনুন:** সাধারণত আমরা কোনো সমস্যা ভালোভাবে না শুনেই পরামর্শ প্রদান করি। তাই অনেক সমাধানই প্রকৃত অর্থে কাজ করে না। ভালোভাবে শোনা ও ভালো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সুবিধা হল এটি আপনার মেন্টিকে নিজের সম্পর্কে আরও বেশি প্রকাশ করতে সাহায্য করবে। মেন্টির সবলতা ও সীমাবদ্ধতাগুলো ভালো করে শুনে সম্ভাব্য সমাধানগুলো হতে সর্বোত্তম গ্রহণযোগ্য সমাধানটি প্রদান করুন।

## সহায়ক পাঠ


Bloom B. S. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: The Cognitive Domain.* New York: David McKay Co Inc.

Buskist, W. & Gerbing D. W. (1990). *Psychology: Boundaries and Frontiers*. Scott, Foresman/Little, Brown Higher Education.

Crider, A.B., Goethals, G.R. Robert D. Kavanaugh.R.D. Solomon, P.R. (1993).*Psychology*, Scott Foresman and Company.

Dave, R. H. (1975). *Developing and Writing Behavioural Objectives.* (R J Armstrong, ed.), Educational Innovators Press.

Gardner, H. (1983). *Frames of Mind- The Theory of Multiple Intelligences*. New York: Basic Books.

Gadner, H. (1999). *Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st century*.New York: Basic Books

Harrow, A. (1972).*A taxonomy of psychomotor domain a guide for developing behavioral objectives*.New York: David McKay.

Krathwohl, D.R., Bloom,B.S. and Masia, B. B. (1964).*Taxonomy of educational objectives, Book II. Affective domain*. New York, NY. David McKay Company, Inc.

Malak, M. S., Deppeler, J. M. & Sharma, U. (2014). Bangladeshi teachers' perceptions about student behaviour in primary schools, *International Journal on School Disaffection*,*11*(1), 59-78.

Maslow, A.H. (1954). *Motivation and personality*. New York: Harper & Row.

Maslow, A.H. (1954).*The farther reaches of human nature*. New York: Viking Press.

Mergel, B. (1998). *Instructional Design and Learning Theory*. Accessed (24 August 2016) at: http://etad.usask.ca/802papers/mergel/brenda.htm.

Morgan, C. T.; King, R. A.; Weisz, J. R. & Schopler, J. (1986). *Introduction to Psychology*, McGraw-Hill.

Santrock, J. W. (2006). *Educational Psychology: Classroom Update*: Preparing for Praxis™ and Practice. McGraw-Hill, New York

Spearman, C. E. (1927). *The abilities of man: Their nature and measurement*. New York: Macmillan.

Tharpe & Gallimore (1988). *Rousing minds of Life: Teaching, learning and schooling in social context*. Cambridge: Cambridge University Press.

Thorndike, E. L. (1898). *Animal intelligence: An experimental study of the associative processes in animals*. *Psychological Monographs: General and Applied,* 2(4),-109.

Vygotsky, L.; Hanfmann, E.; Vakar, G. & Kozulin, A. (2012). *Throught and language*. Revised and extended edition. TheMIT Press.

হক, মু. না. এবং হোসেন, সা. (২০১৫). *শিক্ষায় জ্ঞানবিকাশ তত্ত্ব, পিঁয়াজে, ভাইগট্স্কি, ব্রুনার এবং ব্রনাফেন ব্রেনারের জ্ঞানীয় মতবাদ*। ঢাকা: বিশ্বসাহিত্য ভবন।